KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আতাউর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ২১/১ ২১/২ ২১/৩ ২১/৪	Year of Publication : বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৮ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৮ কার্তিক-পৌষ ১৩৮৮ মাঘ-চৈত্র ১৩৮৮
	Condition : Brittle : Good
Editor : হুমায়ুন কবির	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

হুমায়ুন কবির সম্পাদিত

চতুরঙ্গ

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

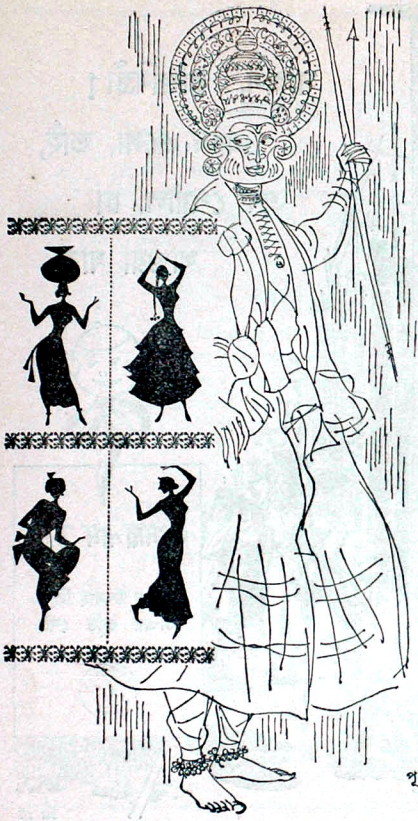

ঐক্য
ও
সমন্বয়ের
সাধনায় ...

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের—বহুর মধ্যে সমন্বয়-সাধনের সফল সাধনাই আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের মর্মবাণী। এই মর্মবাণীই নিহিত রয়েছে তার ব্যাপক, বিচিত্র, কখনও বা ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি ও শিল্প-কলার মধ্যে।

হিমালয়ের যে পার্বত্য গৌরব বজ্রনৃত্যে উদ্দীপিত, সমতল-বাসিনী রসকলি-লাঞ্ছিত তরুণীদের রাসনৃত্যে ও মৃদঙ্গের বোলে বা বাউল ও কীর্তনে তা স্তিমিত ও ভাবনত। উড়িষ্যার ছউ বা মধ্য ভারতের লাম্বাডি নৃত্যে, গুজরাটের গরবা বা দক্ষিণ ভারতের ভারতনাট্যম্ ও কথাকলি নৃত্যে এই বিচিত্র ভিন্নধর্মী সংস্কৃতিরই আত্মপ্রকাশ।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই বিচিত্র, ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির ঐক্য ও সমন্বয় সাধনের প্রয়াসই রূপায়িত।

পূর্ব রেলওয়ে

ত্রৈমাসিক পত্রিকা **চতুরঙ্গ** কার্তিক-পৌষ ১৩৬৬

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

॥ সূচীপত্র ॥

হুমায়ুন কবির ॥ সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ ২২১

অরুণ মিত্র ॥ নীরবতায় ২৩১

হরপ্রসাদ মিত্র ॥ সত্তার উপলব্ধি ২৩৩

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ চতুর্দশপদী ২৩৪

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ জাপানী ধরনের কবিতার গুচ্ছ ২৩৫

অরুণকুমার সরকার ॥ প্রস্তুতি ২৩৭

মনীশ ঘটক ॥ কনখল ২৩৮

অতীন্দ্রনাথ বসু ॥ নৈরাজ্যবাদ : বিপ্লব যুগে ২৭৪

আলবেয়ার কামু ॥ অচেনা ৩০২

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ভারতের-শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন ৩২১

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আধুনিক সাহিত্য ৩৩৪

সমালোচনা—হিরণকুমার সান্যাল, হরপ্রসাদ মিত্র, সুশীলকুমার গুপ্ত, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, নৃপেন্দ্র সান্যাল ৩৩৯

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

১৮৬৭
খৃষ্টাব্দ
হইতে
ভারতের সেবায়
নিয়োজিত

বামার লরী

কলিকাতা • বোম্বাই • নিউ দিল্লী • আসানসোল

একবিংশতিতম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

চতুরঙ্গ

কার্তিক-পৌষ ১৩৬৬

সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ

হুমায়ুন কবির

গত সংখ্যায় সোভিয়েট রাষ্ট্রের শিক্ষা ও ট্রেনিং-এর বিষয়ে খানিকটা আলোচনা করেছি। আসলে সোভিয়েট রাষ্ট্রে সমস্ত বিষয়েই শিক্ষা এবং ট্রেনিং-এর উপরে এত ঝোঁক যে সোভিয়েট জীবনের যে কোন বিষয় আলোচনা করতে হলেই শিক্ষার কথা বলতে হবে। জন্ম থেকে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত সোভিয়েট নাগরিককে রাষ্ট্র সচেতন ও সংঘবদ্ধভাবে শিক্ষা দান করে, তাই সমস্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রকে একটী বিরাট শিক্ষা লেবরেটরী বললে অন্যায় হবে না। কিছুদিন আগে লাইসিঙ্কোকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে অনেক আলোচনা বিতণ্ডা হয়, কিন্তু লাইসিঙ্কোর মূল বক্তব্য ছিল যে শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির জ্ঞান বাড়ানো ছাড়াও তার প্রকৃতি ও স্বভাবেরও আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব এবং সে পরিবর্তন পরবর্তী পুরুষেরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। শিক্ষার ফলে যে ব্যক্তির ব্যবহারে পরিবর্তন হয় একথা সবাই মানেন, কিন্তু ব্যক্তির স্বরূপ বদলে যায় এবং সে পরিবর্তন বংশানুক্রমে উত্তরপুরুষে সঞ্চারিত হয়, একথা অনেকেই মানতে পারেন নি। লাইসিঙ্কোর মতামত সত্য কিনা তা নিয়ে মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু এ মতবাদ যে সোভিয়েট জীবন দর্শনের স্বাভাবিক পরিণতি এবং শিক্ষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ফলেই তার বিকাশ একথা অনস্বীকার্য।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে তাই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই শিক্ষা ও ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে। চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা সার্বিক ও বাধ্যতামূলক সেকথা আগেই বলেছি, বর্তমানে সার্বিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ বাড়িয়ে পনেরো করবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার পরে অধিকাংশ ছেলেমেয়েরাই কোন না কোন কাজে লেগে যায়, শতকরা কুড়ি পঁচিশজন ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করে। প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষার্থী বাছাই হয় বলে বুদ্ধি বা বিদ্যায় দুর্বল ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পায় না। মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ বিদ্যায়তনে স্থান পাওয়া আরো বেশী কঠিন এবং প্রবেশলাভ করলেও শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকবার জন্য এ সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের আপ্রাণ পরিশ্রম করতে হয়। কাজেই যারা প্রাথমিক শিক্ষালাভ করে, তাদের মধ্যে শতকরা তিন চারজনের বেশী উচ্চশিক্ষায়তনে প্রবেশ করবার অধিকার পায় না।

মাধ্যমিক স্কুলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা স্থান পায় না, তাদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার কিন্তু একেবারে বন্ধ হয়ে যায় না। নানা ধরনের সান্ধ্য, নৈশ বা অর্ধসাময়িক শিক্ষালাভের ব্যবস্থা রয়েছে এবং কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গেই এ সমস্ত কোর্সে যোগ দেওয়া চলে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষালয়ে না গিয়ে বাড়ীতে বসেই চিঠিপত্রের সাহায্যে শিক্ষালাভের ব্যবস্থাও রয়েছে। এ ধরনের নানাপ্রকার পাঠক্রমের প্রবর্তন বোধহয় আধুনিক কালের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান আবিষ্কার। কেবল সোভিয়েট রাষ্ট্র বলে নয়, বিলাতে এবং মার্কিন দেশেও এরকম অর্ধ সাময়িক কোর্সের ব্যবস্থা রয়েছে। আমেরিকাতেই এরকম ব্যবস্থা প্রথম সুরু হয়, কিন্তু বর্তমানে সোভিয়েট রাষ্ট্রে তার প্রসার বোধহয় আরো বেশী। বিলাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক লাখও হবে না, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অর্ধ সাময়িক পাঠক্রমে যোগদান করে প্রায় বিশ লক্ষ লোক। সোভিয়েট রাষ্ট্রেও যারা মাধ্যমিক স্কুল বা উচ্চশিক্ষায়তনে স্থান পায় না তাদের মধ্যে অধিকাংশই কোন না কোন ধরনের অর্ধ সাময়িক কোর্সে যোগ দেয়। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, কলা প্রভৃতির ব্যবস্থা তো রয়েছেই সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং বর্তমান যুগের উপযোগী যে কোন শাস্ত্রের অধ্যয়নেই এ ধরনের শিক্ষার্থীকে পুরোপুরি সুযোগ দেওয়া হয়।

সোভিয়েট শিক্ষা ব্যবস্থার আর একটী বৈশিষ্ট্যর উল্লেখও বাঞ্ছনীয়। মাধ্যমিক শিক্ষা-লাভের পরে যদি কোন যুবক বা যুবতী রাষ্ট্রের সংগঠনমূলক কোন কাজে যোগ দেয়, তবে দু'তিন বছর পরে তারা অপেক্ষাকৃত সহজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পেতে পারে। সোভিয়েট উচ্চশিক্ষা-মন্ত্রী আমাকে জানান যে মেধাবী ছাত্রছাত্রীও বহুক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্কুলের শেষে প্রত্যক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের চেষ্টা না করে রাষ্ট্রসংগঠন কার্যে যোগ দেয়, কারণ দেখা গেছে যে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষায়তনে প্রবেশের কড়াকড়ি এত বেশী যে সে তুলনায় এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ অনেকটা সহজ।

বিজ্ঞানের উপরে সোভিয়েট শিক্ষাব্যবস্থায় যে ঝোঁক, তার উল্লেখ আগেই করেছি। প্রাথমিক স্কুলের ছেলেমেয়েরাও প্রথম থেকেই বিজ্ঞান শিক্ষালাভ করে, তাই বর্তমানে বিজ্ঞানের মূলসূত্রের সঙ্গে পরিচিত নয়, চল্লিশ বছর বয়সের অনধিক এ রকম সোভিয়েট নাগরিক নেই বললেই চলে। বিজ্ঞানের এই বিপুল প্রসারের ফলেই সম্প্রতি সোভিয়েট রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এত প্রগতি করেছে, এবং মনে হয় যে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে আগামী দশ পনেরো বৎসরের মধ্যে ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি বা দর্শন কোন ক্ষেত্রেই আর কেবল পুঁথির নজীর দিয়ে জনসাধারণের মতবাদ বা চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করা চলবে না। এ প্রশ্ন সোভিয়েট রাষ্ট্রে বহুবার আমিও করেছি। শিক্ষায়তনে, বৈজ্ঞানিক সংসদে, দর্শনসভায়, লেখকগোষ্ঠীর আলোচনায় বহুবার প্রশ্ন করেছি যে বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র জিজ্ঞাসা ও বিচার। সমস্ত জিনিসই যদি বুদ্ধির দৃষ্টি দিয়ে মানুষ একবার বিচার করতে সুরু করে, তবে সোভিয়েট রাষ্ট্রের মূলনীতি মার্ক্সবাদ নিয়েও নতুন যুগের শিক্ষার্থীদের মনে প্রশ্ন ওঠা অনিবার্য। বর্তমানে যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে এক দলের সর্বনায়কত্ব, মার্ক্সবাদে সন্দিহান হলে তার সামাজিক বা চিন্তাজগতে স্থান নেই বললেই চলে, বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসাবাদ ও সব কিছু বিশ্লেষণ করবার মনোভঙ্গির সঙ্গে তার সংগতি কই, এ কথা জিজ্ঞাসা করলে অধিকাংশ লোকেই প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন, বলেছেন যে মার্ক্সবাদ বিজ্ঞানসম্মত, তাই মার্ক্সবাদ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে না, কিন্তু উত্তরে যখন জিজ্ঞাসা করেছি যে বিজ্ঞানের মূলে সিদ্ধান্ত নিয়েও বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বারবার বিচার করেছেন বলেই আধুনিককালে বিজ্ঞানের

বিস্ময়কর প্রগতি এবং যেদিন এ ধরনের অবারিত প্রশ্নকে বাধা দেওয়া হবে, সেদিনই বিজ্ঞানের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে আসবে, তখন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বা লেখক গোষ্ঠীর কাছে কোন সদুত্তর পাইনি। রাষ্ট্রনেতারা বরং এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উদার ও বৈজ্ঞানিক মনো-বৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন, বলেছেন যে আমাদের লক্ষ্য সোভিয়েট রাষ্ট্রের উন্নতি, সোভিয়েট নাগরিকের সর্বাঙ্গীন বিকাশের দ্বারাই সে শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব, তাই নাগরিকের বিকাশের জন্য যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থার জন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করছি এবং ভবিষ্যতেও করব। শিক্ষার প্রসারের ফলে আজ পর্যন্ত কিন্তু রাষ্ট্রের মূলনীতি নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে নি—যদি ওঠে, যখন উঠবে, তখন দেখা যাবে। এ প্রসঙ্গে এটাও লক্ষ্যণীয় যে সোভিয়েট নেতা মিঃ ক্রুশ্চভের চিন্তা, কথা ও ব্যবহারে যে বাস্তববোধের পরিচয় মেলে, অধিকাংশ সোভিয়েট বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে তার একান্ত অভাব।

সোভিয়েট শিক্ষা ব্যবস্থায় একদিকে যেমন বিজ্ঞানের উপর ঝোঁক, অন্যদিকে তেমনি ভাষা শিক্ষার উপরেও প্রচুর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক স্কুলে সাধারণত কেবল মাতৃভাষাই শেখানো হয়, কিন্তু যাদের মাতৃভাষা রুশ নয়, তাদের সঙ্গে সঙ্গে রুশ ভাষাও পড়তে হয়। বস্তুতপক্ষে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান সমস্যা। লেনিনের আমলেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের নিজ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বহুল পরিমাণে সোভিয়েট রাষ্ট্র এ আদর্শকে কার্যকরী করেছে। কার্যত যাই হোক না কেন, আইনত সোভিয়েট রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র, এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেকটী রাষ্ট্রেরই শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে। এ সমস্ত রাষ্ট্রেই নিজ নিজ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে এবং সে শিক্ষা প্রাথমিক স্তর থেকে সুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ স্তর পর্যন্ত প্রসারিত। কার্যত কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রুশ ভাষা ধীরে ধীরে অন্যভাষার ওপর প্রাধান্য লাভ করছে। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে এ সমস্যা তেমন গুরুতর নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের রুশ ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা রয়েছে। রুশভাষী শিশুরা কিন্তু অন্য কোন ভাষা সাধারণত শেখে না কাজেই পাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি তারা বেশী মনোযোগ দিতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে পাঠক্রমের ব্যবস্থায় এ অসংগতি বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ স্তরে অন্য ভাষাভাষীদের বাধ্যতামূলকভাবে রুশভাষা শিখতে হয়, এবং তার জন্য যে পরিমাণ সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন, পাঠ্য অন্যান্য বিষয়ের সময় কমিয়ে তার ব্যবস্থা করতে হয়। ফলে দেখা যায় যে বহুক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরে মেধাবী বালকবালিকা স্বভাষী স্কুলে না গিয়ে রুশভাষা যে সব স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম, সে রকম স্কুলে যেতে চায়। রাষ্ট্রভাষার আকর্ষণ এমনিতেই প্রবল, তার উপর সোভিয়েট রাষ্ট্রে যেসব ভাষা প্রচলিত, তাদের মধ্যে অনেকগুলিই রুশভাষার তুলনায় সাহিত্যে বিজ্ঞানে অনগ্রসর ও দরিদ্র বলে মেধাবী ছাত্রের মনে রুশভাষার প্রতি বেশী আগ্রহ হওয়াও বোধ হয় স্বাভাবিক। রাষ্ট্রভাষার প্রতি এ আগ্রহ আমরা ভারতবর্ষেও দেখেছি। পাঠান মোগল রাজত্বকালে ফারসী এবং ইংরেজ আমলে ইংরেজি যেভাবে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়মনকে আকর্ষণ করেছে, আজ যদি সোভিয়েট রাষ্ট্রে রুশভাষা তেমনিভাবে অন্য ভাষাভাষী নাগরিকদের আকর্ষণ করে, তবে তাতে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। রুশভাষার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বিজ্ঞান জাগতিক প্রাধান্য সত্ত্বেও রাষ্ট্রের অন্যান্য ভাষার বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে চেষ্টা, তাদের মাধ্যমে উচ্চতম শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা, তার জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্র নেতাদের বরং আন্তরিক অভিনন্দন

জানাতে হয়।

ভারতবর্ষেও বহু ভাষার বিকাশ এবং ভারতীয় বিভিন্ন ভাষাগুলির মধ্যে কোন একটিকেই প্রধান বলা চলে না। এত ভাষা বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতবর্ষে আমরা দেশের ঐক্য কিভাবে সংরক্ষণ করি, পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান করি, একথা সোভিয়েট রাষ্ট্র-শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা তার জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতাদের বরং আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে নেতারা আমাকে তাই বহুবার জিজ্ঞাসা করেছেন । উত্তরে যখন বলেছি যে আমাদের সংবিধানে চোদ্দটীভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলে মেনে নেওয়া হয়েছে এবং কেবলমাত্র সরকারী কাজ-কর্মের সুবিধার জন্য হিন্দীভাষাকে সরকারীভাষার স্থান দেওয়া হয়েছে, তখন তাঁরা বলেছেন যে আমাদের নীতিও তাই, কিন্তু কার্যত নানা কারণে রুশভাষা অন্যভাষার তুলনায় প্রাধান্য লাভ করেছে। ভারতবর্ষে প্রত্যেক ভাষায় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দশ পনেরোখানি বই ভারতবর্ষের অন্যান্য সমস্ত ভাষায় অনুবাদ করে সর্বভারতীয় সাহিত্য রচনার যে চেষ্টা আমরা করছি সোভিয়েট রাষ্ট্রে সে ধরনের পরিচয় আরো ব্যাপকভাবে মেলে। সোভিয়েট মন্ত্রীর মতে তাঁদের দেশে প্রায় আশীটী ভাষার প্রচলন, এবং যে কোন ভাষায় কোন ভাল বই রচনা হলে তখুনি অন্যান্য ভাষায় তার অনুবাদের ব্যবস্থা হয়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বললেন যে দাগিস্তানের দুজন কবি বর্তমানে সমস্ত সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে খ্যাতিলাভ করেছেন, অথচ তাঁরা যে ভাষায় লেখেন, সে ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা বড় জোর লাখখানেক হবে। রাষ্ট্রের সমর্থন ও সাহায্যের ফলে বহুভাষা যে এভাবে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে ও করছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ সমর্থনে বিপদও রয়েছে, সে বিষয়ে আলোচনা পরে করব।

বিভিন্ন বিদেশীয় ভাষা শেখবার যে ব্যবস্থা ও আগ্রহ সোভিয়েট রাষ্ট্রে দেখা যায়, তাও প্রশংসনীয়। রাশিয়ানরা চিরদিনই ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে অগ্রণী, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে তিন চারটী ভাষা বলতে না পারলে রুশ দেশে ভদ্রসমাজে স্থান পাওয়াই কঠিন ছিল। বস্তুত, এককালে রুশ ভদ্রলোক বাড়ীতে ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ফরাসীভাষায় কথা বলে গর্ব বোধ করতেন সঙ্গে সঙ্গে জার্মান, ইংরেজি, ল্যাটিন এবং অন্যান্য ভাষারও রেওয়াজ ছিল। বর্তমানেও বিদেশী ভাষা শিক্ষার নানাভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়—ছাত্র ও শিক্ষক, রাজকর্মচারী ও সাধারণ নাগরিক, রাষ্ট্রনেতা ও রাজনৈতিক, সবাই কোন না কোন বিদেশীভাষা শিখতে চান, এবং সমস্ত বিদেশী ভাষার মধ্যে ইংরেজি শেখবার আগ্রহই সবচেয়ে বেশী মনে হল। বস্তুত ইংরেজি যেভাবে সমস্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে মনে হয় যে দশ পনেরো বছরের মধ্যে ইংরেজিভাষাভাষীর সংখ্যা এত বেড়ে যাবে যে যাঁরা ইংরেজি জানেন, একটি রুশ কথা না জানলেও তাঁরা সর্বত্র অনায়াসে ঘুরে বেড়াতে পারবেন।

ভারতবর্ষেও আমরা দেখেছি যে বহু সভাসমিতিতে রুশ আগন্তুক ভারতীয় ভাষায় বক্তৃতা বা আবৃত্তি করে সমবেত জনগণের হৃদয় সহজেই জয় করেন। মনে হয় যে ভাষা শিক্ষার আগ্রহ ভিন্ন সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতির অঙ্গ হিসাবেও বিদেশী ভাষা শিক্ষার উপর এত জোর দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে এটাও লক্ষ্যণীয় যে এশিয়া বা ইয়োরোপের বিভিন্ন আধুনিক ভাষার উপর যত ঝোঁক, প্রাচীন কালের সাংস্কৃতিক ভাষার উপর এত জোর দেওয়া হয় না। এককালে সংস্কৃত, আরবী, পালি বা ফারসীভাষায় রুশ মনীষীদের পাণ্ডিত্য সমস্ত পৃথিবীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। ওলডেনবুর্গ বা চেরবাটস্কীর নাম এ প্রসঙ্গে সহজেই মনে আসে। আজ কিন্তু ঠিক সে ধরনের মহাপণ্ডিত সোভিয়েট রাষ্ট্রে বেশী মিলবে না। পাণ্ডিত্যের দৃষ্টিও সংস্কৃতি, দর্শন বা সাহিত্যের বদলে অর্থনীতি, রাজনীতি ও আধুনিক ভাষার দিকে

বেশী ঝুঁকেছে।

বিদেশী ভাষা শিখবার ও শেখাবার ব্যবস্থা ও আগ্রহ দেখে কিন্তু বিস্মিত হতে হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে একটা বিদেশীভাষা শেখা বাধ্যতামূলক। পৃথিবীর বহুদেশেই এ ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু প্রায় সব দেশেই মাধ্যমিক স্কুলের বালক বালিকারা নেহাৎ দায়-সারাভাবে বিদেশী ভাষা শেখে। ইংরেজ ছাত্রদের ফরাসী বা জার্মান জ্ঞান, অথবা ফরাসী জার্মান ছাত্রদের ইংরেজি জ্ঞান বহুক্ষেত্রে আমাদের দেশের মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রদের ইংরেজি জ্ঞানের চেয়েও শোচনীয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রে কিন্তু তা নয়। মাধ্যমিক স্কুলে প্রথম প্রবেশের জন্য এবং পরে টিকে থাকবার জন্য যে কঠোর প্রতিযোগিতা, তার ফলে কোন বিষয়কেই অবহেলা করা চলে না। মাধ্যমিক স্কুলের ছেলেমেয়েরাও তাই বিদেশীভাষা যত্ন করে শেখে এবং প্রথম থেকেই আধুনিক কথ্য ভাষার ওপর জোর দেওয়া হয় বলে তারা মোটামুটিভাবে নিজেদের মনোভাব সে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে।

শুধু তাই নয়। বিদেশীভাষাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করবার জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্র ইংরেজি, জার্মান এবং ফরাসী ভাষার মাধ্যমে মস্কোতে তিনটী মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে—এ তিনটী স্কুলে ইংরেজি, ফরাসী বা জার্মান কেবল যে ভাষা হিসাবে শিখানো হয় তা নয়—পাঠ্য সমস্ত বিষয়ই সেই ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্কুলেও বিদেশীভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া, বিভিন্ন অঞ্চলে মাধ্যমিক স্কুলে স্প্যানিশ, আরবী, উর্দু ও হিন্দী শেখবারও ব্যবস্থা আছে। দুচারটী স্কুলে বাঙলা, তেলেগু, মারাঠী, পাঞ্জাবীও শেখানো হয়। উজবেকস্থান প্রভৃতি মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রে ফারসীর এখনও প্রচুর কদর, তাই সে সব জায়গায় ফারসী পড়াবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলাদা উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

বিদেশী ভাষা শেখার জন্য শিক্ষার্থী কিভাবে নির্বাচিত হয় জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে প্রাথমিক স্তরে নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা নেই। অবশ্যান, শিক্ষক পাওয়ার সুবিধা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে প্রাথমিক স্কুলে বিদেশীভাষা শিক্ষার আয়োজন করা হয়। সে সব স্কুলে যে সব ছাত্রছাত্রী আসে, তারা স্বভাবতই সেই বিদেশী ভাষা শিখবার সুযোগ পায়। মাধ্যমিক স্কুলে বিদেশী ভাষা শিখতে চাইলে তার জন্য ছাঁটবাছাই করা হয় এবং মস্কোতে যে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে চালিত মাধ্যমিক স্কুল তাতে ভর্তি হতে হলে সেই বিদেশীভাষায় বিশেষ যোগ্যতা দেখাতে হয়। বর্তমানেও সোভিয়েট রাষ্ট্রে বিদেশীভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ও উৎকৃষ্ট। নতুন ব্যবস্থায় বিদেশী ভাষার মাধ্যমে সমস্ত পাঠ্য বিষয় পড়ানো হয় এবং তার ফলে প্রতি বৎসর সোভিয়েট রাষ্ট্রে দুশো তিনশো শিক্ষার্থী একটি বিদেশী ভাষা প্রায় মাতৃ-ভাষার মতন আয়ত্ত করে। শুনলাম যে হিন্দী, উর্দু এবং বাঙলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য মাধ্যমিক স্কুলও শীঘ্রই বোধ হয় তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত হবে।

পূর্বেই বলেছি যে সমস্ত ব্যাপারেই সোভিয়েট রাষ্ট্র নেতাদের শিক্ষা এবং ট্রেনিং-এর প্রতি অগাধ বিশ্বাস। সর্বসাধারণের জন্য নানা স্তরে শিক্ষা প্রসারণের চেষ্টা তো চলছেই, সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকলা, নাট্যশিল্প, ভাস্কর্য এমন কি সার্কাস শিল্পে শিক্ষাদানের জন্যেও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। লেখকদের জন্যও বহু সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। এসব সংস্থা অবশ্য লিখতে শেখায় না, কিন্তু যারা লেখে তাদের রচনার সমালোচনা করে এবং প্রকাশ ব্যবস্থায় তাদের হাত রয়েছে বলে পরোক্ষভাবে সাহিত্য সৃষ্টিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শিক্ষা এবং ট্রেনিং-এর সঙ্গে সংগঠনের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে,

তাই জীবনের প্রায় সমস্ত প্রকাশকেই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ মানতে হয়। এ ব্যবস্থায় লাভলোকসান দুইই রয়েছে—সে বিষয়ে পরে আলোচনা করব। প্রথমে সাহিত্য শিল্প শিক্ষা দর্শন বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ সমস্ত সংগঠন কিরূপ নিয়েছে, তার খানিকটা বর্ণনা প্রয়োজন।

সমস্ত ক্ষেত্রেই মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তিতে এ সমস্ত সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষাও যথেষ্ট নয়, বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন উচ্চ শিক্ষায়তনে শিক্ষা সমাপ্ত না করলে এ সমস্ত সংস্থায় যোগ দেওয়া যায় না। চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি দৃশ্যমান চারুশিল্পের জন্য আর্ট আকাদমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আকাদমীর নিজের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পায়তনে শিল্পীরা শিক্ষা পায়। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করলেই তবে এ সমস্ত শিক্ষায়তনে প্রবেশের অধিকার জন্মে। সাধারণত পাঁচ ছয় বৎসর শিক্ষালাভের পরে চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সে শিক্ষার্থীরা আকাদমীর সনদ পায়—সে সনদ না পেলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কোন মাধ্যমিক স্কুলেই শিল্পশিক্ষকের কাজ মিলবে না। মাধ্যমিক স্কুলে যারা চিত্রশিল্প শেখে তাদের সংখ্যা লক্ষাধিক, কিন্তু এসব শিল্প শিক্ষায়তনে শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র কয়েক হাজার।

নাট্যশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থায় সেই একই অবস্থার পরিচয় মেলে। মস্কোতে লুনাচার্স্কী ইনস্টিটিউটে সারা সোভিয়েট রাষ্ট্র থেকে বছরে মাত্র একশো শিক্ষার্থীকে স্থান দেওয়া হয়, পাঁচ বছরের কোর্স মিলিয়ে সমস্ত শিক্ষায়তনে মোট শ পাঁচেক ছাত্রছাত্রী। সারা সোভিয়েট রাষ্ট্রে তাই নাট্যশাস্ত্র শিল্পীর সংখ্যা দুচার হাজারের বেশী হবে না এবং ফলে পাঁচ বছর শিক্ষার পরে যখন সনদ মেলে তখন কাজ পেতে তাদের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। তা সত্ত্বেও প্রতি বৎসরই কিছু শিক্ষার্থীকে নিয়ে মুস্কিল হয়, কারণ সব সময়ে কাজ তাদের পছন্দ মত হয় না, এবং যে কাজ তাদের নিতে বলা হয় তা যদি তারা একবার নামঞ্জুর করে, তখন অন্য কোন কাজ খুঁজে নেওয়ার দায়িত্ব তাদের নিজেদের। যেখানে প্রায় সমস্ত কাজের ব্যবস্থাই রাষ্ট্রের হাতে সেখানে নিজের চেষ্টায় বা তদ্বিরে মনমত কাজ খুঁজে পাওয়া যে কি কঠিন তা সহজেই বোঝা যায়।

যেমন নাটকলা বা চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে, সঙ্গীতের বেলায়ও ঠিক সেইভাবে সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিক্ষা, ট্রেনিং ও সংগঠনের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মামুলী মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা তো রয়েছেই, তাছাড়া বিশেষভাবে সঙ্গীত শেখাবার জন্যও মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা কম নয়। এ ধরনের স্কুলে প্রায় দশ হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করে, কিন্তু সঙ্গীত আকাদমীর তত্ত্বাবধানে যে উচ্চ বিদ্যায়তন, তার ছাত্র সংখ্যা সমস্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রে হাজার জনের বেশী হবে না।

কেবল শিল্প সাহিত্য নাটক অথবা বিজ্ঞান উদ্যোগ ব্যবসা বলে নয়, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিক্ষা, ট্রেনিং ও সংগঠনের উপর একাগ্র দৃষ্টি। জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রে সার্কাস এবং বিভিন্ন খেলাধূলার বিরাট আয়োজন এবং এ সমস্ত সার্কাসের ও অন্যান্য খেলার খেলোয়াড়দের ট্রেনিং-এর জন্যও আলাদা স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ না করে সব শিক্ষায়তনে প্রবেশের অধিকার মেলে না। তার ফলে কয়েকটী বড় লাভ হয়েছে। আঠারো উনিশ বছরের আগে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করা যায় না, কাজেই যারা এ সমস্ত স্কুলে আসে তারা সাবালক এবং অপেক্ষাকৃত স্থিরবুদ্ধি। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে এসেছে বলে পৃথিবী এবং স্বদেশ সম্বন্ধে তাদের ধারণাও অনেকটা

পরিণত। স্বেচ্ছায় এ ধরনের বৃত্তি গ্রহণ করেছে বলে নিজের কাজে তারা তৃপ্ত, অসন্তোষ এবং আত্মঅবিশ্বাসের ফলে কর্মজীবনের যে গ্লানি, তা তাদের স্পর্শ করে না। তার একটা বড় লাভ এই যে সবাই শিক্ষিত এবং নিজের কর্মজীবনে পরিতৃপ্ত বলে এ সমস্ত বৃত্তির সামাজিক মর্যাদা অনেকখানি বেড়ে গেছে। আমাদের দেশে এককালে নর্তকী বা সার্কাসের ভাঁড় কিংবা খেলোয়াড় বললেও জনসাধারণের মনে যে একটা অবজ্ঞার ভাব আসত, সোভিয়েট রাষ্ট্রে তার পরিচয় একেবারেই মেলে না, বরং এ সমস্ত ক্ষেত্রে যাঁরা কৃতী, তাঁরা সমস্ত দেশের শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন।

বিভিন্ন আকাদমীর তত্ত্বাবধানে সমস্ত শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিল্পীদের মনোবৃত্তিতে যে বৈচিত্র্যের অভাব দেখা যায়, এটা আশ্চর্য নয়। বহুক্ষেত্রে মনে হয় যে শিল্পীর সে সম্বন্ধে পুরোপুরি চেতনাও নেই। মস্কোতে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে সাহিত্যিক শিল্পী সঙ্গীতকার সর্বদেশে এবং সর্বকালেই ব্যক্তি কেন্দ্রিক, সমাজের আবহাওয়ায় বড় হয়ে সমাজব্যবস্থার মধ্য থেকে নিজের শিল্পকলার অনুপ্রেরণা ও মালমশলা সংগ্রহ করেও চিরদিনই বিদ্রোহী, তাই প্লেটোর মতন দার্শনিক তাঁর আদর্শ রাজ্য থেকে শিল্পীকে নির্বাসিত করতে চেয়েছিলেন, অথচ সোভিয়েট রাষ্ট্রে যে শিল্পীদের সংগঠিত করে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হচ্ছে, তাতে কি শিল্পসৃষ্টির ব্যাঘাত হয় না? উত্তরে আর্ট আকাদমীর সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সভ্য বললেন যে শিল্পীর ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত না করলে তার প্রতিভা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে, এমন কি সমাজদ্রোহী হয়ে সমাজকে ধ্বংস পর্যন্ত করতে পারে। ধ্রুপদী সনাতন পন্থার অনুসরণ এবং নিত্য নূতন পথের সন্ধান ও আবিষ্কার কোন পথে শিল্পীর সার্থকতা, তা নিয়ে এককালে সোভিয়েট রাষ্ট্রে অনেক বাদবিতণ্ডা হয়েছে, কিন্তু বর্তমানে আর শিল্পীর মনে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমাজ নির্দেশিত পথেই তাঁরা জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করে ব্যক্তিগত সার্থকতা ও শিল্পী হিসাবে সিদ্ধি লাভ করেন। কেবল মস্কো বলে নয়, অন্যত্রও এই ধরনের জবাবই বরাবর পেয়েছি। একজন উজবেগ চিত্রকর বললেন যে সবাই একই ধরনের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা-লাভ করে বলে তাদের অঙ্কনরীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে গভীর সাদৃশ্য, ফলে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার অবকাশ নেই। জড়বাদী দর্শন আলোচনার ফলে ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করবার ফলে তাদের মনে ব্যক্তি ও সমাজের সংগতি অসংগতি নিয়েও বর্তমানে আর কোন দ্বন্দ্ব নেই।

ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সর্বত্রই চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যে বৈচিত্র্যের অভাব দেখা দিয়েছে। চিত্রকররাও তা অস্বীকার করেন নি, কিন্তু বলেছেন যে যেটুকু স্বাধীনতা তাদের প্রয়োজন, বর্তমান ব্যবস্থায় তা তাঁদের মেলে। বোধ হয় এই উক্তির মধ্যেই তাঁদের মৌলিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় মেলে—আত্মার স্বাধীনতাকেও তাঁরা প্রয়োজনের মাপকাঠিতে বিচার করতে সুরু করেছেন। সাধারণ মানুষের সহজ বুদ্ধি কিন্তু এ ধরনের বিচার বা যুক্তি মানে না। তাই রাষ্ট্রের সমস্ত প্রচার সত্ত্বেও ফরাসী চিত্রকরদের বাস্তব গন্ধ রহিত কল্পনাবহুল চিত্র তাঁদের চিত্তকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। মাতিস, গোগ্যাঁ বা পিকাসোর ছবি বহুদিন সোভিয়েট রাষ্ট্রে দেখানো হয়নি, কিন্তু বর্তমানে লেনিনগ্রাদে রাষ্ট্রীয় চিত্রশালায় তাঁদের ছবির আদর দেখে বিস্মিত হতে হয়। আমি যখন মস্কোতে ছিলাম, নিকোলাস রোয়েরিকের ছবির প্রদর্শনী হচ্ছিল, তা দেখবার জন্যও লোকের সে কি আগ্রহ। কয়েক বছর আগে যখন ভারতীয় চিত্র প্রদর্শনী সোভিয়েট রাষ্ট্রে পাঠানো হয়, তখন সেখানকার জনসাধারণ এবং

শিল্পীরা শতমুখে তার প্রশংসা করেছেন। ভারতবর্ষের সনাতন চিত্র শৈলীই তাঁদের মুগ্ধ করেছে, বহু চিত্রকরের মুখে শুনেছি যে মরুভূমিতে পিপাসায় মরণোন্মুখ লোক সুস্বাদু জল পেলে তাকে যেমন অমৃত বলে গ্রহণ করে ভারতীয় চিত্র পদ্ধতি দেখে তাঁদের ঠিক সেই-রকম আনন্দ হয়েছে।

শিল্পকলার ব্যাপারে সোভিয়েট ব্যবস্থার সপক্ষেও বলবার কথা রয়েছে। উল্লেখেই বোধ হয় সে কথা সবচেয়ে বেশী সমীচীনভাবে শুনেছি। মনে হল উল্লেখ ব্যক্তি স্বাধীনতা অনেকটা বেশী, এবং সমাজ ব্যবস্থা ও ব্যক্তির রুচির মধ্যে মোটামুটি একটা আপোষ সেখানে হয়েছে। সেখানকার অন্যতম রাষ্ট্রনেতা বললেন যে রাষ্ট্রীয় সংগ্রহশালায় আকাদমীর নির্দেশ-মত ছবি কেনা হয়, সাজানো হয়, কিন্তু সোভিয়েট নাগরিক নিজের খুসী মত ছবি কিনতে পারেন, তাতে বাধা নেই এবং ফলে বিভিন্ন ধরনের চিত্রপদ্ধতি বিকাশের সুযোগ সোভিয়েট রাষ্ট্রেও রয়েছে। তিনি বরং দাবী করলেন যে এ ব্যাপারে ধনতান্ত্রিক দেশের তুলনায় সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিল্পীর সুযোগ সুবিধা অনেক বেশী, কারণ ধনতান্ত্রিক দেশে শ্রেণী-বিভাগ স্পষ্ট বলে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের শ্রেণী স্বার্থের দ্বারা প্রভাবন্বিত, শিল্পকলার ক্ষেত্রেও সংকীর্ণ শ্রেণী নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীর বাইরে কেউ যেতে পারে না। তাঁর মতে সোভিয়েট রাষ্ট্রে শ্রেণীবিভাগ লুপ্ত হয়েছে এবং ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি অবারিতভাবে নিজের রুচি ও প্রতিভার বিকাশ করতে পারে বলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যের অবকাশ সেখানে অনেক বেশী। তাঁকে বললাম যে ভবিষ্যতে কি হবে জানি না, কিন্তু বর্তমানকালে সোভিয়েট রাষ্ট্রেও শ্রেণী-বিভাগের পরিচয় মেলে এবং যতদিন বিভিন্ন নাগরিকের আয় ব্যয়ে এত তারতম্য থাকবে, ততদিন এ ধরনের প্রভেদ থাকাও অনিবার্য। ধনতান্ত্রিক দেশেও রুচি শ্রেণীনির্ভর নয়, বহুক্ষেত্রেই ব্যক্তির রুচি সম্পূর্ণভাবে শ্রেণী নিরপেক্ষ। বস্তুতপক্ষে আমেরিকায় বা পশ্চিম ইয়োরোপে শ্রেণী সচেতনতা তত তীব্র নয়, তাছাড়া সে সব গণতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা অনেক বেশী বলে শিল্পীদের স্বাধীনতা আরো ব্যাপক ও গভীর। তিনি তবু বললেন যে শীঘ্রই এমন দিন আসবে যে ধনসম্পদে সোভিয়েট রাষ্ট্র পৃথিবীর সমস্ত দেশকে অতিক্রম করে যাবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও যেদিন সোভিয়েট নাগরিকের জীবনের মান অধিকতর উন্নত হবে সেদিন সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিল্পীর যে সুযোগ সুবিধা মিলবে, ধনতান্ত্রিক দেশের শিল্পী বর্তমানে তার কল্পনাও করতে পারে না। আমি আবার বললাম যে ভবিষ্যতে কি হবে তা ভবিষ্যতই বলতে পারে এবং তাঁর স্বপ্ন যেদিন সফল হবে সেদিন যে সোভিয়েট ব্যবস্থাও বদলাবে না সে কথা কি জোর করে বলা যায়? স্টালিনের মৃত্যুর পর পাঁচ ছয় বছরে সোভিয়েট রাষ্ট্র যেভাবে বদলিয়েছে এবং এখনো বদলাচ্ছে তাতে হয়তো বর্তমান কালের দৈন্য ও অভাবের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট নাগরিকের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারাও অনেকখানি বদলে যাবে। এ কথার তিনি কোন উত্তর দেননি।

চিন্তা ও সৃষ্টির স্বাধীনতা ব্যাহত হয়েছে বলে সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিল্পকলার বিকাশ আশানুরূপ হয়নি একথা মানতেই হবে। শিল্পের অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিভার বিকাশ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে হয়, ত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠতম শিল্পী তাঁদের শিল্প প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশের পরিচয় দিয়েছেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রে কিন্তু যাঁরা শিল্পসৃষ্টিতে আজো অগ্রণী, তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই রুশ বিপ্লবের পূর্বযুগের মানুষ। বিপ্লবের চল্লিশ বৎসরের মধ্যেও যে এতবড় প্রাণবন্ত জাতির মধ্যে কোন বিস্ময়কর শিল্প প্রতিভার আবির্ভাব হয়নি তা বোধ হয় আকস্মিক নয়। সৃষ্টির স্বাধীনতার সঙ্গে শিল্পবিকাশের

নিগূঢ় যোগ আরেকভাবে বোঝা যায়। সঙ্গীত ও নৃত্য আকাদমীতে বোধ হয় রাষ্ট্রীয় মতবাদ এবং সুসংবদ্ধ চিন্তাধারার প্রভাব সবচেয়ে কম। সঙ্গীতের প্রকাশে ও নৃত্যের অভিব্যক্তিতে বুদ্ধির চেয়ে আবেগের স্থান বড় এবং আবেগের যে রূপ এই দুটী কলাশিল্পে মূর্ত হয়ে উঠে, তার মধ্যে প্রত্যয় বা ধারণার বিশেষ অবকাশ নেই। অবশ্য সেখানেও টীকাকাররা নানারকম ভাষ্য করে থাকেন। একটা বাজনা শুনিয়ে বলা হল যে ধনতান্ত্রিক পৃথিবীর সাদাকালো জাতির দ্বন্দ্বকে ভিত্তি করেই এ সঙ্গীত রচিত হয়েছে, কিন্তু ধনতন্ত্র বা বর্ণসংঘাত বাদ দিয়ে যদি কেবলমাত্র মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষের সঙ্গীত হিসাবে তাকে গ্রহণ করা যায় তবে কিছু বলবার থাকে না। এমন কি মানুষের সমস্ত সম্পর্ক অস্বীকার করে ভূমিকম্প বা ঝড়ের বাজনা বাজাতে চাইলেও একই ধরনের স্বর সঙ্গতির পরিচয় মিলবে। নৃত্যকলার বেলায়ও প্রত্যক্ষ আবেদনই তার প্রাণ, তার ভাবগত তাৎপর্য কি তা না বুঝেও নৃত্য এবং সঙ্গীত উপভোগ করা যায় বলেই সমস্ত ভাষা ও অভ্যাসের বাধা অতিক্রম করে এক দেশের সঙ্গীত ও নৃত্য অন্যদেশের মনকে এত সহজে এত গভীরভাবে স্পর্শ করে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে শ্রেণী সংঘর্ষের উপর এত জোর দেওয়া সত্ত্বেও প্রায় সমস্ত সোভিয়েট ব্যালে বা নৃত্যনাট্যই যে রাজতন্ত্র বা ধনীদের জীবনবিলাস নিয়ে রচিত এবং সোভিয়েট নাগরিক সানন্দে সাগ্রহে তাকে স্বীকার করে এটাও লক্ষ্য করবার বিষয়।

সঙ্গীত ও নৃত্যের এ স্বাধীনতা বোঝা যায় কিন্তু দেখে আশ্চর্য হলাম যে চিত্রকর বা সাহিত্যিকের তুলনায় বরং নাট্যকারই সোভিয়েট রাষ্ট্রে অনেক বেশী স্বাধীনতা লাভ করেছেন। বস্তুত নাট্যকার আজকাল যেভাবে প্রকাশ্যে সোভিয়েট শাসন ব্যবস্থার গলদ নিয়ে সমালোচনা করছেন, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। সার্কাসে দেখলাম যে রাষ্ট্রশাসকদের ত্রুটি নিয়ে অভিনয়েই জনসাধারণ সবচেয়ে বেশী সাড়া দেয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সার্কাস-অভিনেতা যখন ডিরেক্টরের ভূমিকায় নেমে বললেন যে ডিরেক্টর হয়েছেন বলে এখন আর তাঁর পরিশ্রম করবার কোন প্রয়োজন নেই, এখন কেবল অন্যের উপর হুকুম বরদারী করেই তাঁর সময় কাটে, আর বিনা পরিশ্রমে ভাল খেয়েদেয়ে শরীরও বেশ মুটিয়েছে, তখন উপস্থিত জনতা কলহাস্যে তাঁর সমর্থন করে। সঙ্গীত, নৃত্য এবং নাটকে তাই স্বাধীনতার প্রসার অনেকখানি বেড়েছে, চিত্রকলায় স্বাধীনতার আভাস মেলে, কিন্তু লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতা মনে হল সবচেয়ে কম।

তার হয়তো কারণও রয়েছে। সমস্ত শিল্পকলার মধ্যে সাহিত্যেই চিন্তা ও ধারণার প্রভাব সবচেয়ে বেশী। বস্তুতপক্ষে সাহিত্যের সৃষ্টিতে আবেগ ও বুদ্ধি যেভাবে পরস্পর নির্ভর, বোধ হয় অন্য কোন শিল্প সৃষ্টিতে তার পরিচয় মিলবে না। সঙ্গীতের প্রকাশেও অন্তর্নিহিত ঐক্য রয়েছে, কিন্তু সে ঐক্যে ধারণা বা প্রত্যয়ের স্থান গৌণ, এমনকি বুদ্ধির স্বাভাবিক গতিও সেখানে আবেগ মিশ্রিত হয়ে এক অপরূপ রূপ নেয়। চিত্রকলা ও নৃত্যের বেলায়ও একথা খাটে, কারণ চিত্রে বর্ণ ও রেখার সঙ্গতির মধ্যেই চিত্রকর নিজেকে উপলব্ধি করেন, প্রত্যয় বা বুদ্ধির ওপর বেশী ঝোঁক দিলে চিত্রের বহুক্ষেত্রে স্বরূপ-হানি হয়। নৃত্যের বেলায়ও ছন্দ ও গতির সঙ্গে বর্ণসুষমা মিলে আমাদের চিত্ত বিনোদন করে, কোন দর্শন বা ভাবধারার স্থান সহজে সেখানে মেলে না। প্রত্যয় ও ধারণাকে অতিক্রম করে মানুষের আবেগকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে বলে নৃত্য চিত্রকলা ভাষার সমস্ত বাবধানকে অগ্রাহ্য করে দেশকালনির্বিশেষে সকলের প্রিয়।

সাহিত্য—এবং নাটকলাও সাহিত্যের অঙ্গ—ভাষা নিয়ে কারবার করে এবং ভাব ভিন্ন

ভাষার কোন তাৎপর্য নেই। ধারণা বা প্রত্যয়ের অস্তিত্ব না থাকলে ভাষা আর ভাষা থাকে না, কেবল আওয়াজ বা শব্দসমষ্টি হয়ে দাঁড়ায়। সাহিত্যে তাই পদে পদে দর্শনচিন্তার ইঙ্গিত মেলে এবং আবেগের রঙে তা যতই রঞ্জিত হোক না কেন, ভাবনাচিন্তাকে অস্বীকার করলে তা আর সাহিত্য থাকে না। সোভিয়েট রাষ্ট্রে মার্ক্সবাদের প্রতি যে উগ্রবিশ্বাস, তার ফলে সাহিত্য সৃষ্টিতে পদে পদে যুক্তিতর্ক ধারণার প্রভাব দেখা দেবে একথা তাই বিচিত্র নয়। বরং আশ্চর্যের কথা এই যে রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যমান নাটকে নাট্যকার যুক্তিধারণার বন্ধন সত্ত্বেও এতখানি স্বাধীনতা লাভ করেছেন। বোধহয় নাটকের যে দৃশ্যমান দিক, তার প্রাধান্যের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের চেতনায় বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাব বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ও শ্রদ্ধা। আগামী সংখ্যায় তাই সোভিয়েট রাষ্ট্রে বিজ্ঞানের স্থান ও সোভিয়েট মানসিক জীবনের সমস্ত স্তরে তার প্রভাবের বিষয়ে আলোচনা করতে চাই।

কবিতা

নীরবতায়

অরুণ মিত্র

শুক্‌নো খাস পাতার নীচে আশ্চর্য নড়াচড়া
আমাদের হারানো স্মৃতির মতো,
রাত্রি খুঁড়ে জলের ধারা ছুঁতে হবে,
এলোমেলো ছায়ায় ধূসরে সবুজে
আন্দোলিত আমরা দু'জন।

এত কথা বলা হল
বছর ঘিরে মাস ঘিরে মিনিটে মিনিটে
তবু আমরা অন্যমনস্ক
এত চীৎকার শুনেও শুনিনি,
তোমার প্রেম আমি রেখেছি
নিশ্চুত চোখে দুপুরের কোলে নীরবতায়
সম্পূর্ণ নীরবতায়।

একটা আলো নিয়ে কেউ হাঁটছিল
কোথা থেকে কোথায় জানি না,
তুমি হাসলে
তোমার ঠোঁট যেন দিগন্তে আঁকা হ'য়ে গেল,
তার দিকেই আমরা চলেছি,
আমার আঙুল তুমি দেখতে পাওনি
কিন্তু তোমার মন তার স্পষ্ট ছবি ফোটাল।

সে তো আমাদের ইচ্ছারই দিগন্ত
প্রত্যেক মুহূর্ত থেকে বেরিয়ে চলো চলো—
তারপর আর কোনো রেখা নেই
তারপর অপূর্ব নির্জন সমারোহ
আমাদের অন্ধকার মুখের উপর খালি শিশির।

তোমায় এতদূর আনলুম,
কোথাও কোনো রাস্তার নাম লেখা ছিল না
তবু প্রশ্ন করার কথা তোমার মনে হয়নি।
এসো এবার আমরা অপলক চেয়ে থাকি
সমস্ত ঋতুর জানলা দিয়ে
যদি হঠাৎ দেখা যায়
ভয়-ভাঙা সুন্দর মাটি।

সত্তার উপলব্ধি

হরপ্রসাদ মিত্র

প্রকাণ্ড বাড়িটা, রাস্তা, সামনেই বিশাল দরজা—
ভেতরে মসৃণ সিঁড়ি, এক-দুই উঠলুম তেত্রিশে,
দালান পেরিয়ে ঘর,—ঘরে ঢুকে ডাইনে টেবিল
যেখানে বসতুম আমি সেই যবে ছিলুম তেত্রিশ।
পুরোনো কলমদানি নেই, সেটা গিয়েছে বদলে।
চেয়ার, টেবিল, ঘর আছে সবি, তবু সে তো নয়;
আমার জায়গাতে ও কে? যুবকটি আমারই মতন
অর্থাৎ ছিলুম আমি যেমন সে সুদূর তেত্রিশে।

জানলায় রোদের দ্যুতি, পর্দায় ঈষৎ কাঁটি ঢেউ,
টুলে আজো গণ্ডারাম বসে বসে ঢুলছে দেখলুম;
দেয়ালে দেয়াল-ঘড়ি—নিষ্কলঙ্ক বারোটা-পঁয়ত্রিশ
সময় গোটানো ফিতে খুলছে তা জীবের জীবনে
বীজ থেকে অঙ্কুরেতে, কিশলয়ে, আশ্রয়-শাখাতে
জীবনবিহঙ্গপুঞ্জে,—মৌন থেকে মহা রামায়ণে!

সময় অখণ্ড এক, অভিব্যক্তি ফিরে যায় ধ্যানে—
সব আলো-অন্ধকার, আবির্ভাব-তিরোভাব সবি
ঝর্নার মর্মর, স্তব্ধ পাহাড়ের প্রাকার, আকাশ,
ভাথরা, ভিলাই,—এই ভারত ও চীনের সেপাই,
পরম স্থবির মাটি কিংবা কোনো দুর্দম টাইফুন—
সমস্ত পরমহংস, জগতের সমস্ত শকুন॥

লাল খাতা, নীল বই, গেরুয়া কলম,
কয়েকটি প্রজ্ঞা বাঁধা বিভিন্ন বচনে,
কিছু প্রকৃতির ফুল স্মৃতির সুতোতে—
কয়েক আশ্চর্য ক্ষণ যাকে বলে প্রেম,
ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রহে সুখে ও অসুখে
স্বতঃসিদ্ধ দেখলুম জীবিত নিজেকে।

জানলায় অম্লান-রৌদ্রে কলকাতার বিশাল বিস্তার
দেখে চোখে জল এলো!
ফিরলুম নিজস্ব গলিতে।

চতুর্দশপদী

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

অন্ধ অপঘাতে নয়, এ মৃত্যু নিশ্চিত।
নিজেই বয়েছি তাকে সমাধির নীড়ে।
অমোঘ শক্তির কাছে হই সংকুচিত,
নিঃশেষে বিসর্জি শেষ অশ্রু বিন্দুটিরে।
প্রতিটি মৃত্যুর পাশে অনন্ত বন্ধন,
অনন্ত যাত্রীর পথে প্রতিটি বিরাম
দ্রুত পদক্ষেপে আসে হৃদয় স্পন্দন :
মৃত্যুর ঐশ্বর্যে ধনী প্রিয়তম নাম।

হে প্রাণ, হে মহাপ্রাণ, হে আত্মা তুহিন
মর্মর তোমার হাত প্রতিটি সন্ধ্যায়
খুঁজেছে রজনীগন্ধা, রাত্রির অধীন
ভোরের শিশির তুমি সঁপেছ তারায়।
তোমার মৃত্যুই প্রেম, অনির্বচনীয়।
সুষুপ্তি স্বপ্নের খনি, ছায়া কিবা প্রিয়।

জাপানী ধরনের কবিতার গুচ্ছ

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

হারানো স্মৃতি

নদীর ওপারে শাদা বাড়িটার কাছে
কেউ তো জানে না কেন হারানো দিনের স্তূপে
কনকচাঁপার মন চাপা প'ড়ে আছে।

ভোজের শেষে

সচল একটি ডেলা পশমের তাল
ফুলদানীটার পাশে—ভোজের শেষের কিছু এ'টো-কাঁটা পেতে
খাবার টেবিলে ঘোরে রূপসী বেড়াল।

অসঙ্গতি

ক্ষুরের পুরনো ব্লেড্—প্রৌঢ়ের কাম;
জীবনের বেলাশেষে জানলার ধারে ব'সে ভাবে ফ্যালারাম
নবযুবতীর কাছে কী বা তার দাম।

ক্লান্ত গৃহিণী

'ফাওয়ার ভাস্'-এ বসলো এসে মৌমাছি একরাত্তি—
ক্লান্ত মিলি ভাবলো দেখে নটীর জীবন কী বা এমন মন্দ?
কী-ই বা ভালো স্বামীর সঙ্গে নিত্য বেশ্যাবৃত্তি?

মধ্যরাত্রে

শত শত স্মৃতিচিত্রে কারুকৃত হয় যেই মন—
পৃথিবী ঘুমোয় আর নিশীথের ঘড়ি বাজে; দেখিনি তো চেয়ে
ডায়ালে রাত্রির মুখ বিচিত্রিত হয়েছে কখন।

কথা

আলো যেই নেভে আর অন্ধকার মনে হয় মৃত
মহাদেশ। যেখানে আবছা সব। আকাশে তারারা আর
মনের বিরলে শুধু কয়েকটি কথা আলোকিত।

বিনিময়

তোড়ার একটি ফুল কবে যেন তোমাকে দিলাম।
শুধালে—কী দেবো এর বিনিময়ে? বলি—কিছু নয়,
প্রাণের আলোয় ফোটা শুধু এই হাসিটি নিলাম।

কুসুমের বিলাপ

'ফুটি ও ফোটাই তবু অভিমানী গালের লাল।
বৃথা ঝরে যাই, ছোঁয় না আর সে সাজি-হাতে-করা দরদী হাত।'
...বললো হাওয়ায় দোলানো ঝুমকো ফুলের ডাল।

উড়িষ্যার কোনো পরিত্যক্ত মন্দিরে

শতাব্দী মূর্ছিত হেথা; খিলানের অন্তরালে কে ও কথা বলে?
হা হা করে হাওয়া আর প্রাচীরকন্যারা কাঁদে অন্ধকার কুলুঙ্গীর পাষাণ-বিবরে,
চামচিকের গন্ধভরা প্রতিধ্বনিমান তুঙ্গ বিমানের তলে।

কানাগলির দুপুর

একতলা জীর্ণ বাড়ি, দোর আধো মেলা।
ছায়ায় কুকুর ধোঁকে, আঁস্তাকুড়ে রোদ লেগে গন্ধ ওঠে, মাছি—
পড়ে আছে আঁষ-পোঁটা, বিড়ালছানার শব, কবে ওটা হয়েছিলো ফেলা।

প্রহেলিকা

মাটিতে মরণ তবু তারি বুকে কী অমর আকাশ-পিপাসা!
শুধালো নক্ষত্র-রাত্রি। বিকীর্ণ দিগন্ত জুড়ে নিরুত্তর তন্দ্রালগ্ন কাঁপে—
বঙ্কিম কৌতুকে ঝোলে মহাশূন্যে ক্ষীণ শশিকলার জিজ্ঞাসা।

প্রস্তুতি

অরুণকুমার সরকার

পরিপাটি চুলগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে
নিটোল তর্জনী কামড়ে লোনা রক্ত খাই
আরশিতে যে-লোকটা হাসছে তাকে আমি মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে
দরজা খুলে দুড়দাড় নিচে আরো নিচে চলে যাই।

অপেক্ষা করছে না কেউ। উত্তরের হাওয়া
ধুলোয় বিভ্রান্ত ক'রে দুমড়ে দেয় পা।
এই কি যন্ত্রণা সেই সব হারিয়ে যথাসর্ব পাওয়া
যা নাকি একদিন শিউরে দিয়েছিল গা।

না তো। আরো নিচে তবে। নরকে পাতালে
নিরন্ধ্র অসূর্যলোকে পাথরের ফুল
প্রেমের মতন তীব্র, মৃত্যুর কঠিন ঘুম চোখে
কে নারী ঝঞ্ঝার সমতুল।

কবিতা, তরঙ্গভঙ্গ, অসুস্থ আবেগ
আমাকে যন্ত্রণা দাও, মাটি খোঁড়ো লোহার আঁচড়ে।
উপরে সাজানো ঘর, জানালায় রক্তহীন মেঘ
আমাকে গভীরে টানো, মারো, ঢাকো ধূসর চাদরে।

এখন প্রস্তুত আমি। ভেঙেছি লোহার তালা, ইটের দেয়াল।
নির্জন প্রান্তরে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। হাত
তুলেছি ঊর্ধ্বলোকে নিম্নাঙ্গে ঢেউয়ের করতাল।
এই তো সময়, হানো তীব্রতম তোমার আঘাত।

কনখল

মনীশ ঘটক

টিলা থেকে নীচু জমিন। পোলো স্কারির পর গোল্লাছুট। সাহেবী থেকে দিশী পাড়া। ন' বছরের জীবনে কনখল মেনে নিয়েছে—এমনিই হয়। বহুরূপী গিরগিটির মত রং বদ্‌লে যাচ্ছে বাড়ী সুদ্ধ সবার। বাবুর্চিখানা আছে, ঠাকুরের হে'সেলও হয়েছে ভেতর বাড়ীতে। দিনের খাওয়া পি'ড়েয় বসে, কাঁসার থালায়। ভাত, মাছ, শাক, সুক্ত। রাতে আগের নিয়মে কাঁটা চামচের টুং টাং—সুপ, কাটলেট, রোস্ট, পুডিং। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কনখলের উদারতা বাড়তে থাকে। নিভাননীর পায়ে আর অষ্টপ্রহর চটি থাকে না। হৃষিকেশ কাছারী ফেরৎ বাইরের বারান্দায় জমিয়ে বসেন। জমিদার প্যারীবাবু, কলেজের বিদ্যাভূষণ মশায় নিয়মিত সঙ্গী। চা চলে, নিভাননীর নিজের হাতে তৈরী, ঠাকুর দিয়ে যায় বাইরে। বিদ্যাভূষণ মশাই নিজের হুঁকো সাথেই আনেন, হৃষিকেশ প্যারীবাবু চুরোট টানেন।

প্যারীবাবু কথাই বলেন না, মৃদু মৃদু হাসেন শুধু। বিদ্যাভূষণ অনর্গল বকে যান। অনেক শক্ত শক্ত তত্ত্বকথার আমদানী হয়, কনখল তার একটাও বোঝে না।

হরেন চাকী মশায় উকীল, রোগা শুটকো চেহারা। তিনি যেদিন আসেন, খুব হাসির হৈ হল্লা ওঠে। পণ্ডিত মশায় বলেন,—এস এস 'নিঃস্বার্থ চাকী', আজকের খবর বলো।

হৃষিকেশ বলেন,—হরেনবাবুর খবর খারাপ কেন হবে? ওঁরা "Conscience to them is a marketable thing which they sell to the highest bidder." আমার কথা নয়, কান্তকবির।

বিদ্যাভূষণ বলেন,—ঠিক। উকীলরা,—ওরা বাদীকেও বলে "হ্যালো,
তোমার মামলা ত অতি ভালো!"
আবার প্রতিবাদী এলে বলে "জিতে দেবো,
কত টাকা দেবে, ফ্যালো!"

হরেনবাবু জাত উকীল। কোনঠাসা হয়ে ঘাবড়াবার লোক নন। পাল্টা জবাব দেন, —যদি কান্তকবির নজীর ওঠালেন, তবে শুনুন। ডেপুটিরা?
"তাঁরা দেখ্‌তে ছোক্‌রা বটে,
কিন্তু কাজে ভারি চট্‌পটে;
যাঁহা এজ্‌লাসে বসে,—মেজাজ রুক্ষ
চট্‌ করে ওঠে চটে।
তাঁদের বয়েসটা খুব বেশী নয়,
আর এই পোষাকটাও এদেশী নয়;
আর এই হাম্‌বড়া ভাব তাঁদের অস্থি-
-রক্ত-মাংস-পেশীময়!
কিন্তু সাহেবটি ভালোবেসে
যদি কাণ মলে দেন কসে,
ঐ করকমলের কোমলতা করে

অনুভব হেসে হেসে।
এই নাসায় বিলিতি গুতো,
আর এই পৃষ্ঠে বিলিতি জুতো,
একটু দৃষ্টি-কটুতা-দুষ্ট হলেও
তুষ্টিময় বস্তুতঃ!"

আর বিদ্যাভূষণ?
—"যদিও ছোঁয়নি সংস্কৃত কেতাব,
তবুও 'বিদ্যাভূষণ' খেতাব,
কিন্তু কিচ্ছু জানে না, বলে কোন ভেড়ে?
মুখের এমনি প্রতাপ!
শুদ্ধ আর্কফলাটি পুষ্ট,
যত নচ্ছার ছেলে দুষ্ট,
কি বিষ নয়নে ঐটে দেখেছে,
কাট্‌তে পেলেই তুষ্ট!"

টিকি কাটবার প্রসঙ্গে কনখল ঘরের ভেতর মায়ের কোলে মুখ গুঁজে খিলখিল করে হাসে। নিভাননীও মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসেন। কিন্তু বাইরে প্যারীবাবু উস্‌খুস্‌ করতে থাকেন। হরেন উকীলের মুখ খুলেছে, রেহাই তিনিও পাবেন না, জানেন। হৃষিকেশ সহাস্য মুখে বলেন,—আরে প্যারীবাবু সম্বন্ধে লিডিং কিছু বলুন হরেনবাবু,—কোনো নজীর টজীর,—

—আলবৎ। ঐ কান্তকবিই আজকে চল্‌ক।
"মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই যে পুরো পাঁচ হাত লম্বা,
সাধু সেই যে পরের টাকা নিয়ে দেখায় রম্ভা!
রসিক সেই যার ষাট বছরে আছে পঞ্চম পক্ষ,
সেই কাজের লোক চব্বিশ ঘণ্টা হুঁকো যার উপলক্ষ্য—"

—আরে থামো হে হরেন। ছেলেপুলের বাড়ী, কি আবোল তাবোল বক্‌ছ?

প্যারীবাবু যদিও ষাট বছরের বুড়ো নন, কিন্তু সম্প্রতি তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করেছেন। হরেনের আলগা মুখে যা আসবে তাই বলে বসবে। এ প্রসঙ্গ থামাতে চান তিনি।

কনখল শেষের দিকের ছড়ায় হাসির কিছু পায় না, কিন্তু নিভাননী মুখে আঁচল দিয়ে হাসি চাপেন।

হৃষিকেশ এ ধরনের সান্ধ্য বৈঠকে খুব মজা পান, বুঝতে পারে কনখল, কিন্তু প্রাণ খুলে মেশেন না। কারণ না বুঝলেও এটুকু সে বোঝে যে তার বাবা একজন সাহেবলোক, ধুতিচাদর পরতে সে তাঁকে ক্বচিৎ দেখেছে। বাবাকে মানায় ঘোড়ার পিঠে, শিকারের পোষাকে, কাছারী যাবার সময় সাইকেলে। ঐ দুচাকার গাড়ীতে চড়ে মানুষ চলে কি করে, ভাবতে অবাক লাগে ওর। দেয়ালে ঠেস দিয়ে অথবা কাঠের দাঁড়ে ঝুলিয়ে না রাখলে যে গাড়ী সোজা হয়ে থাকে না, রাখতে গেলে ধুপ করে পড়ে যায়, তাতে চড়ে অত জোরে চলে যান বাবা, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। ঝোলানো সাইকেলের চাকা হাত দিয়ে ঘুরোতে বেশ লাগে। ঘণ্টা বাজাতেও জানে, তবে আওয়াজ হলে লোক জানাজানি হবে, সে ভয় আছে। একবার পা'দানের শেকল ঘোরাতে গিয়ে আঙুল কেটে গিয়েছিল, সেই থেকে নিভাননীর বারণ আছে

ঐ যন্তরটা ঘাঁটাঘাঁটি করতে। কিন্তু হাত না কেটেও কি করে জিনিষটির সাথে অন্তরঙ্গ হওয়া যায় সে লোভ ওর মনে মনে আছে।

তিনচাকার সাইকেল আছে ওর একটা, সাতবছর বয়েসে কেনা। ও এখন বড় হয়েছে, তিন চাকায় চড়তে লজ্জা করে। তা ছাড়া, ঘোড়ার পিঠে যার অনায়াস দখল, সে যাবে কিনা পুঁচকেদের মতো ষ্ট্রাইসিক্‌লে চড়তে। যদি চড়তে হয়, বাবার মতো ওই বাইসিক্‌লেই চড়বে ও। ফাঁক খুঁজছে শেখ্‌বার জন্যে। অমৃত চড়তে জানে, বলেছে সুবিধে পেলেই শেখাবে।

বাড়ীর সামনের রাস্তা দিনকতক হোলো একটা খোয়া কাঁকড় ভাঙবার গাড়ী এসেছে, অনেকটা রেলের এঞ্জিনের মতো দেখ্‌তে। ইয়া জগদ্দল পেছনের চাকা, চাঁই চাঁই পাথর ইঁট গুঁড়িয়ে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে। চলবার সময় কী আওয়াজ, আর ধোঁওয়া। একদিন খাসিয়া ড্রাইভার ওকে উঠিয়েছিল সেই গাড়ীতে। চলে আস্তেই, কিন্তু চড়েই কনখলের মনে হয়, আরো ঢের ঢের জোরে চলবার ক্ষমতা আছে ওটার। রামায়ণের সেই বিরাট কুম্ভকর্ণের ছবিটা মনে পড়ে—চাঁই হয়ে শোয়া ছবিটা—বানরেরা দড়ি দড়া দিয়ে বাঁধ্‌ছে। ও জানে, দৈত্য পাশ ফিরলেই দড়িগুলো পটাপট্ ছিঁড়ে যাবে আর হাজার খানেক বানর পড়বে চাপা। গাড়ীটাও তেম্‌নি একটা শক্তিধর দৈত্য, যা পারে যেন তার এক কণা অংশের পরিচয় দিচ্ছে ঢিমে তেতালা তালে চলে। ইচ্ছে করলেই যেন ওটা পাহাড় পর্বত গুঁড়িয়ে অনেক জোরে চলতে পারে।

মা উঠে যান ভেতর বাড়ীতে, পাশের বাড়ীর কারা যেন এসেছেন, গিন্নীবান্নিরা। কনখল উঠে নিজের ঘরে আসে, শোবার-পড়বার ঘর। ঢাকা বারান্দার লাগ্ পুবে। এটা ওটা বই নাড়ে—মন বসে না।

বিকেলের চা হয়েছে ভেতরের হে'সেলে, রহমৎ অবসর। বুড়ো এসে কনখলের ঘরে ঢুক্‌তেই ও উল্লাসে লাফ দিয়ে ওর হাত ধরে টেনে বসায়। নিজে পাশে বসে। বলে,—আজ গল্প বলতে হবে, খালি বড়দের গল্প সব মাকে শোনাও তুমি।

—আচ্ছা, আচ্ছা হবে। আকবর বাদশার নাম শুনেছ কনা বাবা?

—নিশ্চয়। "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"। সমস্ত ভারতবর্ষের রাজা ছিলেন তিনি।

নিভাননীর বইয়ের দপ্তরে "প্রতাপসিংহ" নাটক ছিল। বুক্‌কে না বুক্‌কে, গোগ্রাসে পড়েছে। আকবর, প্রতাপ, শক্তসিংহ, মানসিংহ নামগুলো জানা আছে ওর।

—সমস্ত হিন্দুস্তানের নয় বাবা, বাংলা দেশের কোন কোন জায়গা তখনও শাহান শাহের তাঁবেতে আসেনি। ছোটখাটো রাজায় তখন বাংলা দেশ ভর্তি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন চালাক, তেম্‌নি বীর। বাদশাহের ফৌজ যখনই আসে, খানা পিনায় তাদের তুষ্ট করে দেশে ফেরৎ পাঠায় তারা, লড়াই বড় একটা করে না। অতবড় দিল্লীর বাদশার কত সৈন্য, কামান, গোলাগুলি! পারবে কেন লড়াই করে তাদের সাথে?

—কিন্তু বীরেরা ত দেশের জন্যে লড়াই করে মরে যেতেই ভালোবাসে; তাতেই ত তাদের খুব নাম হয়।

—দূর বোকা ছেলে। লড়াইয়ে হেরে যদি দেশ চলে গেল অন্যের হাতে তবে লড়াইয়ে লাভ? বুদ্ধিমান লোক তা না করে', কৌশল করে। বাংলা দেশের এমনি এক রাজার নাম ছিল ঈশা খাঁ। তাঁরই একটা বীরত্বের কেস্‌সা শোনাব তোমাকে।

কেস্‌সা মানে কেচ্ছা নয়, গল্প; কুৎসা নয়, শাস্তর; এ জ্ঞান কনখলের হয়েছে অনেক

শুনে শুনে। সে সাগ্রহে রহমতের গা ঘেঁসে বসে বলে,—বলো রহমৎ—শিগ্‌গির।

—বলি, শোন। এখন হয়েছে কি, দুতিন বার নানান ফন্দী-ফিকির করে ঈশা খাঁকে বশে আনতে না পেরে, শেষ পর্যন্ত আকবর বাদশা সেনাপতি মানসিংকে পাঠালেন বহুৎ ফৌজ সাথে করে, গোটা বাংলা দেশ জয় করে ফেরবার জন্য। মানসিং একে ভারী জবরদস্ত জংবাজ; তাতে সঙ্গে বন্দুক কামান সিপাই অগুন্‌তি। ছোটখাটো রাজাদের মধ্যে অনেককে হারিয়ে দিলেন তিনি।

—তাদের রাজ্য সব আকবরের হয়ে গেল?

—হোলো বৈকি। ঈশা খাঁর রাজত্বে পা দিয়ে মানসিং দেখেন কি, কোথাও যুদ্ধের তোড়জোড় নেই। ভারী দুর্গ খিজিরপুর—চড়াও হয়ে মানসিং দেখেন বিলকুল খালি। বারুদ, রসদ, কামান, বন্দুক—সব হাওয়া। এইভাবে লড়াই না করেই একটার পর একটা পরগণা দখল করতে করতে মানসিং তাজ্জব হয়ে ভাবলেন ব্যাপার কি, ভয়েই পালালো নাকি লোকটা!

—ঈশা খাঁ ভয়ে পালিয়ে গেলো?

—আরে না না—শোনোই না। শেষমেশ মানসিং এগারোসিন্দুর বলে একটা জায়গায় এসে দেখেন, দুর্গের ওপর ঈশা খাঁর নিশান উড়ছে। কাছাকাছি তাঁবু খাটিয়ে তিনি লড়ায়ের তোড়জোড় করতে লাগলেন। ওখানেই গল্প শুনলেন, তাঁর আগে আর এক সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ ঈশা খাঁর হাতে লড়ায়ে হেরে পালিয়েছে—ঐখান থেকেই। গোঁফে চাড়া দিয়ে মানসিং ভাবলেন, যে আচ্ছা, দেখা যাবে। সাহাবাজ মানসিং এক চিজ্ নয়। এবারে বাঙালী-গুলোকে কচুকাটা করে ফিরতে হবে, মনে মনে তারই মহড়া দিতে লাগলেন সিংজী।

এখন হয়েছে কি, ঈশা খাঁ আক্রমণ করলে পাল্টা জবাব দেবেন মানসিং, এই তাঁর মৎলব। কারণ তাঁর সৈন্যবল অস্ত্রবল বেশী, আর ঈশা খাঁর কম। শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকার যুদ্ধে ঈশা খাঁ হারবেই হারবে। কাজেই গুঁ পেতে বসে থাকা ছাড়া মানসিং আর কিছু করলেন না।

ঠিক ঐ কথাই ভেবে নিয়েছেন ঈশা খাঁ। তাই তিনি হানা দেওয়া স্থগিত রেখে দিন গুনছেন, কিন্তু তাঁর খুদে সেনাপতিরা অস্থির হয়ে উঠেছে। বাঙালীর দলের হিন্দু-মুসলমান সৈন্যদের শিক্ষাদীক্ষা দিল্লীর ফৌজের তুলনায় অনেক নীরেস। ঈশা খাঁ বোঝেন সেটা, চেলারা বোঝে না, তারা যাহোক তাহোক একটা মারামারি কাটাকাটি করে দেশের জন্যে প্রাণ দেবে, এই তাদের মত। বীরের মত কথা ঠিকই, তবে নির্বোধ বীরের মত। প্রায় নিশ্চিত হার জেনে অত লোককে মরতে পাঠতে গররাজী ঈশা খাঁ। তিনি সে রাত্রে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে বসলেন, কর্তব্যের ইসারা পাবার তপস্যায়। সকালে অনুচরদের ডেকে বললেন, দেখো, কাঁচা তালিমের ফৌজ নিয়ে আমি পাকা দিল্লীওয়ালদের সাথে লড়ব না। তবে যুদ্ধ হবে। তোমরা সবুর করো, আমি মানসিং-এর কাছে দূত পাঠাচ্ছি।"

কনখল জানে, রহমতের অন্য অন্য গল্পের মতো এটাতেও শেষের দিকে গায়ে কাঁটা দেবার মতো কিছু থাকবে—হয়ত মহৎ, হয়ত চমকপ্রদ, বা ঐরকম কিছু। সে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে,

—তারপর, তারপর—কি বলল গিয়ে দূত—?

—দূত কিছু বলবে কেন—ঈশা খাঁর চিঠি নিয়ে আকবরের সিপাহ্-সালারের হাতে দিলে। চিঠিতে ছিল, 'আপনি শাহান্‌শাহ্ আকবরের সেনাপতি, আমি বাংলাদেশের একজন রাজা। যুদ্ধ আমাতে আপনাতে। তাই হোক্—আমি হারলে এ রাজ্য মুঘলবাদ্‌শার,

জিত্‌লে আমার। এ সর্তের খেলাপ নেই। অনর্থক কতকগুলো খুনখারাব করে লাভ কি! মানসিং ত চিঠি পড়ে অবাক! মনে মনে তারিফ করে সম্মতি দিলেন। পরদিন চাঁদপুরের কাছে মাঠে দু'জনের লড়াই সুরু হোলো।

বুঝলে কনাবাবা,—একদিকে মানসিং, সুবে বাংলা, বিহার, ওড়িষ্যা, পাঞ্জাব, আফগান্‌ যুদ্ধের বিজয়ী বীর—অন্য দিকে সামান্য গাঁইয়া রাজা ঈশা খাঁ। লড়াই হোলো সুরু,—দু'পক্ষের সৈন্যরা খালি হাতে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল নিজ নিজ সর্দারের লড়াই। ঈশা খাঁর তলোয়ার চালানোর কায়দা দেখে মুঘলবীরেরা হরবখত 'সাবাস, সাবাস' করতে থাক্‌ল। হঠাৎ ঈশা খাঁর তলোয়ারের ঘায়ে মানসিং-এর খাণ্ডার দু' টুক্‌রো হয়ে ভেঙে হাত থেকে পড়ে গেল। মানসিং চোখ বুজে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কখন এইবার ঘাড়ের ওপর কোপ পড়বে বলে। কিন্তু ঈশা খাঁ কি করলেন জানো কনাবাবা? নিজের তলোয়ার তাঁর হাতে দিয়ে, আর একখানা তলোয়ার নিজের জন্যে ফরমাস করলেন। বললেন, যদি দিল চায় তবে আজ রাত্রে বিশ্রাম করে চাঙা হয়ে ফের কাল লড়াই হতে পারে। মানসিং-এর মুখে কথা সরল না। হাত থেকে তলোয়ার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসে ঈশা খাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন,—ভাই, তুমি শুধু বীরই নও, তুমি মহৎ!

কনখলের গায়ে পুলক শিহরণ ওঠে। বলে,—ঈশা খাঁ ত তবে সত্যিই দয়ালু লোক। বড় লড়াই হলে কত লোক মরত, না রহমৎ?

—ঠিক্‌। আর বীরই কি কম? তলোয়ার ভেঙে যেতে মানসিং-এর গর্দান নিতে পারত, কোন দোষ হত না। কিন্তু হাতিয়ারহীন বিপক্ষের গায়ে হাত তুলল না, রাতে আরাম করে তাজা হয়ে আবার পরদিন লড়বার সুবিধে দিতে চাইল।

কনখল মাথা নেড়ে জানায়, ঠিক। মনে মনে ভাবে, বীরত্ব দেখানোর অম্‌নি সুযোগ ও যদি একটা পেত।

নিকেলের ফাঁপা নলের ভেতর প্যাঁচানো তারের স্প্রীংএ বসানো ডোমওয়ালা মোমের শেজ্‌ জ্বলছিল টেব্‌লে। আলো কমে আসতে রহমৎ বলল,—আজ বাতি বদ্‌লায়নি দেখছি হারুণ। মার কাছে চলো কনাবাবা, আমি বাতি বদ্‌লে নিয়ে আসি।

বাইরে বারান্দায় কর্তাদের বৈঠক ভাঙেনি। ভেতর থেকে প্যারীবাবুর গিন্নীর সাথে মায়ের গল্পগুজবের আওয়াজ আসছে। কনখল বিছানায় চিৎ হয়ে টান টান শুয়ে ভাব্‌তে লাগল : আচ্ছা, ঐ যে প্যারীবাবুর স্ত্রী, ও ত প্রায় আয়েষার বয়েসী কি কিছু বড় হবে। প্যারীবাবু নিজে ত বুড়ো, অর্ধেক চুল সাদা। প্যারীবাবুর ছেলে জীবন ওর গোছাছুট খেলার সাথী, কিন্তু বয়েসে বড়ো, জীবনের নতুন মা জীবনের থেকে কতোইবা বড়! অথচ কনখল শুনেছে কি পাকা পাকা কথা মেয়েটার, মার সাথে বোলচাল দেয় যেন তাঁর সমবয়েসী। দেখতে পারে না দু'চক্ষে ঐ ঊষাটাকে কনখল। মেয়েটার নাম ঊষা। ঢেপ্‌সী, মোটা, তেমন রং খুব ফরসা। হ্যাঁ, সেটা কনখল মানতে রাজী। কিন্তু কি পরিমাণ গয়না গায়ে দেয়, বাপ্‌রে বাপ, হাঁটে চলে কি করে? আয়েষার ত একটিও গয়না নেই, কিন্তু তার দিকে তাকালে কেউ চোখ ফেরাতে পারে? আর আয়েষার চোখ দুটো? যেন একজোড়া খঞ্জন পাখী, যেমন মিষ্টি, তেমনি চঞ্চল। বারে বারে আয়েষার কথা মনে পড়ে গিয়ে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে ও। দু'দিন আয়েষা আসেনি। কী যে রোজমেরী বিবির ইস্কুল হয়েছে, আয়েষা পণ্ডিত না হয়ে যায় না। অথচ এই ত সেদিনও আয়েষা ওর থেকে কম পড়তে জানত। কবে যে বাবা ইস্কুলে ভরতি করবেন ওকে।

বাতিদানে নতুন মোমবাতি জ্বালিয়ে রহমৎ ঘরে ঢোকে। এখন ত মাত্র সন্ধে পার হয়েছে। বাবা এখন টাউন হলে যাবেন। সেইটে দেশী ক্লাব। লাইব্রেরী আছে, থিয়েটরের ষ্টেজ আছে, তাস পাশা দাবা খেলার বন্দোবস্ত আছে। থিয়েটর কখনো দেখেনি কনখল। খুব ইচ্ছে করে দেখতে। শুনেছে পুজোর সময় ফী বছর থিয়েটর হয়, এবারও হবে। মাকে বলে কয়ে দেখতে হবে।

বাইরের বারান্দার বৈঠক ভেঙেছে। বাবা সেই কুকুরমুখো ছাঁড় হাতে এবার ক্লাবে চললেন বোধ হয়। ভেতর থেকে মা ডাক্‌লেন,—কংখু, আয় না এদিকে। তোর মাসীমাকে দু একখানা নতুন কলের গান শুনিয়ে দিবি আয়।

মাসীমা না হাতি। মুট্‌কির দু পায়ে মল ঝম্‌ঝম্‌, দু হাতে চুড়ি রুন্‌ঝুন্‌, একগাল হাসি। বস্‌বার ঘরে সবাই বস্‌লে রেকর্ডের বাক্‌স খুলে কনখল ফনোগ্রাফে দম লাগায়। চোংটা উষার দিকে মুখ করে পিন রেকর্ডে লাগিয়ে দেয়। বেদানা দাসী, না পান্নাকীর্তনউলি, কার যেন গাওয়া সেই গানটা বাজতে থাকে।

—কেন রং দিলি ঢং করে,
সাদা কাপড় রাঙিয়ে দিলি পিচ্‌কিরি মেরে।
আমার কালোবরণ,
কালোবরণ, ভালোবাসি,
যখন তখন তাই ত আসি,
আড়াল থেকে মুচ্‌কি হেসে
তোর পায়ে পায়ে বেড়াই ঘুরে।

ঊষা মুটকিই হোক্‌ আর জীবনের নতুন মাই হোক্‌, ছেলেমানুষ। এ গানটা তার খুব ভালো লাগে, আবিষ্কার করেছে কনখল। 'কালোবরণ'-এর জায়গায় 'কনখলের দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসে। কনখল বেশ কালো,—নিকষ নয়, উজ্জ্বল শ্যাম।

৮

ইস্কুলে ভর্তি হয়ে গেছে কনখল। প্রথমদিন বাবার সাথে প্যাণ্ট কোট পরে যেতে হয়েছিল, বিরাটবাড়ী, চাপকানআটা, হেডমাষ্টার মশায়ের ঘরে; কাটাতেও হয়েছিল কিছুক্ষণ। ভর্তি হয়ে যাবার পর তিনি নিজে এসে ওকে ওদের ক্লাস দেখিয়ে ভূগোল সার্‌ গোপালবাবুর সাথে পরিচয় করে দেন। গোপালবাবুই ওদের ক্লাসটিচার। ক্লাস ঘরটা স্কুলের বড় বাড়ীর এক অংশে নয়। স্কুলটা মস্ত বড় হাতার মধ্যে—দক্ষিণে সুরমা নদী। উত্তরে প্রকাণ্ড একটা দীঘি, তার মাঝখানটায় টলটলে জল, কিন্তু পারের কাছবরাবর প্রায় চারদিকেই কলমি সুষ্‌ণি-পানিফলের জঞ্জাল, আর সাঁপ্‌লা পদ্মর ঘন দল। বড় বাড়ীটায় সব উচুক্লাসের ঘর। কেবল নীচের দিকের দুটি ক্লাসের আলাদা দুখানা ঘর—টানা বারান্দা নদীর দিকে—স্কুলগেটের কাছে। ফাঁকা ময়দানের একটেরে প্যারালেল বার, হোরাইজণ্টাল বার, এইসব। কম্পাউণ্ডের ধার দিয়ে বড় বড় বাঁদরলাঠি, শিরীষ, আর ঝাউগাছের সার—তার ওপারে গীর্জার চূড়া দেখা যায়। তারও পর সাহেবদের কবরখানা, তবে স্কুল থেকে দেখা যায় না। সেখানেও কেবল ঝাউগাছ। গীর্জা কি কবরখানা থাক্‌লেই ঝাউগাছ থাকবে, মনে হয় কনখলের। ঢাকাতেও অমনি ছিল।

প্রথমদিন বইয়ের লিস্ট্ নিয়ে বাবার সাথে ফিরে আসে। পরদিন থেকে নিয়মিত ক্লাস করবে। কিন্তু স্কুলে পাঠানোর সময় দু একদিন হারুণের সাথে পাঠানোর পরই নিভাননী বোঝেন কনখল খুশী নয়। বলেন,—কি হোলো রে? হারুণ গেলে ত ভালো—বইগুলো নিয়ে যাবে। তা ছাড়া অতটা রাস্তা—

—ধেৎ—সব্বাই একা একা যায়, আমার লজ্জা করে।

প্যারীবাবুর ছেলে জীবন দুক্লাস ওপরে পড়ে ওর। বিদ্যাভূষণ মশায়ের ছেলে অমূল্য ত রীতিমত উঁচু ক্লাসের ছেলে। একটু দূর থেকে আসে অমূ, সেও অমূল্যর সহপাঠী। ওর সাথে পড়ে গণি মিঞার ছেলে ইক্বাল। ওরা ক'জনে একত্র হয়ে সাড়ে নটায় রওনা হয় স্কুলের দিকে। কাজীর বাজার ধরে, সুরমা নদীর ধার বরাবর টাউন হল পেরিয়ে গেলেই খেলার মাঠ। তারপর গীর্জা, তার পরেই স্কুল। মাইলখানেকের নাঁচেই হবে। একটুও কষ্ট হয় না যেতে। বিশেষ করে কাজীর বাজারে কি কাণ্ড! কতো দোকান, কতো জিনিষ। কিন্তু মুড়ি মুড়কি কদ্মা বাতাসার দোকানগুলোই সব সে সেরা! লোভ হয় সামনে গিয়ে দাঁড়াতে, মিষ্টি একটা মাতা মাতা গন্ধ ওকে টানে, কিন্তু কী মৌমাছিরে বাবা! ভিন্ ভিন্ করছে। একবার হুল ফোটালেই সর্বনাশ। ঢাকায় এক মিছরি-ওয়ালার কাঠের বারকোশে হাত দিতে গিয়ে কামড় খেয়েছিল একবার, মা ছুঁচের ডগা দিয়ে ছোট্ট কালো মত একটা কাঁটা ওর আঙুল থেকে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, মৌমাছিরা কামড়ায় না, হুল ফোটায়। কী যন্ত্রণা, ভুলবে না ও কোনদিন। কিন্তু অমূতর কি সাহস—সোজা দোকানের সাম্নে দাঁড়িয়ে এক পয়সার মুড়িমুড়কি কিনে কোঁচড়জাত করে ফিরে আসে। দু এক মুঠো ওকে দেয়, কোথায় লাগে রসগোল্লা ও জিনিষের কাছে। অমূতই একটা করে পয়সা পায় স্কুলে যাবার সময়, ওদের আর কেউ এখনো পয়সাওয়ালা নয়। আর সবারই টিফিনের খাবার হয় বাড়ী থেকে যায়, না হয় সাথে থাকে। কিন্তু টিফিন বাবদই যে ঐ এক পয়সা অমূতর বরাদ্দ প্রত্যেক স্কুলখোলা দিনে, তা কেউ জানে না। অমূত স্কুল যাবার পথে কোনদিন, কোনদিন স্কুল ফিরতি, মুড়িমুড়কি অথবা তিলের খাজা কিনে নিজে খায়, কনখলকে আর কখনো-সখনো আরও এক-আধজনকে দেয়। কনখল একদিন বলেছিল,—তুমি যে রোজ খাওয়াও, আমি ত একদিনও পারি না। আমার যে পয়সা নেই।

—চুপ কর গাধা। বড়রাই ত ছোটদের খাওয়ায়। তুই খাওয়াবি কেন?

অমূতর বয়স চোদ্দ, সে আর অমূল্য সম-বয়সী।

আর একটা মজার দোকান তিলের খাজার। কি কায়দায় জন্মলদেওয়া চিনিকে ধব্ধবে রেশমীচুড়ির মতো জেল্লাদার করে ফেলছে লোকগুলো আর মাজা তিলের আস্তর পরিয়ে একটার ওপর একটা খাজার পাহাড় ওঠাচ্ছে। কড়ায়ে ফুটন্ত ঘন চিনির ক্বাথ্ দিয়ে যখন নই টানে কাঠের হাতা দিয়ে, সে একটা বিচিত্র দৃশ্য। কি চট্পট্ হাত চলে লোকগুলোর, এক সেকেণ্ড কামাই দেয় না। খাজা ছাড়াও চিনির ছড়ি, গুলাবী রেউড়ী, এইসব বানায় ওরা। খাজাওয়ালার একটা মেয়ে আছে, তার একটা পা নেই। ছোট্ট বছর চারেকের মেয়েটা। ছেঁড়া চটের ওপর একধারে বসে থাকে। ওর বাপ মাঝে মাঝে ওকে রুক্মানিয়া বলে ডাকে। কনখল কাল দু'দানা মুড়কি বেছে দিয়েছিল ওর হাতে, গোলগাল ময়লা হাত দুটো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরম পরিপাটি করে ঐ দু'দানা মুড়কি খেল মেয়েটা, মুখে কি মিষ্টি হাসি।

কাজীর বাজারের অফুরন্ত আকর্ষণ পেরিয়ে স্কুলে পৌঁছে যায় সবাই। স্কুল বেশ

লেগেছে কনখলের, কেবল অঙ্কের ক্লাস ছাড়া। মানসাঙ্কে ও খুব চট্পটে, কিন্তু ক্লাসের অঙ্ক কষতে কেমন আলসেমি আসে। মানসাঙ্ক মজার খেলার মত! ড্রিল করার ঢং-এ সব ছেলে সার দিয়ে দাঁড়ায়, প্রত্যেকের পায়ের কাছে একটুকরো কাগজের চিরকুট ভাঁজ করা থাকে। মাষ্টার মশায়ের আদেশে উবু হয়ে কাগজ তুলে নিতে হয়, কাগজে কতকগুলো আঁক লেখা, ওপরে নির্দেশ থাকে 'যোগ কর' কি 'বিয়োগ কর' কি 'ভাগ কর'। আর লেখা থাকে, 'সময় পাঁচ মিনিট'—কি 'তিন মিনিট'। মাষ্টারমশায় ইয়া বড় ঘড়ি হাতে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে বলেন 'কাগজ রাখো'। সবাই যেখানকার কাগজ আবার সেইখানে রেখে দেয়। তখন মাষ্টারমশায় একটা টুলে বসে বলেন, 'নিয়ে এস'। ওরা এক এক করে নিজ নিজ কাগজ নিয়ে যায়। এই অঙ্কের খেলাতে আজ দিন চার-পাঁচের স্কুল জীবনে ওর একদিনও ভুল হয়নি। ওর সহপাঠি ইকবালের রোজ 'রং' হয়, আর দশ মিনিট নীল্ডাউন হয়ে থাকে। নীল্ডাউন হওয়া খুব কষ্টের, আর ভীষণ লজ্জার। ইকবালের লজ্জার কথা ও বুঝতে পারে না, কারণ পাজিটা উঠে এসেই খুব হাসতে থাকে। তবে কষ্টের কথাটা একদিন গোল্লাছুটের মাঠে ওর খেলার গুরু অমূতকে জিজ্ঞেস করেছিল। অমূত একটু উচ্চস্তরের হাসি হেসে বলেছিল,—ও আর কি, সব ঠিক করে দেখ্খন।

দিয়েওছিল ঠিক করে। এক রবিবার দুপুর বেলা অমূত এসে ডাক দিল।

—চল, দিনের বেলা ঐ কবর তিনটে দেখে আসি।

—মা যদি বকেন?

—দিনে দুপুরে গেলে বক্বেন না। আর আজ ত রবিবার।

কনখল যা শোনে তাই বিশ্বাস করে। শুনেছে মঙ্গলবার রাত্রে ওদিকটায় ভয়ের কিছু হয়ত আছে, কিন্তু রবিবার দুপুরে আবার কি হবে। দু'জনে বেরিয়ে পড়ে। কবরগুলো ছেড়ে হাতিমারার বাবুদের পোড়ো কাছারি বাড়ী, তার পর আবার বনবাদাড়। কাছারি বাড়ীর মাঠে গিয়ে অমূত ওকে তালিম দিতে সুরু করে।

—নীল্ডাউন? আচ্ছা, হাঁটুভেঙে বোস—না, না, গোড়ালীর ওপর বসা চলবে না, খাড়া থাকবি। হ্যাঁ হয়েছে। থাক্, যতক্ষণ না আমি এক থেকে দুশো পর্যন্ত গোণা শেষ করি। হাত আমার দিকে সোজা টান করে রাখ্।

যাট পর্যন্ত গুন্তেই কনখলের গা ঝিনঝিন করে। কনুয়ে, কোমরে, হাঁটুতে ভীষণ লাগছে। আর পারে না। ওর মুখ দেখে বোঝে অমূত। বলে,—আচ্ছা, থাক। আয় একটু বেড়াই।

কিছুক্ষণ বেড়ানোর পর বলে,—এইবার চেয়ার। এইটে শক্ত। তা হোক, শিখে নে। সোজা দাঁড়া। বেশ। এই বারে মনে কর চেয়ারে বস্ছিস্। চেয়ারে যেখানে বসবার কাঠ থাকে, হাঁটুভেঙে সেই পর্যন্ত আয়। ঠিক, হাত দুটো হাতলওয়ালা চেয়ারে যেভাবে রাখা হয়, তেম্নি করে শূন্যে ভাঁজ কর। বেশ। এখন বাইরের কেউ দেখলে মনে করবে তুই আরামসে তোর বাবার চেয়ারে বসে আছিস। আছিসই ত, কেবল চেয়ারটা নেই। এটা প্রথমে পাঁচ গোণা পর্যন্ত করে সুরু কর। এক, দুই, তিন,—ওকি, কাঁপছিস কেন? —চার—পাঁচ—দূর গাধা, পড়ে গেলি?

অমূত এসে ওর হাত ধরে তোলে। বলে,—অম্নিই লাগে প্রথম প্রথম। মাষ্টাররা এক এক সময় আধঘণ্টা পর্যন্ত চেয়ারে বসিয়ে দেয়। আমি তার চেয়েও বেশী পারি।

প্র্যাক্‌টিস করে নিয়েছি।

অপরিসীম সমীহের চোখে ওকে দেখে কনখল। ওস্তাদ বটে। আধ ঘণ্টারও বেশী, মানে তিরিশ মিনিটের থেকেও—আর ওর দুই গুণতে না গুণতে চোখে সরষে ফুল ফুটে উঠেছিল। এমনি তালিমে সব ধীরে ধীরে শিখে নেয় কনখল অমৃতর কাছ থেকে। বেত খাবার সময় হাতের তেলো কি ভাবে পাততে হয়, বেঞ্চির ওপর দাঁড়ানোর সময় দুহাতের মুঠো শক্ত করে চিপে ধরে থাকলে পায়ের কষ্ট কম হয়, এইসব কায়দা কস্‌রৎ। অমৃত বলে,—শিখে রাখা ভালো রে, জীবনভোর কত মার খেতে হবে।

অমৃত কনখলের থেকে মাত্র বছর পাঁচেকের বড়, কিন্তু এমন ভারিক্কি চালে কথাটা বলে, যেন জীবনদর্শনের সারমর্ম বুঝে নিয়েছে। কনখল ভাবে, লেখা পড়া শেখার মতো মার খাওয়াও স্কুলে ভর্তি হবার লভ্যাংশের একটি তাহলে। কিছু জিজ্ঞেস করে না, গুরুবাদী মন, যা শোনে বিশ্বাস করে। অঙ্কে ভুল না করলে, কিম্বা ভালো হয়ে থাকলে মার নাও খেতে হতে পারে, এবোধ চট করে মনে আসে না।

খানিক পরে বাড়ী ফিরে আসে ওরা। এখনো বিকেল হয়নি, খেলুড়ের দল তখনো এসে জোটেনি, অমৃত বলে,—যা যা শেখালুম আজকে, প্র্যাক্‌টিস্ করতে হবে কিন্তু রোজ। বেত খাওয়াটা আমি যখন থাকব তখন হবে, কিন্তু নীল্‌ডাউন, চেয়ার ডাউন, এগুলো শোবার ঘরে রোজ রাত্রে বার কতক করে করবি, বুঝলি? জিমন্যাস্টিকের সার্ বলেন, প্র্যাক্‌টিস্ মেক্‌স্‌ম্যান পারফেক্ট। দেখবিচস আমার মাস্‌ল্‌গুলো? এ শুধু প্যারালেল বারের দয়ায়। রোজ কুড়ি মিনিট।

—ওগুলোও আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে কিন্তু।

—তা জিম্ ক্লাসে ভর্তি হয়ে গেলেই ত পারিস। ও, না না,—ক্লাস ফাইভের আগে ত ভর্তি করবে না। তা বেশ ত, ডন বৈঠকগুলো সুরু করে দে বাড়ীতে, আমি শিখিয়ে দেব। যদি চটপট শিখে নিতে পারিস্, বাবাকে বলে বাড়ীতেই একজোড়া প্যারালেল বার বসিয়ে নিতে কতক্ষণ। উনি রাজী হবেন ত?

কনখল মাথা নেড়ে জানায়, হ্যাঁ। ধরে নেয়, যে ঘোড়ায় চড়তে বাবা যখন অমত করেন নি, বন্দুক ছোঁড়ার কথা শুনে বকেন নি, তখন সামান্য প্যারালেল বারে আপত্তি উঠতেই পারে না।

যদিও ভরা ভাদ্র, তবু এক রাত্রে কাজীর বাজারে আগুন লাগে।

আর আগুনের সাথে ঘড় করেই যেন বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যায়। প্যারীবাবু বলেন যে বছরের এ সময়টা, মানে পুজো পর্যন্ত সাধারণত শিলেটে পুরো বর্ষা থাকে। এ বছর কি যে হোলো।

কাজীর বাজার শিলেটের প্রাণকেন্দ্র। দোকান, পসার, দিনবাজার, গম্‌গম্ করে। সেখানে আগুন লাগা মানে সোজা কথা নয়। পাকা বাড়ীর সংখ্যা কম। বাঁশের বেড়া, খড়ের চালা, এই সবই বেশী। রহমৎ সকালে এসে বলে,—সব ছাই হয়ে গেছে কনাবাবা। টাউন ক্লাব, গীর্জে, আর খানকয়েক পাকা বাড়ী কোনো মতে আছে। তবু ভাগ্যি, ভালো, সামনে সুরমা নদী, নেভানোর জলের অভাব হয়নি। আর জানো,—তোমার ইস্কুলের অমৃত, সে যে কাল কি করেছে! জল আনা, লোক টেনে বার করা, সমস্ত রাত দৈত্য দানোর মত খেটেছে। হ্যাঁ, গতরে তাগৎ আছে বটে। এইত একটু আগে ওর দাদা এসে জোর করে

নিয়ে গেল। তাই কি যেতে চায়—

—কখন আগুন লাগল?

—সে অনেক রাত্রে। দুটো হবে। তোমরা সবাই ঘুমে। হারুণের ঠেলায় আমার ঘুম ভাঙল। জানলা খুলে তাকিয়ে দেখি, ওদিকটা লাল হয়ে গেছে, তার সাথে ধোঁওয়া। আর বাঁশ ফাটবার কি পটাপট শব্দ। লোকের হৈ হল্লায় পাড়া সরগরম—হারুণ ত এক লাফে ছুট দিলে, আমিও খোদার নাম করে আস্তে আস্তে গেলাম এগিয়ে। আমাদের সাহেবও একবার ঘুরে এসে সাইকেল নিয়ে ডিস্‌ট্রি কমিশনার, পুলিশ সাহেব, ওদের খবর দিতে ছুট্‌লেন। পুলিশরাও কম জল ঢালেনি সারা রাত। তবে খোদা মেহেরবান— জানে মরে নি বেশী লোক।

অদম্য কৌতূহল হয় কনখলের দেখতে যাবার। নিভাননী যেন আঁচে টের পেয়ে যান। এসে বলেন,—কি হবে ওখানে এখন গিয়ে কংখ্? আগুন ত নিভে গেছে। এখন সব সাফ্‌স্‌ফ্ করবার পালা চলছে।

—তাহলে একবার অমৃতদের বাড়ী যাই মা?

—আচ্ছা তা যাও। রহমৎ সঙ্গে যাক। শিগগির ফিরো।

অমৃত তখন স্নান করে ফিরছে। কনখলকে দেখে ম্লান হেসে বললে,

—রুক্‌মানিয়াটা পুড়ে মরে গেছে রে।

কনখলের বুক ধক্ করে ওঠে রুক্‌মানিয়া? কাল না পরশু যাকে মুড়কি খেতে দিয়েছিল? তার যে একটা পা নেই, কেউ কোলে করে তাকে বার করতে পারল না?

অমৃত যেন কনখলের মনের জিজ্ঞাসার জবাব দেয়,

—ওখানে পৌঁছতেই আমার মনে হোলো ওর কথা। ওর যে একটা পা নেই, ওকেই ত আগে বাঁচাতে হবে। গিয়ে দেখি ওদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে খাজাওয়ালা কাঁদছে আর বলছে, তোমরা আমার রুক্‌মানিয়াকে বাঁচাও বাবু, ও ঘরের মধ্যে থেকে গেছে। ঘরগুলো তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। আর লোকের চেঁচামেচি, বাঁশফাটার শব্দ, কে কার কথা শোনে। আমি একলাফে ঢুকে পড়লাম ঘরে। ধোঁওয়ায় আর জিনিষ পোড়ার গন্ধে আমার দম আটকে আস্‌ছে। খুঁজছি কোথায় রুক্‌মানিয়া, চেঁচিয়ে ডাক্‌ছি, হঠাৎ ধড়মড় করে সামনের ঘর দুটোর চালা ভেঙে পড়ল। একটুর জন্যে গেলাম বেঁচে। পেছন থেকে রুক্‌মানিয়ার বাবাই এসে আমাকে টেনে বার করে নিয়ে এল। বলল, তুমি ছেলেমানুষ, কেন মরতে যাচ্ছ, রাস্তায় দাঁড়াও। আমি হতভম্বের মতো রাস্তায় দাঁড়ালাম। খাজাওয়ালা একটা চাদর দিয়ে গা মাথা ঢেকে ঢুকে পড়ল আগুনের মধ্যে। মিনিটখানেক পরেই বেরিয়ে এল, কোলে রুক্‌মানিয়া, চেনা যায় না, পুড়ে গেছে।

ঢোক গিলতে গিলতে চোখের জল চেপে কনখল বলে,—মরে গেছে?

—না, তখনো যায় নি। সব মুখটা, চুলগুলো, আর গায়ের অর্ধেক পুড়েছে। একটা চোখ পোড়েনি, জ্বল্‌জ্বল্ করে তাকিয়ে আছে। আমি কাছে যেতেই ঠোঁটটা একবার নড়ল, তার পরই স্থির হয়ে গেল। ওর বাবা বলল, মরে গেল বাবু। কনা, ভাই, একটা চোখ কিন্তু খোলাই রইল। মনে হোলো যেন বলতে চায় একটু আগে এসে আমায় বাঁচালে না কেন।

রহমতের কোলে মুখ রেখে কনখল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। অমৃত বলে

চলল,—আমি এক ঝটকায় নিজেকে সামলে নিয়ে জল আনা জল ঢালার কাজে লেগে গেলুম। রুকমানিয়ার মতো অমনি কতজন হয় তো ঘরচাপা পড়ছে, কিম্বা পড়বে, যদি বাঁচানো যায়—

দুএকদিনের দেখা রুকমানিয়া, তার জন্যে কান্না পায় কেন, বোঝে না ও। তবে পায়।

মার খাওয়া সুরু হয়ে গেল কনখলের। অমৃতই বলেছে একদিন, জীবনভোর কত মার খেতে হবে রে! হাতের মার আর আঁতের মার এ তফাৎ কি, অত বোঝে না ও। বুঝতে চেষ্টাও করে না।

রহমতের হাত ধরে বাড়ী ফেরে। ছেলের মুখ দেখে শঙ্কিত হন নিভাননী। আর একবার মার কোলে মুখ গোঁজা, আর একবার ফুঁপিয়ে কাঁদা। তারপর যথানিয়ম। চান, খাওয়া—আজ স্কুল খাওয়া বারণ করে দেন হৃষিকেশ। বলেন,—বাজারের রাস্তা আনসেফ্। অন্য রাস্তা খুব ঘুরে পড়বে। আজ থাক। কালকের মধ্যেই সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে মনে হয়। আর শোনো নিভা, জাফর কিন্তু দুপুরে খাবে আজ—ও ডিউটিতে আছে বাজারে। এই ধরো একটা দেড়টা হবে।

—আমি তাহ'লে একটা স্লিপ লিখে হারুণকে পাঠিয়ে দি, ও গিয়ে আয়েষা আর তার মাকে নিয়ে আসুক?

—সেত বেশ হয়। আমি ভাবছিলুম ডাক্তার বাড়ীতে খাবে না শুধু এই খবরটা ইয়ুসুফকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব—তা এ অনেক ভালো হোলো। আমি যাই—নটা সাড়ে নটায় হ্যাসেট আসবে। ক্ষতির পরিমাণ বোধ হয় লাখ পাঁচেক টাকার হবে—সাম্‌নে পুজো, দোকানীদের ঘরভরা মাল। তা ছাড়া গুটিচারেক পাটের গুদামও গেছে—প্যারীবাবুর নতুন গুদামসুদ্ধ। সাহেবদের গুদামগুলো ত ইনসিওর করা আছে জানি, প্যারীবাবুর বৃত্তান্ত ঠিক জানা নেই। লোকও মরেছে আর পুড়েছে, তা শ'খানেক হবে। মেজর ক্যালামিটি।

—নতুন বৌ এসেছিল। প্যারীবাবু ত সকাল থেকেই বাজারে। তবে বৌ বলছিল, ওদের গুদাম খালিই ছিল, পাট ছিল না তাতে।

আয়েষা দুপুরে আসবে জেনে একটু উৎফুল্ল হয় কনখল। দুপুরের রান্না যে ভেতর বাড়ীতে হবে, সে ত জানা কথা। তবে হয়ত মা আজ নিজেই অনেক রাঁধবেন। রান্না করার মার খুব সখ। তা হোক। বেগুনের কাট্‌লেট খেতে আয়েষা খুব ভালোবাসে। গোল বেগুন আধাআধি করে কেটে ভেতর থেকে শাঁস বার করে মাংস পুরে ডিমের গোলা মেখে ভাজা—কনখল যায় রহমতের সন্ধানে। ব্রিজল কাট্‌লেটের ফরমাস দিতে। জানে যে বুড়ো রহমৎ কনাবাবার অনুরোধ ঠেলবে না। আর, আয়েষা আসবে যে! ঠেল্‌লেই হোলো! তবে হাঁ, মার কাছে বেগুন চাইতে হবে। মুরগী? সে ত বাবুর্চিখানায়ই আছে। সে সব রহমৎ ঠিক করে নেবে।

আয়েষার আসা হালে কমে এসেছে। বাড়ী অনেক দূরে। রোজমেরী বিবির রোজ আসা সুবিধে হয় না। একা ত আর আসতে পারে না। ও যে মেয়ে। কনখল নিজে ত ছেলে, তবু ক'বার একা যেতে পেরেছে ওদের ওখানে? কাঞ্চনকে টহল দিতে হারুণ যখন ভোরে বার করে, দু'একদিন সওয়ার হয়ে ঘুরে এসেছে। দূর বলে ওদিকে রোজ ঘোড়া নেয় না হারুণ। কাছে থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। হারুণটা মত্‌বলী—রহমতের মতো ভালো নয়। বললে সব সময় কথা রাখে না। বড় হোলে আচ্ছা শিক্ষা দিতে হবে ওটাকে।

আজ আয়েষা আসবে। সব ভালো লাগতে সুরু করেছে ওর। রান্নাঘরে মার কাছে একবার ঘুরঘুর করে এল, মা তরকারী কুট্‌তে ব্যস্ত। ওদিকে রহমৎ কাজে লেগে গিয়েছে।

নিজের ঘরে এসে বইটই এক আধটা উল্টে দেখল, ভালো লাগে না। হারুণ চিঠি নিয়ে পুলিশ হাসপাতালের টিলামুখো রওনা হয়ে গেছে। ছন্‌মন্ করছে কনখল।

পাশেই প্যারীবাবুর বাড়ী। সেই দিকে রওনা দেয়। যাক্ জীবনের সাথে একটু গল্প করে আসা যাক।

জীবন স্কুলে রওনা হয়ে গেছে। তাকে ত আর তার বাবা বারণ করেনি। প্যারীবাবুও বাজার থেকে ফেরেনি। ফিরে আস্‌ছে, ঊষা ওকে ডাকে,

—কে, কনখল? আয়না, গল্প করি। স্কুলে যাস্‌নি কেন?

—বাবা বারণ করেছেন। আর আজ আয়েষা আর তার মা, আর তার বাবা, দুপুরে খাবে আমাদের বাড়ী।

ঊষা আয়েষার থেকে বছর তিনেকের বড় হতে পারে, কিন্তু বিয়ে হয়েছে তার। জীবনের অনেক রহস্য জানা হয়ে গেছে। আয়েষার উল্লেখে মুখ টিপে হাসে, বলে,—আয়েষা আস্‌বে, খুব মজা লাগছে তোর, নারে?

—লাগছেই ত। জানো নতুন মাসি, আয়েষাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি। ও ও আমাকে ভালোবাসে।

—কি করে বুঝলি তুই?

—বারে, যেদিন টিলার বাড়ী ছেড়ে এলাম, ওতে আমাতে গলা জড়িয়ে ধরে কত কাঁদলাম। আয়েষা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কতো চুমো খেল।

—থাম্ থাম্ বোকা। খিলখিল হাসি চাপে মুখে আঁচল চেপে ঊষা। কনখলের গা ঘেঁসে এসে বসে' বুকের মধ্যে ওর মাথা টেনে নিয়ে কাণে কাণে ফিস্‌ফিস্ করে বলে,—আমাকে যা বল্‌লি, বল্‌লি। সব জায়গায় আয়েষার তোকে বুকে জড়িয়ে ধরা, চুমো খাওয়া, এসব বলতে যাসনে যেন। বলে, কনখলের গালটা টিপে দেয় ঊষা।

কনখল ভাবে মুট্‌কিটা বলে কি? আয়েষার সাথে ভালোবাসার কথা কে না জানে। বাবা, মা, রহমৎ, ইমাম সাহেব, সব্বাই। লুকোনোর কি আছে বোঝে না ও। গাল টিপে দেওয়াতে বিরক্ত হয়। বলে,—ছাড়ো নতুন মাসি, যাই এবার।

অতর্কিতে ঊষা ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে। ঘাড়ে, গালে, ঠোঁটে, কপালে চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তোলে। থর থর করে কাঁপ্‌ছে ওর সারা গা, নাক দিয়ে নিশ্বাস পড়ছে, যেন আগুনের হলকা। কনখলের শিরায় শিরায় একটা তীব্র পুলক শিহরণ জেগে উঠ্‌লেও কেমন যেন অশুচি মনে হয় তার। হতভম্ব ভাব কাটিয়ে ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে।

নীচের ঠোঁট দাঁতদিয়ে চেপে ঊষা তখনো ফুঁসছে। রোদ্দুর ঝলমল করে ওঠা পুলিশ রাইফেলের কিরীচের মতো ঊষার চোখের দৃষ্টি কনখলকে যেন বিঁধ্‌তে আস্‌ছে। আধখোলা শাড়ীর আঁচলের ফাঁক থেকে ওর বুকের পাহাড় দুটো মেঘনার বুকে শুশুক মাছের মতো উঠ্‌ছে নাম্‌ছে। ওর দিকে তাকিয়ে পুতনা রাক্ষসীর কথা মনে হয় কনখলের। অস্বস্তিকর একটা তীব্র বিস্বাদে ওর সমস্ত মন তেতো হয়ে ওঠে।

বাড়ী যাবার জন্যে দরজার চৌকাঠ পেরোতেই ঊষা এসে ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলে,—আজকের এসব আবার কাউকে বলতে যাস্‌নে যেন, তোর আবার যেমন ঠোঁট পাংলা।

ঊষার আদিখ্যেতা ওর আদপেই ভালো লাগেনি, তবু বলে,—কেন, ভালোবাসার কথা বললে দোষ কি?

—সব ভালোবাসার কথা বলতে নেই।

—আমি কারুকে কিছু লুকোই নে।

—আজকের কথাটা লুকোস্।

বলে মাথা নুইয়ে কনখলের দুই ঠোঁটে চুমো খায় উষা। চুমো খায় না ত, যেন শুষে নেয় ঠোঁটের রস। কোনো মতে নিজকে ছাড়িয়ে হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে বাড়ী ফেরে কনখল। একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে উষাকে। দরজার পাল্লায় হাত দিয়ে থর-থর করে কাঁপ্‌ছে। ঠোঁটের কোনে একরকমের হাসি; সে হাসি ও কোনো মেয়ের মুখে আজও দেখে নি।

সদরে পৌঁছতেই জীবনের সাথে দেখা। স্কুল থেকে ফিরছে। বলে,—এই কনা, তুই স্কুলে যাস্‌নি?

—না, বাবা বারণ করেছেন। তুই গেলি ত ফিরে এলি যে বড়?

—হেডমাষ্টার ম'শায় ছুটি দিয়ে দিলেন। অর্ধেক ছেলের স্কুলে যাবার রাস্তাই ত ঐ বাজার। কেউ আসেনি।

—কাল খোলা ত?

—হ্যাঁ। এখন কি করবি? মারবেল খেলবি?

কনখল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। জীবন বলে,—দাঁড়া বই রেখে আসি।

বেলা গোটা বারো নাগাদ আয়েষারা এসে পৌঁছে যায়। কনখলের স্নান হয়ে গেছে, মা বলেছেন, আয়েষারা এলেই ছোটদের আগে খাইয়ে দেবেন। বাবুর্চিখানায় রহমতের ব্রিঞ্জল কাট্‌লেট অনেকক্ষণ তৈরী হয়ে গেছে। আয়েষার হাত ধরে কনখল বাবুর্চিখানার দিকে টেনে নিয়ে যায়। গিয়েই খোঁজে কোথায় সেই পরমলোভনীয় চীনেমাটির ডোঙাটা আছে, ধব্‌ধবে সাদা ন্যাপকিন দিয়ে ঢাকা। এসব হালচাল জানা আছে রহমতের। ফোক্‌লা দাঁতে একগাল হেসে বুড়ো রহমৎ আয়েষাকে অভ্যর্থনা করে। বলে,—আয়েষা মা আমার বিলকুল মিসিবাবা বনে যাচ্ছে।

আজ আয়েষার পরনে কুর্তা ঘাগরা পেশোয়াজ নেই। হাঁটু পর্যন্ত ফ্রক, খোলাচুলে ঘাড়ের কাছে নীল রিবনের ফুল বাঁধা। আয়েষা স্মিত হাসি হেসে বলে,—চাচার চোখ ত জবর। রোজমেরী বিবির স্কুলে এম্‌নি সব পরতে হয় চাচা।

—যা মানিয়েছে—কোথায় লাগে ইংরেজ বাচ্চা। এই কনা বাবা, কি হচ্চে, রাখো, রাখো। ভেঙে যাবে—সোভান আল্লা,—

কনখল আবিষ্কার করে ফেলেছে কাট্‌লেটের ডোঙা। রহমৎ চট্‌পট গিয়ে সামাল করে। বলে,—সব মালুম আছে আমার। হাত দিও না, ছট্‌ফট কোরো না, খামুশ হয়ে থাকো। দিচ্ছি বার করে চাখ্‌নীর কাট্‌লেট।

উনোনের পাশে ঢাক্‌না দেওয়া সস্‌প্যানের ভেতর থেকে সন্তর্পণে দুটি বেগুন বার করে ওদের হাতে দেয় রহমৎ। আয়েষা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খায়, ওর পায়ের কাছে ধুপ্‌ করে মাটিতে বসে কনখল লাগায় কামড়। চোখ বুঁজে বলে,—এমন আর কোনোদিন হয়নি। রহমৎ আর একটা—

—ক্ষিদে মরে যাবে না? মেমসাহেব খেতে ডাক্‌বেন এক্ষুনি। তাছাড়া গণ্‌তি তে—

কনখল হেসে ওঠে। বলে,

—তাই বুঝি ওই প্যান থেকে বেরুল? মা'ত মাথা পিছু দুটো করে কাটলেটের বেগুণ গুণে দিলেন আমার সামনে। সে গুণ্‌তির বুঝ্ ত তুমি ডোঙায় রেখেছ। বাড়তি

বেরোল কোত্থেকে শুনি?

রহমৎ দাড়ি চুল্‌কোয়, আর হাসে। মাথা গুণ্‌তির থেকে বেশী ওকে ভালোমন্দ জিনিষে করতে হয় কনখলের চাখ্‌নীর জন্য, তার জন্য বাড়তি সামগ্রী আসে কোত্থেকে সে রহমতের হাতের কস্‌রৎ! সব কথা খুলে কি বাচ্চাদের বলা যায়।

কনখল কাট্‌লেট খাওয়া হাত আয়েষার সুগৌর পায়ের গুলে মুছ্‌তে মুছ্‌তে বলে,—বাপরে, পা নয়ত যেন পাঁচ নম্বরী মুগুর দুটো। আমাদের জিম্ ক্লাসে আছে। সার্ বলেন, ইণ্ডিয়ান ক্লাব!

কপটবিরক্তিতে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে আয়েষা বলে,—ভূত, করলি কি! রোজমেরী বিবি হলে কি বলতেন জানিস? বলতেন, 'ন'টি, ন'টি—ডার্টি হ্যাবিট'। বলে এক ঝট্‌কায় কনখলের হাত ধরে উঠিয়ে দেয়। দুজনে হাত ধরাধরি করে নাচ্‌তে নাচ্‌তে বাড়ীর দিকে ছুট লাগায়। বাবুর্চিখানায় রহমৎ মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসে।

ভেতরের বারান্দায় ওদের খেতে বসিয়ে দিয়ে নিভাননী কুল্‌সম্ পাশে বসেন। ঠাকুরের যা দেবার দিয়ে গেছে আগেই, পরিবেশন করছেন নিভাননী। রহমৎ একটি পিরীচ ঢাকা কোয়ার্টার ডিশ্ সামনে রেখে যায়। আয়েষা কনখল চোখচাওয়াচাওয়ি করে মুচ্‌কি হাসে। কুল্‌সম্ বলেন,—ও কি দিদি?

—ও তোমার মেয়ের ভোগ গো, ভোগ বোঝো তো? আমাদের হিঁদুবাড়ীর পুজো-পার্বনে দেবদেবীকে ভোগ রেঁধে দেওয়া হয়। তোমরা আজ এখানে খেতে আস্‌ছ শুনে কনা গিয়ে রহমতের কাছে বায়না ধরেছে বেগুনের কাট্‌লেট এর, আয়েষা নাকি খেতে ভা-রী ভালোবাসে।

কনখল কেন খামখাই লজ্জা পায় বোঝে না। ঘাড় কাৎ করে থাকে। আয়েষা মা-মাসীর অলক্ষ্যে চিম্‌টি কাটে ওর উরুতে, বলে—আমি ভালোবাসি, না ও ভালোবাসে? বাবুর্চিখানায় গিয়ে—

এঁটো হাতেই আয়েষার হাত চেপে ধরে কনখল।

—আর তুই? তুই খাস্‌নি?

এবারে মুচ্‌কি হাসির পালা মা-মাসীর। ছাড়িয়ে দিয়ে নিভাননী বলেন,—ছি কংখু, খাবার সময় অসভ্যতা করতে নেই।

ছেলের লুকিয়ে চুরিয়ে খাওয়া, ভালো রান্না চেখে আসা, এ সব অভ্যেস জানা আছে নিভাননীর।

পাতের প্রতিটি খাবার জিনিষ ডবল সুখাদ্য বলে মনে হয় আয়েষার। এটা ওটা চেয়ে খায়। মুখে কথার বান ছোটে। মাসীর সাথে বক্ বক্ করে যায় অনর্গল। ওদিকে কনখল মুখ গুঁজে খায়। কথা কয় না।

খাওয়া শেষ হলে নিভাননী বলেন ওদের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করতে। বলেন,—দুপুর রোদে বেরিও না কেউ। বই পড়ো, ওয়ার্ডমেকিং খেলো।

হাত-মুখ ধুয়ে তিনলাফে কনখল নিজের ঘরে ঢোকে। পেছন পেছন আয়েষা আসে। এসেই সাম্‌নে যে বই পায় হাতে নিয়ে লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। বই খোলে, পাতা ওলটায় না। ঠাট্টা করে বলে,—কনা বাবার গোসা হয়েছে বুঝি?

কনখল কথা বলে না। পড়বার চেয়ারে বসে হাতের লেখার লম্বা বইটার পাতা ওলটায়। "খট্টা ভাঙ্গিলেই ভূমি শয্যা", "শ্রীহট্টে কমলালেবু জন্মে", "বিল্বফল পাকিলে সুরস হয়",

ইত্যাদি সারগর্ভ বাক্যে মনোনিবেশ করে।

আয়েষা উঠে এসে হাত ধরে ওকে বিছানায় নিয়ে বসায়। বলে,—বোকা, আমি কি তোকে জব্দ করার জন্যে কিছু বলেছি? রহমতের কাছ থেকে আমিও ত আগেই খেয়েছি। কিন্তু কি ভালো রে তুই কনা, আমি ভালোবাসি বলে ঐ রান্নার কথা তুই বলেছিলি? তোর মত আমার কথা কেউ ভাবে না ভাই।

কনখলের সব রাগ গলে জল হয়ে যায়। আয়েষার পায়ের বুড়ো আঙুলটা মট্‌কে দিতে দিতে বলে,—তোর কি কি ভালো লাগে আমি সব জানি। খালি বেগুনের কাটলেট কেন,—পনীর দিয়ে নোন্তা বিস্কুট, চাম্‌চে করে কণ্ডেন্‌স্‌ড মিল্ক, তে'তুলকাশন, রুটির পায়েস—সব মনে আছে আমার।

বড় বড় চোখ টান করে বোকা বোকা ভাবে আয়েষা বলে,—আচ্ছা গাধা ত তুই। লুকিয়ে কামরাঙা খাওয়া, বন্দুক দিয়ে হরিয়াল মারা, বাটি চাপা দিয়ে টাকী মাছ ধরা, কেউ বাড়ী ছাড়লে কেঁদে ভাসানো—এগুলো বুঝি ভালো লাগে না আমার?

কনখল বোঝে, আয়েষা ঠাট্টা করছে। গায়ে মাখে না। বলে,—ধেৎ, ওত সব অন্য কথা।

—আর, আর একজন কি ভালোবাসে, জানিস্?

—না ত—

কনাবাবা ভালোবাসে আয়েষাকে। বুঝলি হনুমান? বিশ্বাস না হয় সুধিয়ে আয় মাসীমাকে।

বলে কনখলের চুলের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকানি দেয় আয়েষা।

কনখল ড্যাব্‌ ড্যাব্‌-এ চোখে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। কি যেন বলি বলি করে ঠোঁটদুটি, কথা ফোটে না। চোখ ভরে জল আসে কেন, বুঝতে পারে না। আজই খানিক আগে আর একজন যে ওকে দলে কচ্‌লে আর এক রকম সুখের জ্বালা ধরিয়ে দিতে গিয়েছিল, ভুলে যায় তার দাহ। পরম নির্ভরে আয়েষার কোলে মুখ গুঁজে থাকে, চোখের জলে আয়েষার জামা ভিজে যায়। আয়েষা ওর গায়ে পিঠে হাত বুলোয়, আর বলে,—কি উজ্‌বুক রে তুই! আস্ত-গাধা একটা। এই বাঁদর, ওঠ্, ওঠ্—

নাকের দু পাশ দিয়ে আয়েষার দু'গালে জলের ধারা চিক্‌ চিক্‌ ক'রে গড়িয়ে পড়ে। ঝুঁকে পড়ে ওর গালে গাল ঠেকিয়ে আয়েষা বলে,—কংখ্‌, কংখ্‌—কনাভাই—

দরজার পাশে চাপাহাসির শব্দে চমকে ওঠে দুজন। মুখে কাপড় গুঁজে মট্‌কি উষা হাসির হুল্লোড় থামাতে না পেরে আথালি পাথালি করছে। দুলে দুলে উঠ্‌ছে ওর গা বুক ঢেউ খাওয়া জেলে ডিঙির মতন। হাসির ফাঁকে ফাঁকে বলছে,—মা গো! কোথায় যাব গো! উজ্‌বুক, বাঁদর, গাধা! কি মিষ্টি মিষ্টি ডাক—মা গো! খুব দেখালি যা হোক্‌ তোরা দুটিতে! থাক্‌ থাক্‌—ভয়ের কিছু নেই। আমি কারুকে বলতে যাব না। ভাব কর দুটিতে বসে—

শেষের দিকের কথা ক'টিতে সোহাগ ঢেলে দেয় উষা। কনখলের দিকে তীব্র চোখে একবার তাকায়, যেন দাগা টেনে দেয় 'আমি কারুকে বলব না' কথাটার নীচ দিয়ে। তারপর, আস্তে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যায়।

তিড়িং করে লাফ দিয়ে ওঠে কনখল।

—ওই জীবনের নতুন মা-টাকে আমি আচ্ছা ল্যাং কস্‌ব। দেব আলপিন ফুটিয়ে ওর ফুলো ফুলো গায়ে। পাজির পা ঝাড়া ওটা—

কনখলের হঠাৎ তিড়বিড় করে ওঠার কারণ বোঝে না আয়েষা, বলে,—কি হোলে রে? খামখা রেগে যাচ্ছিস্‌ কেন?

—তুই জানিস্‌ না আয়েষা—ওটা পাজি। আজই সকালে—

থতমত খেয়ে থেমে যায় কনখল। উষা বলেছিল, 'আজকের কথাটা লুকোস্‌'। বল্‌বে? বল্‌বে ও আয়েষাকে সব কথা?

আয়েষার নিষ্পাপ সাদা মনে কালীর আঁচড় না পড়লেও বুদ্ধিমতী মেয়ে বোঝে, কনখল যে কোন কারণেই হোক ঐ উষা সম্বন্ধে একটা কিছু বলতে গিয়ে দোনামনা করছে। চাপ দেয় না, কিন্তু ধক্‌ করে বুকে আঘাত লাগে কনখল ওকেও বলতে পারছে না, কি সে কথা, সেইটে জানবার জন্যে।

সেদিন বেলা শেষে, বিকেলে চা'য়ের পর, আয়েষা সমেত জাফর দম্পতী যখন বিদায় নেন, তার মধ্যেই রুকমানিয়া উষার সকল কাহিনী আয়েষার জানা হয়ে যায়।

৯

পরদিন স্কুলে যাবার পথে কাজীর বাজার হয়ে যায় ছেলের দল। অমৃত দেখায়, —এই দেখ্‌, এইখানটায় মিণ্ড সাহেব,—ঐ যেরে খাসিয়া পাদ্রী,—মার্ক লিখিত মথি লিখিত সুসমাচার বেচ্‌ত। এইটে ত বিদ্দেবন সা'র কাপড়ের গদী। ও দিকটা মেছোবাজার, ফাঁকামেলা, ওদিক পড়বার কিছু নেই। এই দেখ্‌, দুটো তিনটে মুদিদোকান, এক্কেবারে গেছে। তারপরই ঝগড়ুর দোকান। ওই দেখ্‌, ভেতরের মেটে ঘর দুটোর কিছু চিহ্ন নেই, দেয়াল চারখানা ছাড়া। ওরই ভেতরেরটায় রুকমানিয়া আট্‌কা পড়েছিল। এই ত, এইখানটায় আমি এনে নামালুম।

ছেলের দল মহোৎসাহে ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে এটা ওটা, যেমন পুড়ে যাওয়া কলের লাটিমের টুক্‌রো, উড়্‌ পেন্সিলের বাণ্ডিলের অক্ষত অংশ, এই সব আবিষ্কারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কনখল ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে খাজাওয়ালার ঘরের সামনে।

অমৃত একটু অপেক্ষা করে বলে,—চল্‌রে, ক্লাস বসে যাবে।

—রুকমানিয়াটা কথাও বলতে পারত না ভালো করে, না রে অমৃত?

—আধআধ বলত। তিনচার বছরের বাচ্চা ত।

দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কনখল। থামাতে পারে না, বড় বড় কয়েক ফোঁটা জল ঝরঝর করে পড়ে চোখ থেকে।

কনখল দুরন্ত নয়, ফুর্তিবাজ। আজকে কেমন নিষ্প্রাণ হয়ে রইল সারাক্ষণ। অন্য ছেলেদের কলকাকলীতে আদৌ যোগ দিতে পারল না। অমূল্য বলছিল,—ছাই জানিস্‌ তোরা। প্রকাশদাদের দলের নিবারণকে চিনিস্‌? তার ছোট ভাই রাখহরি কলেজে পাখা টানে। সে নাকি কাকে বলেছে যে কাজীর বাজারের আগুন স্বদেশীরাই লাগিয়েছে। এবারে পুজোর দোকানে দোকানে দেদার বিলিতী মালের আমদানী। কাপড়চোপড়, খেলনা, এইসব। দোকানদারদের হাতজোড় করে আগে থাকতেই কত বলেছে বিলিতী জিনিষ না আনতে, ওরা শোনে নি। তাই তাক্‌ বুঝে দিয়েছে—বলে ফাঁকা হাতে দেশ্‌লাই জ্বালবার ভঙ্গি করে দেখায় অমূল্য।

কনখল কান খাড়া করে শোনে। কাল দুপুরে ডাক্তার জাফর আর বাবা যখন খেতে

বসেন, তখন এই ধরনের কথা ওঁদের আলাপের মধ্যে শুনেছে কনখল। ছেলেদের কথায় যোগ দেয় না ও, কিন্তু অমৃতকে আলাদা করে জিজ্ঞেস করে,—শুনছিস্ কি বলছে ওরা?

—সব বাজে কথা। আমি ত সারাক্ষণ আগুন নেভানোতে ছিলাম। প্রকাশদাদের দল প্রাণ তুচ্ছ করে কাল যা করেছে, তার তুলনা হয় না। প্রকাশদা নিজে ত হাসপাতালে। বিন্দাবন সা'র দোতলায় উঠেছিল মেয়েদের বাঁচাতে, জ্বলন্ত কড়ি ভেঙে পড়েছে ওর কাঁধে। বাঁ দিকের ঘাড় আর হাত দুইই পুড়ে গেছে—হাতটা ভেঙেওছে। ওদের ফক্কুড়ি কথায় কান দিস্‌নে। লোকের বিপদে আপদে ওরাই এগিয়ে এসে বুক পেতে দেয় সবার আগে, আর ওরা লাগাবে বাজারে আগুন? যাতে হাজার হাজার লোকের অনিষ্ট হোলো আর কতোজন মারা গেল? ফুঃ!

উড়িয়ে দেয় এম্‌নিভাবে কানগুজবি কথা অমৃত।

কনখল কথার জবাব দেয় না, কিন্তু মন থেকে উড়িয়েও দিতে পারে না একথা অসার গুজব বলে। কাল শুনেছে জাফর ডাক্তার বাবাকে বলছিলেন যে পুলিশ সাহেব বিশেষ করে প্রকাশের উল্লেখই করেছেন এই অগ্নিকাণ্ডের কর্মকর্তা হিসেবে। বলেছেন নাকি যে হিজ্ বন্দেমাতরম্ গ্যাং ইজ অ্যাট দি রুট। এও বলেছেন যে এ বিষয়ে বিশেষ তদন্তের কথা তিনি ভাবছেন, তবে প্রকাশ হাসপাতাল থেকে না বেরোলে কিছু করা হবে না। খবরও পেয়েছেন সংলোকের কাছে, তবে সে বিশেষ গোপন ব্যাপার।

প্রকাশ বোস ওদের থেকে অনেক বড়। মুরারীচাঁদ কলেজের উঁচু শ্রেণীর ছাত্র। স্থানীয় গীতা সোসাইটির মেম্বর। কিন্তু প্রকাশের নাম ডাক খেলায়। টাউন ক্লাবের ফুটবল ক্রিকেটের ক্যাপটেন, কলেজের সেক্রেটারী। তাছাড়া সবরকম আর্তত্রাণের কাজে অগ্রণী। ওদের গীতা সোসাইটির বড় কাজই হোলো লোকসেবা। ওরা সব স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য, ধর্মের বই পড়ে, শরীরচর্চা করে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, বাই হোক না কেন, ওরা বেরিয়ে পড়ে ওদের সেবাদল নিয়ে। সরকারী মহলেও তার জন্যে তারিফ পেয়েছে। গত দুর্ভিক্ষের সময় ওদের সৎ কাজের জন্য লাটের সার্টিফিকেট পেয়েছে। বাবাদের বৈঠকের নানা আলোচনায় কনখল এসব জেনেছে। হরেন চাকী, উকীল, ওদের লাঠিখেলার এলেম দেখে বলেন,—ডাকাতরে বাবা! প্যারীবাবুর তৃতীয় পক্ষের বিয়ের সময় ওরা রুখে উঠেছিল, কিন্তু সীতানাথ পণ্ডিতের মধ্যস্থতায় মিটমাট হয়ে গিয়েছিল। তবে প্যারীবাবু যে ওদের ওপর প্রসন্ন নন, সে তাঁর হাবভাবে বোঝা যেত, মুখে তিনি কিছু বলতেন না। চাপা মানুষ। কেবল বিদ্যাভূষণ মশায় বলেন, ওরাই দেশের আশা ভরসা। জুলাই মাসে কলকাতার ফুটবল খেলায় মোহনবাগান বলে একটা দল দুর্ধর্ষ গোরা ফৌজের দলকে হারিয়ে দিয়েছিল যখন, শিলেটেও একটা খেলায় টাউন ক্লাব দল পুলিশের দলকে হারিয়ে দেয়। পুলিশের দলে তিনটে সাহেব খেলোয়াড় ছিল। কনখল দেখেছে সে খেলা। খেলার কিছু ভালো করে বোঝেনি, তবে প্রকাশ একাই তিনটে গোল দিয়েছিল, দেখেছে। আর দেখেছে খেলা ভাঙার পর মাঠ ভরা লোককে প্রকাশকে মাথায় তুলে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে। হেরে গেলে ত পুলিশের রাগ হবারই কথা। তাই পুলিশসাহেব ওর ওপর চটা, মনে হয় কনখলের।

কিন্তু সে যাই হোক্, অমৃতের কথা শোনবার পর ও বুঝতে পারে না, যে লোক নিজের প্রাণের তোয়াক্কা না রেখে আগুন থেকে লোক বাঁচাতে যায়, সেই আগুন লাগাবে কেন? সে ত বীর, বীরেরা কখনো চুরি করে আগুন লাগিয়ে রুকমানিয়ার মতো অসহায় ছোট্ট মেয়েকে মেরে ফেলতে পারে? প্রকাশদা নিশ্চয়ই নয়, তবে সত্যিই যে বা যারা এই

খারাপ কাজ করেছে, তাদের সম্বন্ধে মন বিষিয়ে ওঠে ওর। ও যদি বড় হত, আর গায়ে অনেক জোর থাকত, দেখে নিত সেইসব ভীরু বদ্‌মায়েসগুলোকে। রুকমানিয়া! একটা পা ছিল না তার! ভালো করে কথাও বলতে শেখেনি! আবার চোখ ছল ছল করে ওঠে কনখলের।

স্কুল পৌঁছে যায় ছেলের দল। সেখানে গিয়ে দল ভেঙে যায়, যে যার নিজ নিজ ক্লাসে গিয়ে বসে। পড়াশুনা তেমন জমে না, বাজারের আগুনের গল্পই চলে। টিফিনের আগের পিরিয়ডে ভূগোল সার্ গোপালবাবু ম্যাপ দেখতে চান, কাঁদিন আগেই টাঙ্ক্ দেওয়া ছিল বাড়ী থেকে এঁকে আনবার। সব ছেলে না আনলেও কয়েকজনা এনেছিল, কনখল শেষের দলে। ওর ম্যাপ দেখে গোপালবাবু বললেন,—ইন্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম—বেশ হয়েছে। সুরমা থেকে ব্রহ্মপুত্রের নীল দাগ মোটা হবে। প্রথমত ওটা নদ, আর তা ছাড়া অনেক বড়ো। মণিপুরের জায়গায় রং না দিয়ে সাদা দেখিয়েছ কেন?

—ওটা ত স্বাধীন, মানে করদ রাজ্য—তাই,—

—ঠিক্ ঠিক্। আচ্ছা যাও, বোসো।

তারপর অগ্নিকাণ্ডের প্রসঙ্গে ফিরে আসেন গোপালবাবুও। বলেন,—এই দ্যাখো, এত বড় একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেল তোমাদের চোখের সামনে। এর থেকে কি কি জানতে পারলে তোমরা, কি কি শিখ্‌লে? প্রথম, ভাবো, আগুন লাগ্‌লে কেমন করে। নিশ্চয় অসাবধানী কেউ রাত্রে তামাক খেয়ে পাটগাদা কিম্বা বাঁশঝড়ের কাছাকাছি কল্কে উপুড় করে রেখেছিল, অথবা কেরাসিনের কুপি উল্টে গিয়েছিল—এম্‌নিই হবে একটা কিছু। একজনের সামান্য ভুলে কতলোকের সর্বনাশ হয়ে গেল। তাহলে বুঝ্‌লে—যা থেকে বিপদ আস্‌তে পারে এমন জিনিষ অত্যন্ত সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হবে। তোমরা ছোট ছেলে, তোমাদের হয়ত আগুন নিয়ে কারবার নেই। কিন্তু মনে রেখো, কালীপুজার সময় বাজী পোড়ানোর কথা, জান ত, তখনো এমনি কত কাণ্ড হয়। 'আগুন নিয়ে খেলা' গুরুজনদের বারণ—তার মানে এ নয়, যে আগুন ছোঁবে না। অসাবধান ব্যবহারে আগুন যে ভয়াবহ অনিষ্ট করতে পারে, তারই সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে।

এতখানি জ্ঞানগর্ভ কথা বলে গোপালবাবু দম নেন। ছেলেরা পুরো না বুঝলেও মোটামুটি মর্ম গ্রহণ করতে পারে। কনখল মনে মনে জোর আশ্বাস পায়, যদি এইভাবেই আগুন লেগে থাকে, তবে ত প্রকাশদাদের সম্বন্ধে যা শুনেছে সব মিথ্যে হতে পারে। হতে পারে কেন, নিশ্চয়ই তাই। নইলে তাঁর মতো অমন দয়ালু, আর বীর।

যেন ওর মনের কথা টেনে নিয়ে গোপালবাবু বলেন,—দুর্ঘটনা ত ঘটে গেল। কিন্তু তার থেকে দেখ, আমরা পরিচয় পেলাম কয়েকটি আসল মানুষের। যারা নিজের প্রাণের মায়া না করে অন্যের উপকারে এগিয়ে আসে, অসহায়কে বাঁচাতে গিয়ে ফলাফল না ভেবে বিপদের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এমনি সব ছেলের। তারা আমাদেরি নিজেদের জন বলে গর্ব অনুভব করি। বীরত্ব সব সময় পুজার জিনিষ, তার সাথে যদি দয়া মিশে যায়, তবে তাকেই বলি মহত্ত্ব। আমাদের প্রকাশ, অমৃত এইসব ছেলেরা মহৎ কাজ করেছে শুনেছ বোধ হয়—

অনেক ছেলে মাথা নেড়ে জানায়, হ্যাঁ, শুনেছে।

—বীরের জাতিভেদ নেই। যে বিপন্ন, সে বড়ই হোক্, ছোটই হোক্, ধনী হোক্, গরীব হোক্, এসব বিচার না করে তাকে উদ্ধার করাই সাহসীর কাজ। আমি শুনেছি অমৃত একটি পঙ্গু শিশুকে বাঁচাতে জ্বলন্ত ঘরে ঢুকেছিল, কিন্তু পারেনি—কিন্তু ফল

দিয়ে বীরত্বের পরিমাণ মাপা যায় না। সে যে নির্ভয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, তাই সে বীর। ওকি, কনখল, তুমি কাঁদ্‌ছ?

ডেস্কে মাথা গুঁজে কনখল ফোঁপাচ্ছিল। পেছন থেকে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে বলল,—ওটা ঝগ্‌ড়ু খাজাওয়ালার মেয়ে সার্‌। স্কুল আসবার পথে কনখলরা ওকে মুড়কি খেতে দিত। মেয়েটার একটা পা কাটা ছিল। ছোট্ট মেয়ে সার্‌, তিনচার বছর বয়স হবে।

গোপালবাবুর বক্তৃতায় ছেদ পড়ল। ছোট্ট একটি হুম্‌ বলে তিনি টেবিল ছেড়ে বারান্দায় পায়চারী করে এলেন একবার। ফিরে এসে কনখলের পেছনে দাঁড়িয়ে বললেন, —বি ব্রেভ্‌ মাই বয়!

তারপর ক্লাসকে বললেন,—যাও, ছুটি। ডিস্‌পার্স। ফিরে কনখলকে বললেন,—বি এ ম্যান।

ম্যান? কনখল ভাবে একদিন হ্যাসেট সাহেব পোলো খেলার মাঠে ইয়ং ম্যান বলেছিলেন। গোপালবাবুও বলছেন, বি এ ম্যান। ম্যান মানে লম্বা চৌড়া জোয়ান, না বুকে সাহসভরা মানুষ? প্রকাশদাদের মতো গায়ে জোরওয়ালা মানুষ ও নয়, অমৃতর মতোও নয়। কিন্তু গায়ের জোরে না পারুক, বুকের সাহসে ওদের থেকে পিছিয়ে থাকবে না ও। মনে মনে সংকল্প করে কনখল।

টিফিনের সময় হারুণের আনা ফল রুটি দুধ অমৃতর সাথে ভাগ করে খাবে বলে তাকে খোঁজে। প্যারালেল বারে এম্‌নি এম্‌নি কস্‌রৎ করছিল অমৃত। ডাক দিতে বলল,—আজ কেন রে? আজ ত আমার টিফিনের একপয়সা মজুত আছে, খরচ হয়নি।

—তা থাক্‌, খা তুই।

অমৃত রুটি আলুর দম আর একটা কলা খায়। বলে,—ভালোই হোলো। যাবার সময় বুড়োর দাড়ি খাওয়া যাবে।

বুড়োর দাড়ি মানে সোহনপাপ্‌ড়ি। স্কুল গেটে গুলোবছড়িওয়ালা বসে, তার কাছে সোহনপাপ্‌ড়িও থাকে।

স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে বাড়ীর কাছে এসে অমৃত বলল,—আজ আর আমি খেলতে আসব না রে। প্রকাশদাকে দেখতে যাব।

—আমিও যাব।

—তবে মাকে বলে রাখিস্‌। আমি এই এলাম বলে।

সদর হাসপাতালের ডাক্তার চেনেন কনখলকে। বাগ্‌চিদের বাড়ীতে তাঁর যাওয়া আসা আছে। প্রকাশকে দেখবার কোনো অসুবিধা হয় না।

হাতে, কাঁধে, পিঠে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা প্রকাশ খুশী হয় ওদের দেখে। অমৃতকে চেনে সে, কিন্তু কনখল নতুন। জিজ্ঞেস করে,—এ ছেলেটি কেরে অমৃত?

—বাগ্‌চি সাহেবের ছেলে, ওদের বাড়ীতেই ত আমরা খেলি।

পরিচয় করিয়ে দেয়। ওযে খুব ভালো ঘোড়ায় চড়তে পারে, গোল্লাছুটও শিখে উঠ্‌লো বলে, ওর বাবাকে বলে বাড়ীতেই প্যারালেল বার বসাবে, এসব তথ্য জানা হয়ে যায় প্রকাশের। চারটে পাখী একফায়ারে মেরেছে, এ গল্প রহমতের কাছে অমৃত শুনেছে। কিন্তু কনখল স্বীকার করেনি, বলেছে সে গৌরব প্রাপ্য আয়েষার। এসব অন্তরঙ্গ কথাও প্রকাশের কাছে বলে ফেলে অমৃত।

প্রকাশ প্রাণখোলা হাসি হেসে ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। বলে,—বটে! তাহলে

তুই ত একটা আস্ত মরদ কা বাচ্চা! আমি ভালো হয়ে উঠি, তখন ভাব করব তোর সাথে।

কনখল উল্লসিত হয়ে ওঠে। এ তার কাছে অসামান্য সম্মান বলে মনে হয়। প্রকাশদা একজন বীরপুরুষ, তাঁর সাথে ভাব হওয়া কি সহজ কথা। কনখল ভয়ে ভয়ে বলে,—আমি আপনার কাছে তা হলে ফুটবল খেলা শিখব। আসল ফুটবল।

ন্যাকড়ার ফালির, বাতাবি লেবুর, পুরোনো টেনিস বলের ফুটবল ওরা খেলেছে। সে হোলো খেলার ফুটবল, ফুটবল খেলা নয়।

—সে ত বেশ হবে। শিখিয়ে পড়িয়ে একটা চিল্‌ড্রেন্‌স্‌ ইলেভেন্‌ বানিয়ে নেব। দাঁড়া, ভালো হয়ে উঠি আগে। হ্যারে অমৃত, ওদিকের খবর কি? বিন্দাবনের মা আর বৌ বেঁচেছে ত?

—বাঁচবে না! তুমি নিজেই বাঁচালে ওদের। তোমার কিছু মনে নেই। ওদের নিয়ে যখন তুমি একতলায় নেমেছ, ছোটকোঠার কড়ি ভেঙে পড়ল তোমার ঘাড়ে। সিঁড়ির রেলিংয়ের জন্য বেঁচে গেলে, কড়িটা তাতে আটকে গেল। সবটা চাপ তোমার ওপর পড়লে ত গুঁড়ো হয়ে যেতে। ওরা দুজন ছিল তোমার বগলদাবা। হাত থেকে ছিটকে ওরা গড়িয়ে গেল একটু দূরে, অন্য ছেলেরা সরিয়ে নিল ওদের। আশ্চর্য জানো, ওরা পোড়েওনি।

—যাক, তা হলেই হোলো। ওরা ভালো থাকলেই ভালো। আমার কাঁধ ত দুদিনেই সেরে যাবে। আচ্ছা, আগুন লাগল কি করে খোঁজ পেলি কিছু?

—না। আমাদের গোপালবাবু, ভূগোল মাস্টার গোপালবাবুর ধারণা যে কেরাসিনের কুপি বা তামাকের কল্কে উল্টে গিয়ে পাটগাদায় পড়ে, তার থেকে ছড়িয়েছে চার দিকে। আমারও মনে হয় অম্‌নি কিছু হবে।

—পাটগাদার কথা বলেছেন গোপালবাবু? উনি কি কিছু শুনেছেন?

—কৈ তা ত বললেন না। শোনেননি কিছু নিশ্চয়, অনুমান বলেই মনে হয়। কনখল নিজে শুনেছে গোপালবাবুর কথা—ঠিক্‌ কি বললেন রে তিনি?

—ঐ রকম একটা কিছু হবে বলে তাঁর মনে হয়। খবর কিছু পাননি। আমাদের বলছিলেন যে অসাবধান হলে কত কি হতে পারে।

প্রকাশ যেন আশা করছিল আগুন লাগার কারণ বিষয়ে ওরা আরো সঠিক খবর কিছু দিতে পারবে। তা না পারায় একটু ক্ষুণ্ণ হলো বলেই মনে হোলো। কনখল ভাবছিল নিবারণের ভাই রাখুর রটানো গুজব, আর ডাক্তার জাফরের খবর, সব বলবে কিনা। প্রকাশকে ওর এত ভালো লেগে গেছে যে খবরটা না বলা অন্যায় মনে হতে লাগল। কপটতা ওর মধ্যে আসেনি, গোপন করতে কিছু চায় না। কিন্তু দ্বিধা একটা মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে যে অমৃতর সামনে সরকারী সন্দেহের কথা ফাঁস করবে কিনা। বাবা অসন্তুষ্ট হতে পারেন একথাও ভাবছে সে।

কিছুক্ষণ গুম্‌ হয়ে থেকে মনে মনে ঠিক করে ফেলে, যে মাকে আগে সব বলে, মা যদি বারণ না করেন, তব প্রকাশের কাণে ও সব কথা তুলবে। তার আগে নয়।

আরো অনেক শুভার্থী ধীরে ধীরে আসছে দেখে প্রকাশ বলে,—কনখল, অমৃত,—তোরা যা এবার, খেল্‌গে যা। সময় পেলে কাল আসিস্‌। আমার খুব ভালো লাগবে।

চলে আসে দুজন বাড়ীর সাম্‌নের খেলার মাঠে। গোল্লাছুট খেলা সুরু হয়ে গেছে।

ওরাও গিয়ে যোগ দেয়।

খেলার শেষে ছাপছদ্দ হয়ে কনখল যখন নিজের ঘরে যায়, ভাবতে ভাবতে যায়, মাকে কোন ফাঁকে কথাটা বলবে। মা-ত এখন বাইরের আসরের জন্য চা করতে ব্যস্ত। হরেনবাবু, বিদ্যাভূষণ মশায়কে দেখা যায়, কিন্তু প্যারীবাবু নেই। অল্পক্ষণ পরেই ঘোড়ার পায়ের টগ্‌বগ্‌ শব্দে সবাই রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখেন, সাহেব পাড়ার দিক থেকে প্যারীবাবুর একঘোড়ার বেরুশগাড়ী বাড়ী ফিরছে। ভেতরে প্যারীবাবু বসা, চোগা, চাপকান, মাথায় শামলা। সঙ্গে, কনখল অবাক হয়ে দেখে, তাদেরই স্কুলের নতুন থার্ড মাস্টার বিপিনবাবু। তাঁর পরনেও ইজের কোট, মাথায় ল্যাজঝোলা বাঁধা পাগড়ী।

বাবা বলেন,—ভর সন্ধেয় ওঁরা দুজন কোন রাজকর্ম সেরে আসছেন?

বিদ্যাভূষণ বলেন,—যোগাযোগ ভালো ঠেকছে না হে বাগ্‌চি। দরবারী বেশে প্যারীবাবু, সঙ্গে বিপিন কার্লাইল, কোন ছেলের আবার কি সর্বনাশ করে এল কে জানে।

হরেন চাকী মশায় বলেন,—বিপিন কার্লাইল? সঙ্গের নতুন লোকটা? ওকে এর আগে দেখেছি বলে ত মনে পড়ে না।

—কারণ, দেখনি। হপ্তা দুয়েক আগে শিলচর থেকে বদলী হয়ে এসেছে। সেখানকার স্কুলে পর পর জনাদশেক ছেলে স্বদেশী বলে গ্রেপ্তার হবার পর সরকার আর ওর ওখানে থাকা নিরাপদ বিবেচনা করেননি। ডবল প্রমোশন দিয়ে বদলী করে এনেছেন এখানে। শোনা যায় যে শিগ্‌গিরই 'রায় সাহেব' টাইটেল পাবে।

—ওঃ, তাই! কার্লাইল সারকুলারের ভগ্নদূত! তা ওর সঙ্গে রসরাজ কেন?

তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করবার পর থেকে হরেনবাবু 'রসরাজ' নাম দিয়েছেন প্যারীবাবুর। বিদ্যাভূষণ কল্কেয় ফুঁ দিয়ে হুঁকো টানতে থাকেন, জবাব দেন না। বাবা একটা নতুন চুরুট ধরান। কনখল এইসব দুর্বোধ্য কথার মানে বোঝে না। কিন্তু যখন যেটা মাথায় আসে, তার সমাধান না করে তৃপ্তি পায় না। ছোটে রান্নাঘরে মায়ের কাছে।

—আচ্ছা মা, কার্লাইল সারকুলার কি?

মা চা ঢালছিলেন। পেয়ালা কটা কাঠের চৌকো থালা ন্যাপ্‌কিন দিয়ে মুড়ে তার ওপর বসিয়ে, ঠাকুরকে বললেন বাইরে দিয়ে আসতে। কয়েক প্লেট মুগের পুলি পিঠেও দেখা গেল। কনখল যদিও স্কুলফেরৎ এসে একবার খেয়েছিল, তবুও হাত পেতে বসে মায়ের কাছে। মা হেসে ওর হাতে দুটো পুলি দেন।

—হঠাৎ ও জিনিষ জানার তোর শখ্‌ কেন রে কংখ্‌?

কনখল বিপিন মাস্টার ও প্যারীবাবুর গাড়ী চড়ে ফেরার গল্প বলে। বিদ্যাভূষণ মশায়ের শিলচরের ছেলে গ্রেপ্তার হবার উল্লেখও করতে ভোলে না। মা গম্ভীর হয়ে যান। ভাবেন, যতদিন ছেলে আঁচলের আড়ালে ছিল, সব জিনিষ জানবার, বোঝবার, ওর দরকার হয়নি। কিন্তু স্কুলে ভর্তি হবার পর কত ছেলের, কত লোকের সংস্পর্শে আসছে, আরো আসতে হবেও। এখন ছেলেকে রইয়ে সইয়ে জানতে দিতে হবে অনেক কিছু। একটা নিঃশ্বাস ফেলে মা বলেন,—কার্লাইল সারকুলার হোলো ছেলেরা যাতে স্বদেশীতে মেতে পড়াশুনা নষ্ট না করে, সেই সম্বন্ধে সাবধানী হুকুম। ঐ নামের সাহেব শিক্ষা বিভাগের বড় কর্তা কিনা, হুকুম নামায় তাঁর দস্তখৎ আছে। ছেলেরা যদি মাস্টারমশায়দের কথা না শোনে, বারণ সত্ত্বেও স্বদেশীতে মেতে যায়, তাহলে মাস্টারদের ওপরও হুকুম দেওয়া

আছে, তাঁরা সে সব ছেলের নাম বলে দেবেন সরকারকে। ওই বিপিন মাস্টার তোদের পড়ায় নাকি?

—না, উনি ত উঁচু ক্লাসে পড়ান।

—ওর সাথে গায়ে পড়ে আলাপ পরিচয় করার দরকার নেই। যখন এত জানবার আগ্রহ তোর, তবে জেনে রাখ, আর একটা অমনি হুকুম আছে। সেটা রাস্তাঘাটে যখন তখন 'বন্দেমাতরম্‌' না বলবার। সেটার নাম লায়ন সারকুলার।

—বন্দেমাতরম্‌ ত সবাই বলে। ও কথার মানে কি মা?

—মানে 'মাকে পূজা করি'।

—তাহলে ওতে দোষের কি হোলো?

—সে তুই বুঝবি নে। আরো বড় হ, আরো লেখাপড়া শেখ, বুঝিয়ে দেব। তবে এখন এইটুকু জেনে রাখিস, যে সব লোকেরা সাহেবদের গায়ে বোমা ছুঁড়ে মারছে, বিলিতী নুন, বিলিতী কাপড় জোর করে পুড়িয়ে দিচ্ছে, তারা সবাই 'বন্দেমাতরম' বলে। কথাটার এমনি মানে ত ভালো, কিন্তু দোষের কাজ যারা করছে, তারা বলে, তাই কথাটাই দোষের হয়ে গেছে। তুই ত অনেক গল্পের বই পড়েছিস। জানিস নে, আমাদের দেশে আগেকার দিনের ডাকাতের দল খুব কালীভক্ত ছিল। ডাকাতি করতে যাবার সময় 'জয় মা কালী' বলে হুঙ্কার ছেড়ে বেরোত।

—জানি, জানি, রঘু ডাকাত। কিন্তু সে ত খালি দুষ্টু বড়লোকের বাড়ীতেই ডাকাতি করত। আর সব টাকাকড়ি বিলিয়ে দিত গরীবদের।

—তাহলেও ডাকাতি ত আর ভালো কাজ নয়।

বলে কথায় ছেদ টানেন নিভাননী। প্রসঙ্গ বাড়তে দেন না। বলেন,—সন্ধে হোলো। এইবারে পড়াশুনো। কেমন?

ঘাড় নেড়ে উঠে আসে কনখল। মনে অনেক সমস্যা অমীমাংসিত থেকে যায়। কিন্তু বন্দেমাতরম আর জয় মা কালী, দুইদলের কারুকেই খারাপ মনে হয় না ওর।

বাইরের বারান্দায় প্যারীবাবু এসে গেছেন। কিন্তু কান পেতে শুনে আশ্চর্য হয় কনখল, বাবা, হরেনবাবু, বিদ্যাভূষণ মশায়, কেউ বিপিনবাবু সম্বন্ধে একটিও উচ্চবাচ্য করছেন না। প্যারীবাবু নিজেই বলে চলেছেন,

—পঞ্চাশ হাজারের নীচে হবে না। সর্বনাশ হয়ে গেল আমার। মাল খালাস করে ব্যাপারীদের নৌকো এখনো বিদেয় হয়নি, এরই মধ্যে কি ঘটে গেল!

—অত পাট ছিল আপনার গুদামে?

—ছিলই ত। কাল সমস্ত দিন হিসেবপত্র কষে দেখলুম।

—গুদাম ইন্‌সিওর করা ছিল ত?

—ছিল ভগবানের কৃপায়। কিন্তু সেও অল্প টাকার। মাত্র ত্রিশ হাজারের। তাহলেও দেখুন হাজার বিশেক ক্ষতি। ধনে প্রাণে যাকে বলে গেলুম এবার। কিন্তু করবই বা কি? পুলিশকে জানিয়ে রাখা ছাড়া করবার আছেই বা কি?

হরেন চাকী বলেন,—অর্থহানি হোলো অবশ্য, কিন্তু প্রাণের আবার কি হোলো মশায়? বেশ ত বহাল তবিয়তে আছেন—

—আরে মশায়, ক্ষতির পরিমাণটা একবার ভাবুন। বিশ হাজার টাকা, এ ক্ষতি সামলে উঠতেই ত জান কাবার হয়ে যাবে। আর এই বুড়োবয়সে—

বিদ্যাভূষণ মুখে আঙুল দিয়ে সতর্জনে বলেন,—চুপ্ চুপ্। সহধর্মিণী হয় ত পাশের ঘরেই আছেন, প্রায়ই আসেন কিনা। আপনার মতো যুবক যদি সামান্য অর্থক্ষতিতে নিজের বয়স বাড়িয়ে বলে,—

একটা হাসির গুঞ্জন ওঠে।

কনখল এসব রহস্য বোঝে না, বুঝতেও চায় না। সহজ বুদ্ধিতে এইটুকু বোঝে যে প্যারীবাবুর গুদামের পাট পুড়ে পঞ্চাশ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু, তবে যে মা সেদিন বাবাকে বলছিলেন, নতুন মাসী বলেছে ওদের গুদামে একটুও পাট ছিল না? সেই আগুন লাগবার পরদিন, যেদিন আয়েষারা খেতে এলো দুপুরে? কনখলের ধারণা হোলো, মুট্‌কিটা শুধু পাজীই নয়, মিথ্যেবাদীও। গালটিপে দেবার জন্য, আদিখ্যেতা করার জন্য, মনটা বেজার হয়েছিল উষার ওপর। না জেনে শুনে বাজে কথা বলার জন্য আরও বিরূপ হয়। মা, মাসী বলতে যে শ্রদ্ধার ভাব উদয় হয় ওর মনে, উষা সম্পর্কে সে ভাব আদৌ স্থান পায় না। তাচ্ছিল্যের, অবজ্ঞার, ভয়ের সাথে একটা চাপ্‌লাকার আকর্ষণ জাগে। দুচক্ষে ওকে দেখতে পারে না। কিন্তু চোখ বুজলে বিভীষিকার মতো ওর উপস্থিতি আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়।

রাত্রে খাবার পর বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না ওর। মণিপুরী থেশ্ বুক পর্যন্ত টেনে চোখ বুজে ভাবতে থাকে। এই দুদিনের নানা ঘটনায় ওর জগৎ কতো খাটো হয়ে এসেছে। যতদিন বেশী কাউকে চেনেনি, জানেনি, বেশী কিছু বোঝেনি, অনেক বেশী বড়ো ছিল ওর জগৎ। বিরাট আকাশ, উদার মাঠ, বিস্তৃত হাওড়, অফুরন্ত রেললাইন, অন্তহীন নদী। দূর, দূর, দূর—যতদূর চোখ যায়—সীমা নেই, শেষ নেই। কত দুরাশায় মন ভরে থেকেছে। আলেয়া কি পথ দেখিয়ে হাওড় পার করে দেবে? কাঞ্চনসওয়ারী হয়ে কি মাঠের ওপারে পৌঁছনো যাবে? জঙ্গলের শেষ কোথায়? একটার পর একটা—তার পর আর একটা—আরো, আরো, কত গাছ! রেলগাড়ী যদি আর সামনের স্টেশন বলে কোনো জায়গায় নাই থামে, মেঘনার বুকে ষ্টীমার যদি আর কোনদিন পার খুঁজে না পায়—তাহলে চলা শেষ হবে কোথায়? শেষ খুঁজে না পাওয়ার চলার জগতে ওর মনে কেবলি গুণ্ গুণ্ করে গান বেজেছে—কি আনন্দ, কি আনন্দ!

জগত খাটো হয়ে এল। জগত থেকে শহর, শহর থেকে বাড়ী, বাড়ীর থেকে ঘর, ঘরের ভেতর মশারী। লেপ কম্বল মুড়ি দিলে মশারীর মধ্যেও ঘর। ভিড় করে আয়েষা, উষা, অমৃত, প্রকাশ, রুকমানিয়া, প্যারীবাবু, বিপিন কার্লাইল, কাজীর বাজার, পাটের গুদাম,—সব চুকেছে এসে লেপ কম্বলের মধ্যে। অসোয়াস্তীতে ছট্‌ফট্ করছে ও।

কিন্তু না, পরিত্রাণ আছে। মা'র মুখ, আয়েষার চোখ। আর সব সুখের জ্বালা, দুঃখের দাহ, উত্তেজনা, অবসাদ। মিলিয়ে যায়। স্মরণ আচ্ছন্ন হয়ে জাগ্‌তে থাকে, মা'র মুখ,আয়েষার চোখ। ঘুম আসে আস্তে, নিশ্চিন্ত, পরমনির্ভর, অন্তরঙ্গ, পরিবেশে। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে কনখল।

ঘুমের রাজ্যে আবার অবাধ বিচরণ। মন-সওয়ারী হয়ে এক লহমায় যেথানে খুশী চলে যায়, কোথাও প্রবেশ নিষেধ নেই, বাধা-বন্ধন নেই, নিঃশঙ্ক নিরুপদ্রব বিহার। যেন ওর সত্যিকার-এর জীবন এই স্বপ্নের দেশে জেগে উঠে সুরু হয়। বরফ ঢাকা বিরাট পাহাড় মাঝে মাঝে সাম্‌নে পড়ে, কিন্তু ওর পায়ের ছোঁওয়া লাগ্‌তেই বরফ গলে জল হয়ে পাহাড় মিলিয়ে যায়।

১০

সকালে উঠে প্রথম কথা মনে হয়, ডাক্তার জাফরের খবর আর রাখুর গুজব—মাকে বলে অনুমতি নিতে হবে, প্রকাশদাকে জানাবার। বিপিনবাবুর প্যারীবাবুর সাথে পুলিশ সাহেবের কাছে যাবার অর্থ কিছু বোঝেনি, মার সঙ্গে কাল সন্ধ্যায় কথাবার্তা বলার পর মনে হয়েছে তার সাথে এসবের যোগাযোগ থাকতেও পারে।

সকালের ছোট হাজিরা রহমতের এলাকায়। খানা কামরায় মা তখনো একা বসে কি একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছেন। বাবা সাইকেল করে বেরিয়ে গেছেন। সেদিন রবিবার।

কনখল মাকে সব খুলে বলে। মা কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। নিবারণের ভাই রাখুর রটনা তিনি কিছু শোনেননি আগে, তবে জাফরের কথা ত নিজকানেই শুনেছেন।

—নিবারণ কি করে রে?

—আমাদের স্কুলে ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে। ওরা খুব গরীব কিনা, তাই ওর ভাই কলেজে পাখা টানে। নিবারণ পড়াশুনায় খুব ভালো, ওর মাইনে লাগে না। সংস্কৃত নাকি খুব ভালো জানে, পণ্ডিতমশায়ের মতো সংস্কৃতে কথা বলতে পারে। অমৃত বলে, যে ও সুর করে ওদের সভায় "গীতা" বলে একটা বই পড়ে যায়, শুনতে খুব মিষ্টি লাগে।

—ওদের আবার সভা কিরে?

—ঐ যে প্রকাশদার গীতা সোসাইটি।

—হুঁ। বলে মা চুপ করে যান। ছেলে ধীরে ধীরে এসবের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে, একটুও ভালো লাগে না তাঁর। দিনকাল ভালো নয়, স্বামী চাকুরে। ভয় পান না নিভাননী, ভাবিতা হন। মুখে বলেন,—প্রকাশকে বলবার মতো কি খবর তুই জানিস্, যে বলতে চাস্?

—ঠিক যা শুনেছি। আর মা, বিপিনবাবুর কথাও বলব ত?

—বলতে চাস, বলিস। কিন্তু কখ্, তুই ওদের সাথে বেশী মেলামেশা করিস নি, বাবা খুশী হবেন না।

বাবা যাতে অ-খুশী হবেন, এমন কাজ কনখল করবে না, এ বিশ্বাস আছে নিভাননীর। ছেলেকে চিনছেন তিনি রোজ নতুন করে। জোর করে, অবুঝের মতো বাধা দিয়ে কি ভয় দেখিয়ে, থামানো যাবেও না তাকে, উচিতও হবে না। তাই বুঝেছেন, বোকা নিষেধের নিগড় দিয়ে বাঁধতে গেলে শিশুমন তলে তলে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। উঠতি মনের ছেলের সাহচর্য গোঁয়ারতুমি আর গুরুগিরি দিয়ে বজায় রাখা যাবে না, ভাবেন তিনি। তারপর কথার মোড় ঘুরিয়ে দেন।

—হাসপাতালে যাবি ত প্রকাশকে দেখতে? তখন কিছু ফলমিষ্টি নিয়ে যাস্। আহা বেচারা, কত কষ্ট পাচ্ছে খাওয়াদাওয়ার। কি বিশ্রী খেতে দেয় ঐ হাসপাতালগুলোতে।

আনন্দে কনখল লাফাতে থাকে। বলে,—তুমি কি ভালো মা! কি খুশীই হবেন প্রকাশ দা। আর দেখ, ফলমিষ্টি কিন্তু আমিই হাতে করে নেব—হারুকে নিয়ে যাব না। বুঝলে? বীর প্রকাশকে ফল উপহার দেবার গৌরবে ভাগীদার চায় না ওর মন।

—বুঝেচি। নিস্। আজ ত রবিবার, হাসপাতালে যাওয়া সেই বিকেলে। ভাবছি দুপুরে যাব গণিমিঞার বাড়ী। ওঁর স্ত্রী, আর মেয়ে ইভা, একদিন দুপুরে এসে গেছেন। যাবি তুই?

—যাবই ত। ইকবাল ত আমাদের সাথে পড়ে। খুব নিরীহ, মিনমিনে ছেলেটা। খালি পড়ে—একটুও খেলতে চায় না।

গণিমিঞারা পাশের বাড়ীর বড়লোক। গোঁড়া মুসলমান। মস্ত সিংদরজাওয়ালা বাড়ী, সামনের দিকে ফুলবাগান। আসল বাড়ীর বাইরে বিলিতী কেতাদুরস্ত ব্যবস্থা, ভেতরের দিকটা হারেমের মতো নিশ্ছিদ্র। খুব ছোট ছোট জানলা প্রায় ছাদ ঘেঁসা, বাইরে থেকে এই শুধু দেখা যায়। তখনকার জমানায় সাহেবসুবোর সাথে মিলমিশ করবার রেওয়াজ পড়ে গেছে, তাই বাড়ীর মেয়েরা ভরদুপুরে আপাদমস্তক বোরখা ঢেকে পাশের বাড়ী আসতে সাহস পাচ্ছেন। তবু, হাজারো আবরু রাখবার প্রাণপণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নিন্দুকের জিভ্ ঠাণ্ডা নেই। সব তাতেই তারা মানে খুঁজে বার করে। গণিমিঞার বাড়ীর জেনানা, পাশের প্যারীবাবুর বাসায় জন্মেও পা দেন নি, কিন্তু বাগ্‌চি যে হাকিম,—সাহেব লোক—তাই তার ওখানে আসতে কসুর করেনি। এ নিন্দায় যে সত্য আছে, তাও অস্বীকার করা যায় না।

সে যা হোক, তখনকার মতো কনখলের কাজ হাসিল হয়েছে—সে ফুর্তির সাথে ফেরে নিজের ঘরে। কিছুক্ষণ বসে বই নাড়াচাড়া করে, ভালো লাগে না। কখন বিকেল হবে, হাসপাতালে যাওয়া যাবে তারই জল্পনায় মেতে থাকে। খানিক পরে উঠে বাবুর্চিখানার দিকে যায়।

রহমৎ একরাশ ছুরি, কাঁটা, চামচ ছাই রংয়ের কি যেন মেখে গাদা করে রেখেছে। একটা গোরা-পল্‌টা ছোঁড়া, গায়ে ভুষো উড়ছে, কপালের একদিকে কাটা দাগ—বসে বসে চাম্‌চে, কাঁটা, ঝাড়ন দিয়ে ঘসে রুপোর মতো ঝক্‌ঝকে করছে। রহমৎ বাবার ক্ষুর ধারদেবার জিনিষটার মতো একটা সরু পাটায় সাঁ সাঁ করে ছুরিগুলো বুলোচ্ছে। তারপর ওই ছোঁড়াটার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে সাফ্ করবার জন্যে। ছোট্ট বাঁশের মোড়া একটা ওর দিকে ঠেলে দিয়ে বলে,

—বইঠ্ যাও কনাবাবা। বোসো। দেখ, কেমন হাতিয়ার সাফ হচ্ছে।

তা, হাতিয়ার ত বটেই। হাত দিয়ে ঐ ছুরি ধরে মাংসের কাট্‌লেট কেটে কাঁটা বিঁধিয়ে মুখে তুলে দেওয়া—গ্র্যাণ্ড। তলোয়ার দিয়ে কাটা হয় জ্যান্ত মানুষ যুদ্ধের সময়, আর এই ছুরিতে রান্না মাংস,—খাবার সময়।

ছোঁড়াটাকে ভালো করে দেখছে কনখল। জানে, ও বাড়ীর পেছনেই পুকুরের ওপারে থাকে ওর মার সাথে। ওর নাম ব্যাঙা। কিন্তু ভাব হয়নি এখনো। ও পারতপক্ষে সামনেই আসে না। ওর মাকেও দেখেছে কাঠকুটো কুড়োতে, শুনেছে মেমের আর বাচ্চাদের কবরে রোজ চেরাগ জ্বালা ওর কাজ, মিশন থেকে তার জন্যে পয়সা পায়। খবর সরবরাহক হয় রহমৎ, নয় হারুণ।

ব্যাঙার কাজ শেষ হয়ে যেতে, ও যাবার জন্য ওঠে। কনখলও সাথে সাথে উঠে আসে। ব্যাঙার কুণ্ঠিত ভাব কাটাতে বড় জোর দশ মিনিট লাগে ওর। তার পর দুজনে দুজনার গলায় হাত দিয়ে বাড়ীর পেছনে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বেলা এগারোটা নাগাদ দেখা যায়, দুজনে পুকুর ঘাটে সিমেণ্টের বেঞ্চির ওপর বসে পরম আনন্দে পেয়ারা চিবুচ্ছে। ওর অনেক খবর নিয়ে নিয়েছে কনখল। ওর বাবার কথা শুনে ত মোহিত হয়ে গেছে।

ওর বাবা এখন বাড়ীতে নেই, জেলে আছে। মাঝে মাঝেই যায়, আবার ফিরে আসে। এজন্যে ওরা কেউ কিছু ভাবে না। গেরস্ত বাড়ির এটা, ওটা, প্রায়ই খাবার জিনিষ, কি

ছেঁড়া জামা কাপড়, না বলে নিয়ে নেয় ওর বাবা। সেও খুব অভাবে পড়লে। চোর বলে ধরা পড়লে হেসে বলে, আরে আমার নেই, ঠেকা,—ওদের ঢের আছে। নিয়েছি ত, কি হয়েছে? ওরা কি গরীব হয়ে যাবে, না আমি বড়লোক হব? ব্যাঙা, ব্যাঙার মাকে নিয়ে আজ আমার ঘরে খাবার কিছু নেই, তাই ত নিয়েছি। না হক্ চোর বলছ কেন? কাজকর্ম দাও, খেতে দাও, পরতে দাও,—নেব না কিছু।

কিন্তু কাজ কেউ দ্যায় না, খেতেও দ্যায় না। ধরে পুলিশে দ্যায়। ব্যাঙার বাবা কাটিয়ে আসে সরকারী অতিথশালে দিনকতক। মিছে কথা কয় না। ফিরে এসে আবার কাজ খোঁজে। জেল ফেরৎ দাগী চোরকে কে দেবে কাজ? কেউ দ্যায় না। দ্যায় বকুনী, আর সদুপদেশ। দুটোর একটাতেও পেট ভরে না।

ব্যাঙার কাছে আরও শোনে কনখল, ডাক্তার সাহেবের মেম এই তলাওয়ে ঝাঁপ দেবার পর, জল না আসা পর্যন্ত ওর বাবা ডুব সাঁতার দিয়ে ঝাড়া দুঘণ্টা খুকী দুটোকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। পারেনি, শুধু মেমসাহেবের ঘাগরা ধরে পাড়ে টেনে এনেছিল। তবুও ডাক্তার সাহেব ওকে বকশিস করেছিলেন। কাজও দিয়েছিলেন আস্তাবল সাফ্ করবার, টম্‌টম্ ধোওয়া মোছার। মাইনে অল্প ছিল, কিন্তু অভাব ছিল না তখন। খিদ্‌মৎগারের সাথে ভাব করে বাবুর্চিখানা থেকে ঝরতি পরতি এটা সেটা খাবার জিনিষ সংগ্রহ করত। বেশ সুখে ছিল ব্যাঙারা তখন। এর ওর জিনিষ না বলে নেবার দরকার হয়নি ওর বাবার। তার পর, ডাক্তার সাহেব চলে যেতে ওর কাজও গেল, আবার অভাবে পড়ল। আবার সরু হোলো হাতটানের কসরৎ।

কনখল ভেবে ঠিক করে, ওর বাবার কিছু দোষ নেই। সব দোষ লোকেদের। কেন ওকে কাজ দেবে না, খেতে দেবে না? কাজ চাইলে বলবে দাগীকে বিশ্বেস কি, আর ক্ষিদের জ্বালায় কিছু নিলেই বলবে, চুরী করল! ও মনস্থির করে ফেলে, ব্যাঙার বাবা ফিরলেই নিভাননীকে বলে একটা কাজ দেবার ব্যবস্থা করবে। ওদের টম্‌টম্ নেই বটে, কিন্তু ঘোড়া আছে, আস্তাবল পরিষ্কার করার কাজ বাইরের জমাদার করে, সেই কাজ করবে ব্যাঙার বাবা।

হঠাৎ ব্যাঙা কনখলের মুখে হাত চাপা দিয়ে ঝাঁকড়া আমগাছটার মগডালের দিকে আঙুল দেখায়। কানে কানে ফিস্‌ফিস করে বলে,—চু-উ-প।

মগডালে কি যেন পাখীর ঝট্‌পটানি শোনা যায়। ঘন পাতার আড়াল বলে দেখা যায় না। তাকিয়ে দেখে, ব্যাঙা কাঠবেড়ালীর মতো স্বচ্ছন্দে তরতর করে গাছে উঠ্‌ছে। বড়ো বড়ো চোখ করে কনখল তাকিয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে নেমে আসে ব্যাঙা। আঙুলের ফাঁকে চেপে ধরেছে দুটো পাখীর চার পা, পাখী দুটো উল্টে, বেঁকিয়ে ঠুক্‌রে দিচ্ছে ওর হাতখানা। ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। এক হাতে গাছের গা জড়িয়ে ধরে ধরে নেমে ধুপ্ করে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে। ছুটে যায় কনখল মহা উল্লাসে। ও কিছু প্রশ্ন করার আগেই ব্যাঙা বলে,—দুটো কোকিল। এই কুচ্‌কুচে কালোটা মদ্দা—কী মিষ্টি আওয়াজ করে 'কু' 'কু' করে, আর দ্যাখ, বোকার মতো চোখ করে তাকিয়ে আছে খালি। আর এই ফুট্‌ফুটে দাগ গায়ে—এটা মাদী। এর গলায় গান নেই, কিন্তু ঠোক্‌রাতে ওস্তাদ। দেখ্‌লি ত, এই দুমিনিটের মধ্যে আমার হাতটা কি করে দিল কামড়ে?

বলে ব্যাঙা কালো পাখীটার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে। আর মাদীটার পিঠে

আস্তে আস্তে চড় মারে। বলে,—আজ দুদিন আগে থেকে আঠা করে রেখেছিলাম মগডালে। কাঁদন থেকে দেখছি রোজ দুটিতে এসে বসে। বর্ষার কোকিল ত, বাসা বাঁধার ফিকিরে ঘোরে, বেশী উড়ে বেড়াতে পছন্দ করে না। পর পর দুদিন আসা দেখেই ধরে নিলাম এই জায়গাটা ওদের পছন্দ হয়েছে। তার পর, অনেকটা কাঠালের আঠা ওদের বসবার জায়গা দিয়ে পুরু করে মেখে রাখলাম। আজ বাছাধনেরা ধরা পড়েছে।

—ব্যাঙা ভাই, চল্, মাকে দেখিয়ে আসি।

ব্যাঙার সরল মুখে বিষাদের ছায়া নামে। বলে,—যদি রাগ করেন?

—রাগ করবেন কেন রে? খুশী হবেন পাখী দেখে।

না পাখী দেখে নয়—এই,—এই,—তোর সাথে আমার ভাব হয়েছে দেখে যদি বকেন? আমার বাবা চোর কিনা,—তাই—

কনখল খিলখিল করে হেসে ওঠে। বলে,—তুই মাকে চিনিস্ না। আর, খিদের জন্যে খাবার জিনিষ নিলে বুঝি চোর হয়?

—সবাই যে বলে, না বলে নিলে হয়।

—তাহলে ত আমিও চোর। কতদিন মাকে না বলে টিন থেকে বিস্কুট খেয়ে নিয়েছি। তুই বড় বাজে বকিস্ ব্যাঙা, চল্, চল্—

ব্যাঙার হাত ধরে টেনে নিয়ে বাড়ীতে ঝড়ের মতো ঢোকে কনখল।

—মা, মা, দেখবে এস—

নিভাননী রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। ব্যাঙার হাতে পাখী, আর কনখলের হাতে ব্যাঙার আর এক হাত ধরা, দুজনে এসে মার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপায়। অনর্গল বকবক করে যায় কনখল,—সে তুমি বুঝবে না মা, হেই—ওই উঁচুতে। কাঠবেড়ালীর মতো উঠে গেল, নেমে এল পাখী হাতে। কি সাহস—ঠুক্‌রে হাত রক্তারক্তি করে দিয়েছে মাদীপাখীটা, তাই কি ছেড়েছে ও? কালোটা পুষব—খুব ভালো গান করে মা। কোকিল পাখী খুব ভালো পাখী—না মা?

নিভাননী মুখ টিপে হাসেন। বলেন,

—কিন্তু ছেলেটার হাত যে খুব জখম হয়েছে। ঠাকুর, দুটো গাঁদা পাতা এনে থুয়ে থেঁৎলে দাও ত শিলে। থুয়ে নাও শিলটা, মরীচবাঁটা না থাকে যেন—তোকে ত আমি চিনিরে। কি নাম যেন তোর—ব্যাঙা, না? জটিবুড়ির ছেলে তুই?

ব্যাঙা ঘাড় নেড়ে জানায়, হ্যাঁ। ওর মার নাম জটিলা, জটিবুড়ি বলে পাড়ার লোক। নিভাননী জানেন ওদের ইতিহাস। কিন্তু ওরাও কোনদিন সাহস করে তাঁর কাছে আসেনি, ওঁরও ডাকবার দরকার হয়নি। পাখীধরার ওস্তাদিতে ও যে ছেলের মন জয় করেছে, বুঝতে দেরী হয় না বুদ্ধিমতী নিভাননীর। ছ্যাঁচা গাঁদাপাতা সস্নেহে ব্যাঙার হাতে লাগিয়ে সাদা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বেঁধে দেন। উঠোনে পলোচাপা দেওয়া থাকে পাখী দুটো। বলেন,—দাঁড়া ব্যাঙা, যাস্‌নে। কিছু খেয়ে যাবি, যাস্‌।

ব্যাঙার চোখ ভরে যায় জলে। কোথায় বকুনী খাবে, ভয় পেয়েছে, পাচ্ছে খাবার জিনিষ। হাতের ব্যথা ও থোড়াই কেয়ার করে, কিন্তু আর যেন কোথায় খচ্ করে ব্যথা লাগে ওর। কাপড়ের খুঁটে দিয়ে চোখ মোছে।

কনখল বলে,—খুব লাগছে হাতে, নারে? ভাবিস না গাঁদাপাতা খুব ভালো জিনিষ—চট্ করে সেরে যাবে। আমার ত কেটে গেলেই লাগাই।

ব্যাঙা সামলে নিয়ে হাসে। জানায়, যে হাতের ব্যথায় ওর কিচ্ছু কষ্ট হচ্ছে না।

নিভাননী বাটিতে করে মুড়ি নারকোল দেন খেতে। যদিও স্নান খাবারদাবার সময়—তবুও কনখল ছাড়ে না। ওকেও দিতে হয় ছোট এক বাটি। দুজনে দাওয়ায় বসে মুড়ি খায়, নিভাননী পাশে বসেন। বলেন,—পাখী দুটোর গতি কি হবে, বল এখন।

—কেন, পুষব।

—বনের পাখী, খাঁচায় পুষে কদ্দিন বাঁচিয়ে রাখবি? দুদিনে মনমরা হয়ে মরে যাবে। তার চেয়ে আমি বলি কি, ওদের ছেড়ে দিই। আবার উড়ে গাছে গিয়ে বসুক, গান করুক,—সেই ভালো, নারে?

কনখল রাজী হতে চায় না, কিন্তু ব্যাঙার আপত্তি নেই। ও ত ধরবার আনন্দ ষোল আনা পেয়েছে, পোষবার ঝকমারীতে গিয়ে কি হবে।

কনখলকে বোঝান নিভাননী। কত হরেক রকম পাখী গাছে গাছে। কত নানা সুরে গান করে, শীষ দেয়। মানুষ কি পারে সব ধরে ধরে খাঁচায় পুরে পুষতে? তার চেয়ে পাখীর যেখানে নিজের জায়গা, আকাশের কোল, গাছের ডাল—সেইখানেই ওদের ছেড়ে দেওয়া ভালো।

কনখলের মন নরম হয়ে আসে। বুঝুক, না বুঝুক, মার কথায় আর আপত্তি করে না। শিশুমনে আর এক দুষ্টবুদ্ধি উঁকি দেয়। মাকে যদি পাখী ছাড়তে রাজী হয়ে খুসী করে দেওয়া যায়, তবে জেল থেকে ফিরলে ব্যাঙার বাবাকে কাজ দিতে রাজী করানো সহজ হবে। না পুষে পাখী ছেড়ে দেওয়া তার ইচ্ছে নয়, অথচ অন্য কাজ হাসিল করবার জন্য তাতে রাজী হতে হবে, এ মতলবের কপটতার দিক তার মনে আসেনি, সে শুধু ভেবেছে, মাকে খুশী রাখতে হবে। মা খুশী থাকলে ও যা চাইবে, তাই পাবে। কাজেই ঘাড় নাড়ে কনখল।

—তবে দাও মা ছেড়ে, কিন্তু,—

উসখুস করে কনখল। নিভাননী ছেলের ধাত জানেন। বদলে একটা কিছু চায় সে, বুঝতে দেরী হয় না তাঁর।

—কিন্তু কিরে? পাখী ছেড়ে দেব, তাতে আর কিন্তু কি? ঠাকুর, তেলের বাটিটা দাও তো।

পলোর ভেতর থেকে একটা করে পাখী ধরে পায়ের কাঁঠালের আঠা তেল দিয়ে তুলে দেন। তারপর হুস করে উড়িয়ে দেন পাখী দুটোকে। ব্যাঙা, কনখল, দুজনে চেয়ে থাকে উড়ন্ত পাখীর দিকে। কনখল বলে,—যদি আবার ঐ আঠামাখানো ডালে বসে, তবে তো আটকে থাকবে।

—তাই কখনো বসে? একবার যেখানে ধরা পড়েছে, মরলেও ওরা আর ওখানে যাবে না। আমি কত পাখী ধরেছি, এসব আমি খুব জানি। ওরা এবারে অনেক দূরে, আর এক গাছে গিয়ে বাসা বাঁধবে।

ব্যাঙার মুড়ি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। নিভাননী এক ফালি কুমড়ো আর দুটো বেগুন, আর ন্যাকড়ার পুঁটলীতে চারটি মুসুরী ডাল, ব্যাঙার হাতে দিয়ে বলেন,—তোর মাকে দিস।

সাহেব ডাক্তারের সময় এই রান্নাবাড়ীটার এক ঘরে মিসিবাবাদের আয়া থাকত, সেটা এখন ভাঁড়ার ঘর হয়েছে। আর যে ঘরটায় খালি তোরঙ্গ, প্যাক বাক্স, এইসব দিয়ে জাঁতিয়ে

রাখা হয়েছিল, সেইটেতে উনুন ফুটিয়ে হে'সেল বানানো হয়েছে। সামনে টানা বারান্দা, বেশ রোদ পড়ে। পেছন দিকে পুকুর।

খিড়কি দিয়ে পুকুরে যাবার রাস্তায় দুটো জোয়ান ছাগল বাচ্চা মুখোমুখী হয়ে সামনের দু-পা তুলে তালঠুকে শিং গুতোগুতির খেলা খেলছিল। একটারও শিং ওঠেনি—কপালে কপাল লাগিয়ে মাঝে মাঝে বেশ খানিকক্ষণ স্থির হয়ে থাকছে। কনখল বেশ কিছুক্ষণ দেখে, আপন মনেই বলে,—ধেৎ, এতো আপোষে লড়াই। এই কেলেটা, দেনা ওটাকে গুঁতিয়ে বেড়াঠাসা করে।

বাচ্চা দুটোর মা একটু দূরে নিবিষ্ট মনে ঘাস খেয়ে যাচ্ছিল, ওদের খেলার দিকে মোটেই নজর দেবার দরকার মনে করে নি। মাঝে মাঝে মাথা তুলে ঘাস চিবোতে চিবোতে তাকাচ্ছে ওদের দিকে, যেন বাড়াবাড়ি কিছু না হয়, খেয়াল রাখবার জন্যে। ওখানকার ঘাসের স্বাদ আর হয়তো ভালো লাগল না, এগিয়ে গেল পুকুরের দিকে। বাচ্চা দুটোও লড়াই বন্ধ করে ছুটে দিল মায়ের পিছে।

ব্যাঙা চলে গেছে। কনখল উঠে মায়ের হাত ধরে বলে,—ঘরে চলো।

নিভাননী ঘরেই যাচ্ছিলেন। কনখলের হাত ধরে চলতে চলতে জিজ্ঞেস করেন,—কি যেন বলবি মনে হচ্ছে, কংখ?

—আচ্ছা মা, ওই ব্যাঙার বাবার তো খুব সাহস, তবে লোকে ওকে চোর বলে কেন? সাহেব ডাক্তারের মেমকে দুঘণ্টা ডুব সাঁতার দিয়ে তুলেছে, ও তো বাঁরেরই কাজ করেছে, না, মা?

—তা করেছে বৈ কি।

—ওদের খাবার থাকে না, তাই অন্যেরটা নিয়ে খায়। কাজ থাকলেই খাবার থাকে, তবে ওর কাজ নেই কেন মা?

—ও যে চুরি করে, তাই ওকে কেউ কাজ দেয় না।

—কাজ না থাকলে খাবার জন্যে চুরি করতে হয়, আবার চুরি করলে কেউ কাজ দেবে না, তবে কি ব্যাঙার বাবা শুধুই জেলে যাবে আর চুরি করবে, ভেবে কিনারা করে উঠতে পারে না কনখল। বলে,—ডাক্তার সাহেব ওকে আস্তাবল সাফ করবার কাজ দিয়েছিলেন, তখন ও চুরি করেনি। এবার জেল থেকে ফিরলে ওকে ওই কাজ দিও মা, তাহলে ও আর চুরি করবে না। ওর বাবা চোর বলে ব্যাঙা প্রথমে আমার সাথে আসতেই চায় না। কাজ হলে ব্যাঙার আর লজ্জা করবে না। ব্যাঙা খুব ভালো ছেলে মা।

নিভাননীর মায়ের মন। ছোট ছেলে ভালো ছাড়া আর কিছু হবে ভাবতে চান না তিনি। বলেন,—আমার তো বেশ লাগল ছেলেটাকে। চালাকচতুর, চটপটে। চামচে, পিরীচ সাফকরার কাজে ওকে নিতে রহমতকে বলে দিয়েছি তো সেদিন। ওর মার হাতে মাসে দুটাকা করে দেব, বলেও দিয়েছি। করছে না সে কাজ?

—করছেই তো! মা, তুমি কি লক্ষ্মী। তবে ওর বাবা এলে তাকেও একটা কাজ দিও—তখন আর কেউ চোর বলতে পারবে না ওদের। খুব মজা হবে তাহলে, ও মন খুলে খেলতে পারবে আমার সাথে। কেউ কিছু বোঝে না! খিদে পেলে খাবার জিনিষ নিলে কেউ নাকি চোর হয়! তাহলে তো আমিও চোর—

বলেই জিভ কাটে। মার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে। তারপর লাফাতে লাফাতে সরে পড়ে।

বিকেল হবার আগেই অস্বস্তি সুরু হয়।

—এখনো হল না, মা? ঐ তো দুটি ফল, আর কিছু খাবার—দাও না চট করে গুছিয়ে। আবার ঢের লোক এসে গেলে আমার লজ্জা করবে, দিতে পারব না তখন।

—উতলা হোসনি কংখ—অমৃতই তো এখনো আসেনি। এই হোলো বলে—

মা একটি ছোট বিস্কুটের টিনে কমল পিঠে প্যাটিসাপটা আর চিনিতে জ্বাল দেওয়া টিকলি গুছিয়ে দেন। ঝাড়নে বেঁধে দেন গুটিকয় আপেল আঙুর বেদানা। আরো খানিকক্ষণ দাফাদাফি করবার পর অমৃত এলে দুজনে বাঁরপুজার ভোগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। নিভাননী ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে গৃহকর্মে মন দেন।

রোগীর সাথে দেখা করবার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পৌঁছয় ওরা। কনখল ডাক্তারের চেনা বলে ছাড় পেয়ে যায়। প্রকাশকে খাবার জিনিষ খুলে সাজিয়ে দিতে আনন্দে মুখ তার ভরে ওঠে। কনখলকে যেন আজ আবার নতুন করে দেখে।

—করেছিস কি রে তোরা! এত সব ভালো ভালো খাবার।

—মা নিজে দুপুরে বানালেন প্রকাশদা। বললেন হাসপাতালের কি বিশ্রী খাবার। আমরা এর আগে পুলিশ হাসপাতালের টিলায় ছিলাম কিনা, তাই দেখেছি।

—তা সত্যি। কিন্তু এইসব ভালো জিনিষ খেলে এখানকারগুলো আরো অনেক বেশী খারাপ লাগবে। তা লাগুক—দে তো অমৃত, একটা একটা করে আমার মুখে ফেলে।

চোখ বুজে প্রকাশ পরম পরিতৃপ্তির সাথে খেয়ে যায়। তারপর জল খেয়ে বলে,—খবর কি, বল।

খবর বলতেই তো আসা, মনে মনে তালিম দেয় কনখল। তারপর বলে যায় সব শোনা কথা। কেমন করে বলতে হয়, কেউ ওকে শেখায়নি, কিন্তু রীতিমতো গুপ্তচরের ধরনে কখনো ফিসফিস করে, কখনো উত্তেজিত হয়ে—বলে যায় আনুপূর্বিক যতটুকু জানে ও।

প্রকাশ সব শোনে। কিছুক্ষণ একটি কথাও না বলে চুপ করে যেন ধ্যানস্থ হয়ে, শুয়ে থাকে। যখন কথা বলে, গলার আওয়াজ চাপা, কিন্তু তীব্র।

—প্যারীবাবু নিজে বলেছেন ওঁর পঞ্চাশ হাজার টাকার পাট ছিল গুদামে?

—হ্যাঁ।

—ওঁর স্ত্রী বলেছেন, গুদাম খালি ছিল? আগুন লাগবার পরদিন?

—আমি শুনিনি, মাকে বলেছেন। মা বাবাকে বলছিলেন, সেটা আমি শুনেছি।

—ও একই কথা। রামহরি যা রটাচ্ছে, সেটা কে শুনেছে?

—তা বলতে পারব না প্রকাশদা। অমূল্য বলছিল স্কুলে যাবার পথে কালকে—কিন্তু তারও শোনা কথা।

—হুঁ।

প্রকাশ শুয়ে শুয়ে ভাবে। এবার যখন কথা বলে, ওর মুখ ম্লান দেখায়। গলার আওয়াজ বিষণ্ণ ঠেকে।

—কনখল, ভাই—তুমি আর কখ্খনো আমায় দেখতে এসো না। অমৃত, তুইও আসিস নে। আর এক কাজ করবি তুই—এখ্খুনি চলে যা, গিয়ে নিবারণকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবি। বলবি, যদি পারে, রাখুকে যেন সাথে নিয়ে আসে। আর শোন,—না, থাক, নিবারণ এলেই হবে।

আহত হয় কনখল প্রকাশের কথা শুনে। নিরাশার ছাপ পড়ে মুখে। প্রকাশ বুঝতে পারে। হেসে, সস্নেহে বলে,—এবার আর তুমি নয়, তুই করেই বলে,—মন খারাপ করিসনে কনখল। তুই জানিস না তুই আজ আমার কত উপকার করলি। তোকে খুব ভালোবেসে ফেলেছি রে, তোর মাকেও। কিন্তু তোর বাবা যে হাকিম, আমার সাথে মেলামেশা করলে তাঁর বদনাম হবে। কেন, তা তুই বুঝতে চাস নে, পরে আপনিই বুঝবি। আর দ্যাখ, এই বিস্কুটের টিন, ঝাড়ন, আর বাকী ফল কটা, সব নিয়ে যা—তোদের আনা খাবারের যেন কোন চিহ্ন না থাকে। আমি তো পেট ভরে খেয়েছি। মাকে আমার অনেক প্রণাম দিস। এখন যা।

শেষ কথা কটায় এমন প্রভুত্বের সুর ফোটে, যে ওরা একটি কথাও বলতে পারে না। অমৃত ওর গায়ে হাত দিয়ে যাবার ইশারা করে। বাইরে বেরিয়ে এলে বলে,—প্রকাশদা অনেক বোঝে রে, যা বলে শুনতে হয়।

মনমরা কনখলকে নিয়ে অমৃত যখন হাসপাতালের সদর দরজা পেরিয়ে দক্ষিণের গলিতে বাঁক নিয়েছে, পুলিশ সাহেবের টমটম এসে হাসপাতালে ঢোকে। টমটমে পুলিশ সাহেবের সাথে আর একজন বাঙালী পুলিশ আর বিপিন কার্লাইল। অমৃত বলে—ভাগ্যিস আমাদের দেখেনি। আর দেখলেই বা কি, চেনে না তো—

হ্যাসেটের 'ইয়ং ম্যান'-কে পুলিশ সাহেব বিলক্ষণ চেনেন। সে বলে, চিনলেই বা। আমরা কি করেছি যে ভয় পাব? আর নর্টন তো ভালো সাহেব, আমাকে একটা দো-ফলা ছুরি দিয়েছিল।

অমৃত বেশী বড় না হলেও প্রকাশদাদের গীতা সোসাইটি যে সরকারের পেয়ারের নয়, এমন কানাঘুসা শুনেছে। সময়টা পুজোর আগে,—বিলিতি নুন, বিলিতি কাপড়—কাজীর বাজারে আগুন—সব জড়িয়ে প্রকাশদাদের ঘিরে যে একটা বিপদের মেঘ ঘনাচ্ছে, আভাসে বোঝে। কনখলকে সব বোঝাতে যায় না। ছিটে ফোঁটা যা জানে, এক আধটু বলে—জানিস, ঐ বিপিন মাস্টারকে সেদিন গোপালবাবু বলছিলেন স্পাই। ও নাকি ছেলেদের স্বদেশীতে ধরিয়ে দেয়, তার জন্যে সাহেবদের কাছে নাকি বকসিস পায়। যাকগে ওসব কথা, তুই বাড়ী পালা। আমি ঐ দিক ঘুরে যাব—নিবারণকে খবর দিতে হবে। বাড়ী থেকে বেরোস নি,—যদি পারি, আসব খেলতে।

একা বাড়ী ফেরে কনখল। ফেরবার রাস্তায় মনে হয়, যেন অনেক কথা বলবার আর জানবার আছে ওর। সেগুলো কি,—তার সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই। মন খুলে কথা বলার লোকই বা কে আছে এক মা ছাড়া,—আর, আর আয়েষা ছাড়া? ওর অস্পষ্ট মানসে দুটি মুখ ফুটে ওঠে—পরম নির্ভর, পরম নিরাপদ, নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাড়ীর দিকে এগোয়, কিন্তু বুকের ভেতর একটা চাপা উত্তেজনা আকুলি বিকুলি করতে থাকে।

১১

নিভাননীর কাজ নেই, তাই কাজের অন্ত নেই। সর্বসাকুল্যে তিনটি প্রাণীর খিদ্‌মতে রহমৎ, হারুণ, ঠাকুর, চাকর—চারটি তো আছেই, ফাউ হিসেবে ব্যাঙাও জুটে গেছে। নিরুপদ্রব সংসার। এ বাড়ীতে আসবার পর থেকে হৃষিকেশেরও যেন বাইরের কাজ বেড়ে গেছে। এক সন্ধ্যার পর, আর ছুটিছাটার দিনে ছাড়া তাঁর সঙ্গ প্রায় পাওয়া যায় না। পুলিশ হাসপাতালের

টিলার প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন ছেড়ে এখন জুটে গেছে পাড়াপড়শী গিন্নীবান্নি ছুঁড়ি বুড়ির দল। গৃহকর্মের অবসর দুপুরে বিকেলে এ ও সে আসে, গল্পে গুজবে, পান খেয়ে, ঘর গেরস্তালীর কথা বলে সময় কেটে যায়।

প্রায় নিত্যকার এক কাজ জুটেছে বিকেলে মেয়েদের চুল বাঁধা। ও কাজটা নিভাননী পারেন ভালো, হালফ্যাশনের অনেক নকসা জানা আছে ওঁর। খদ্দের বেশী নেই। যুবতীদের মধ্যে ঊষা, আর বিদ্যাভূষণের মেয়ে মায়া। মায়ারও বিয়ে হয়ে গেছে, এখন বাপের বাড়ী এসেছে। কনখল যখন এসে পৌঁছয়, তখন বিকেলে গা ধুতে যাবার আগেকার কেশবন্ধন পালা সুরু হয়েছে। অমৃল্যর মা একধারে বসে চুনখয়ের লেপা খোলা পানের ওপর জাঁতি ধরে সুপুরী কুচোচ্ছেন। আর মা, চুল বাঁধা সবে শেষ করে মায়াকে ছেড়ে, ঊষাকে নিয়ে পড়েছেন।

মায়া ঊর্ধ্ববাহু হয়ে তেল চপচপে আঁট বিনুনীর ওপর হাতের তেলো দিয়ে খোঁপায় গোঁজা চুলের কাঁটা শিজিল করছে। আদুল গায়ে খালি শাড়ির তলায় ধবধবে বুক দুটো থরথর করে কাঁপছে—ঠায় দাঁড়িয়ে দেখে কনখল, চোখ ফেরাতে পারে না। চোখে চোখ পড়তে মায়া সিঁদুরগোলা মুখে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আঁচল টেনে গা ঢাকে।

মায়ের দল ওর উপস্থিতি আমলেই আনেন না। কিন্তু মুটকি ঊষার ঠোঁট ধারালো হাসিতে ঝিকমিক করে। যেন ঠোঁটকাটি বলতে চায়,—আ মর। হ্যাংলার মতো গিলছে দেখ না।

যলে না ঊষা কিছু। আলগোছে গা থেকে আঁচল যেন অন্যমনস্কভাবেই পড়ে যায়, তুলে দেওয়া দরকার মনে করে না।

এ দৃশ্য কনখলের অ-দেখা নয়। আর আর দিন ভ্রূক্ষেপও করে না। আজ মন চঞ্চল, কী যেন আলোড়ন উঠেছে প্রকাশ-বিপিন-পুলিশ সাহেব সব জড়িয়ে। ও ছুটে পালায় ওখান থেকে, শিরায় শিরায় কিসের যেন জ্বালা ধরে—বুক দপদপ করতে থাকে। মাকে কত কি বলবার আছে, সাময়িকভাবে ভুলে যায় ও।

চুল বেঁধে মেয়েরা যখন পুকুর ঘাটে গা ধুতে যায়, ছাদের চিলে কোঠার জানালার খড়খড়ি ফাঁক করে মোহগ্রস্ত হয়ে তাকিয়ে দেখতে ভালো লাগে ওর। ঊষার না বলা মন্তব্যের মতোই দেখতে থাকে—যেন গিলছে। ওরা কেউ ছাদের দিকে তাকালে খামখা লজ্জায় জানালা থেকে সরে আসে, ওর উপস্থিতি যে ওরা কেউ টেরও পায়নি, সে কথা আদৌ মাথায় আসে না। একটা নিষিদ্ধ সুখের লোভনীয় আকর্ষণ ওকে চুম্বকের মতো টানে।

ওদের গা ধোয়া শেষ হতে একটা হতাশার অবসাদ বুকে নিয়ে নীচে নেমে আসে। বাইরে অমৃতদের কলরব শোনা যায়—সবাই খেলতে এসেছে। ও গিয়ে ভিড়ে যায় তাদের দলে।

কিন্তু এই সর্বপ্রথম ওর মনে উদয় হয় যে আজকের ছাদে ওঠা, চুরি করে ওদের দেখা, সর্বাঙ্গে পুলকশিহরণ,—এ সবই যেন একান্ত গোপন ব্যাপার, কাউকে বলা চলবে না এসব কথা। কোথায় যেন দোষের দিক আছে এতে। সেদিন ঊষার স্পর্শের উন্মাদনা ওকে বিরূপ করেছিল, তাই আয়েষাকে সব খুলে বলতে পেরেছিল। আজ সেই স্পর্শের জন্য মন উন্মুখ হল কেন, বোঝে না ও, কিন্তু মাকে, আয়েষাকে কিছুতেই বলতে পারবে না আজকের সুখানুভূতির কথা।

আধ ঘণ্টার ওপর পুরোদমে গোল্লাছুট খেলে ঘেমে নেয়ে—মন শান্ত হয়ে যায়। ভুলে

যায় বিকেলের মনশ্চাঞ্চল্য। যথারীতি মা সিরাপজল দেন, ছেলেরা খেয়ে বিদেয় হয়। যাবার সময় অমৃত ওর কাণে বলে যায় যে পুলিস নাকি নিবারণকে নিয়ে গেছে কাজীর বাজারে আগুন লাগার ব্যাপারে। প্রকাশদার ঘরে, হাসপাতালে নাকি পাহারা বসেছে, কেউ ওর কাছে না যায় আসে—দেখবার জন্যে। অমৃত বলে যায় যে কনখল যেন একা হুট করে ওখানে গিয়ে না উপস্থিত হয়।

তা যাবে না কনখল। পুলিশ পাহারার ভয়ে নয়—প্রকাদশদা বারণ করেছেন বলে। বাবার বদনাম হবে বলে। বদনাম হবার যুক্তির দিকটা তলিয়ে দেখতে যায় না, প্রকাশদাই বলেছেন। মার কাছে সব না বলা পর্যন্ত ছটফট করে ওর মন। ফাঁক পেতেই মাকে গিয়ে ধরে। হাসপাতালের কথা, অমৃতর কথা,—সব খুলে বলে।

নিভাননী ঘটনার ভালোমন্দ সম্বন্ধে হুঁ না কিছু বলেন না, শুধু বলেন,—প্রকাশ তো বেশ বুদ্ধিমান ছেলে। ঠিকই বলেছে। বেশী মেলামেশা, এখন না করাই ভালো—দিনকাল ভালো নয়।

—আজকে বাইরের বারান্দায় বিপিনবাবু এসেছেন দেখলাম। জানো মা, ঐ বিপিনবাবু স্পাই। অমৃত বলেছে—উনি নাকি ছেলেদের পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে বকসিস পান।

—তোর অত কথায় থাকার দরকার কিরে কংখ্? ও ভদ্রলোক তো আর তোদের ক্লাসে পড়ান না।

—নাই বা পড়ালেন। এই যে নিবারণকে পুলিশে নিয়ে গেছে, সে তো ওঁর ক্লাসেরই ছাত্র। আর নিবারণ কেমন ভালোছেলে—বরাবর ফার্স্ট সেকেণ্ড হয়। উনি যদি তাকে ধরিয়ে দিয়ে থাকেন?

—তা তুই করবি কি? উনি অন্যায় করলে শাস্তি পাবেনই পাবেন। ভগবান কখনো অন্যায় সহ্য করেন না।

একটা নিষ্ফল আক্রোশের ভাব কনখলের বুকের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়। তাই তো, সে কি করবে? মার কথা ঠিক হোক—ভগবান ওকে শাস্তি দিন। নিবারণকে পুলিশে নেবার মূলে যে উনি, এ বিষয়ে কনখল নিঃসন্দেহ। কেমন চোরের মতো চেহারা লোকটার—ইঁদিক উদিক তাকায়, আর জিভের ডগা বার করে গোঁফে বুলোয়। দেখলেই ঘেন্না হয়। হাতজোড় করেই আছে—কখনও ঢড়া গলায় কথা কয় না। নিভাননী বলেন—ওসব ভাবনাচিন্তা রেখে এখন পড়তে বোস তো কংখ্। রং-পেন্সিল আনা হোলো কি কাজে রে? কি আঁকতে হবে?

—ম্যাপে দিতে হবে মা—তবে সে তো সকালে দেব। রাত্তিরে রং সব বোঝা যায় না।

বলে কনখল ঘরের দিকে যায়। পড়ার টেবিল ওর মোটামুটি গোছগাছ করাই থাকে, তবু দু বেলা পড়তে বসবার আগে আর একবার করে গুছিয়ে নেয়।

ঘর থেকে শুনতে পায় বাইরের বারান্দায় বেশ জোর গলায় কথাবার্তা চলছে। হরেনবাবুর গলাই বেশী জোরদার, বিদ্যাভূষণমশাই সাময়িক ফোড়ন দেন। প্যারীবাবু সাফাই জবাব দিতে ব্যস্ত। আর কারো গলা বড় শোনা যায় না। হৃষীকেশ এদের সান্নিধ্যে কথা কম বলেন। বিপিনবাবু তো আজই এ বাড়ীতে প্রথম এলেন। কনখল বই খুলে বিদ্যাসাগরের 'মা' 'মা' বলে বর্ষার নদী পার হয়ে যাবার গল্পটা পড়ে। ওটা ভালো লাগে বলে পড়ে—কালকের পড়া বলে নয়। হঠাৎ হরেন চাকীর উচ্চগ্রামে আওয়াজ শোনা যায়,—মশায়, প্যারীবাবুর না হয় লোকসানের ব্যাপার, প্রচুর টাকার পাট পুড়ে গেছে, আফশোষ হবারই কথা। কিন্তু আপনার কি মশায়? আপনি করেন স্কুল মাষ্টারি, আর আগুনের সময়ও আপনি

ওখানে ছিলেন না। আপনি কি করে জানলেন কে বা কারা আগুন লাগানোর মূলে?

বিপিনবাবুর হেঁ হেঁ হাসি মেশানো তেলতেলে গলায় জবাব আসে,—মুবারক সওদাগর আর ইসমাইল ব্যাপারীর ঘরে কাপড়ের স্টকটা ছিল লাখ টাকার। সব পুজোর সওদা—খাস ম্যাঞ্চেস্টার। এ আর বুঝলেন না হরেনবাবু, পাটটা হোলো কাকতালীয়, আসল লক্ষ্য ছিল ঐ বিলিতী কাপড়ের গাঁটগুলো। শিউশরণের ঘরে নুনও কম টাকার ছিল না। বাকীটুকু তো দুয়ে দুয়ে চার। গাঁতা সোসাইটি মুখে যত ধর্ম প্রচার করুক, আর কাজে দীন দুঃখীর সেবাই করুক, ওদের আসল কাজ বিলিতী জিনিষের ব্যবহার বন্ধ করা। আগুন লাগল, বিলিতী কাপড় পুড়ল, নুন পুড়ল, এবং আগুন লাগার খানিক আগে গাঁতা সোসাইটির নিবারণকে দেখা গেল বাজারের দিক থেকে আসতে। এর পরও কি আর বলে দিতে হবে, কারা আগুন লাগিয়েছে?

—কে দেখেছে নিবারণকে? কখন দেখেছে?

জবাব দেন প্যারীবাবু—আমি, মানে আমার গুদামের কয়ালীসর্দার রমজান দেখেছে। ঠিক আগেই যে, তা নয়। আগুন লেগেছে, তখন নিবারণ দৌড়ে বাজারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে, এই দেখেছে।

বিদ্যাভূষণ মশায় তামাক টানতে টানতে বলেন,—আমার মনে আছে বটে। নিবারণ রাত গোটা বারোর সময় আমার বাড়ীর পেছনের গলি দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে প্রকাশদের বাড়ীর দিকে গেল—সে বলতে বলতে যাচ্ছিল,—অমূল্য, তোরা উঠে বাজারে যা, আগুন লেগেছে, আমি প্রকাশদাকে খবর দিতে যাচ্ছি—বলতে বলতে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল। আমার তো মনে হোলো সাহায্যের জন্য খবর দিতেই গেল।

—অত রাত্রে নিবারণ প্রথম জানল কি করে আগুনের খবর?

—আরে তাও জানো না? ও যে রাত পাহারা থাকে ব্রাহ্মমন্দিরে। মন্দিরটা বাজারের পশ্চিমে তো, আর বেশ একটু উঁচু জায়গায়। ওখান থেকে পরিষ্কার প্যারীবাবুদের গুদাম আর বাজারের এক অংশ দেখা যায়। ডাক শুনে অমূল্য এক লাফে বেরিয়ে গেল। আমি ডাকলাম পেছন থেকে, শুনতেও পেল না। খানিক পরেই, সেই যে ফনোগ্রাফের চোঙ-এর মতো একটা জিনিষ—তার মধ্যে থেকে প্রকাশের গলার আওয়াজ পেলাম—কোনো বাড়ীর ছাদে উঠে হাঁক ছাড়ছে—'গুরুজী কি জয়—স্বামীজীকি জয়—সেবাদল—কাজীর বাজার—আগুন—'। তার একটু বাদে খড়মটড়ম খুজে রাস্তায় বেরিয়ে দেখি দলে দলে ওদের ছেলেরা ছুটছে বাজারের দিকে। কারও হাতে বালতী, কারও হাতে শাবল, দা, এইসব। অমৃত, প্রকাশ, ওদেরও দেখলাম।

হৃষীকেশ বলেন—হ্যাঁ, নেভানোর ব্যাপারে ওরাই অগ্রণী—যদিও সরকারী সাহায্য পোঁছেচে পরে। আরে, আমারও ত ঘুম ভাঙল ঐ চোঙের আওয়াজে।

হরেনবাবু বলেন,—তা হলে ত ওরা সাহায্যের কাজেই এগিয়ে এসেছে মনে হয়। নিজেরাই আগুন ধরিয়ে, নিজেরাই প্রাণ তুচ্ছ করে নেভাতে আসবে, লোক বাঁচাবে—এটা কেমন কেমন ঠেকছে না? আগুন লাগাটা নিছক অসাবধানতাও হতে পারে। শুনেছি নিবারণ স্টেটমেণ্ট দিয়েছে পুলিশে। সে বলেছে, মন্দিরের বারান্দায় বসে সে অনেক রাত পর্যন্ত পড়ছিল। আগুন প্রথম দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে প্যারীবাবুর গুদামে—সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে বাজারের মধ্যে।

প্যারীবাবু লাফিয়ে ওঠেন। হুঙ্কার ছেড়ে বলেন,—বলেছে? এই কথা বলেছে?

মিথ্যেবাদী স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার। ওর নামে, ওদের দলের নামে আমি মামলা করব। উচ্ছেদ করব ওদের শিলেট থেকে।

প্যারীবাবুর হঠাৎ এরকম আক্রোশ-হুহুঙ্কারের কারণ বোঝা যায় না। বিয়ের ব্যাপারে বাধা, সে তো সাঁতেনাথ পণ্ডিতের মধ্যস্থতায় মিটেই গেছে। আসরের সবাই হকচকিয়ে যান। হরেনবাবু শান্তিদূতের মতো বলেন,—আরে মশাই, আপনি চটেন কেন? হতে পারে কুলি কয়ালদের কেউ তামাক খেয়ে কল্কে উপুড় করেছিল—টিকে ছিটকে শুকনো পাটের গাঁটে পড়েছে—

—পাটের গাঁটে? পাট কোথায় আমার গুদামে? গুদাম ত—

বলতে বলতে সামলে যান প্যারীবাবু। কি সর্বনাশ! কি বলতে কি বলে ফেলছিলেন এখ্খুনি। বলতে যাচ্ছিলেন 'গুদাম তো খালি', কিন্তু সামলে নিয়ে শেষ করলেন,—গুদাম ত ভিজে পাটে ভর্তি ছিল। নৌকোর পাট। গাঁট বাঁধা আদপেই হয়নি। তাতে আগুন লাগার কথাই ওঠে না।

শেষ দিকের কথার সুর অনেক নরম লাগল শুনতে। বিদ্যাভূষণ কিছু না বুঝলেও হৃষীকেশ ও হরেনবাবু চোখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। হৃষীকেশ প্যারীবাবুর স্ত্রীর জবানী নিভাননী মারফত যা শুনেছেন, তাই ভেবে, আর হরেনবাবু দু চার নৌকো ভিজে পাটের দরুন পঞ্চাশ হাজার টাকার লোকসানের আফশোষের কথা ভেবে। বিশেষ করে গাঁট ভর্তি গুদামের পুরো ইনসিওরেন্স যেখানে ত্রিশ হাজার টাকার।

যাতে প্রসঙ্গ অপ্রীতিকর না হয়ে ওঠে, সেই ভেবে হৃষীকেশ বলেন,—ও নিয়ে আমাদের আর মাথা ঘামানোর দরকার কি হরেনবাবু? পুলিশ ব্যাপারটা হাতে নিয়েছে, তদারক করবে, হয়তো মামলাও উঠবে। হতে পারে আমার এজলাসেই এল কেসটা। তা হোলে, আমার এখানে এসব আলোচনা না হওয়াই বাঞ্ছনীয় নয় কি?

এ কথার যুক্তি সকলেই অনুমোদন করলেন মনে হোলো। হরেনবাবু পাকা উকিল, তখ্খুনি কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বলেন,—আরে বাগচী সাহেব, বুঝলেন না, প্যারীবাবু যে বুড়িয়ে যাননি, এখনো তরুণ আছেন, সেইটে পরখ হয়ে গেল। দেখলেন না, কেমন দপ করে ছোকরাদের মতো জ্বলে উঠলেন? হ্যাঁ, যৌবন ধরে রেখেছেন বটে। বুড়ো হাবড়া হোলে মাথা নেড়ে, ধীর গলায়, বিচার বিবেচনা করে কথা কইতেন। রক্ত গরম না থাকলে কি মেজাজ গরম করতে পারে কেউ?

উল্লেখটা তৃতীয়পক্ষে বিয়ের, কিন্তু রসিকতা খুব জমে না। প্যারীবাবু সাধারণত স্বল্পভাষী, আজ আলগামুখ হয়ে মনে মনে নাস্তানাবুদ হচ্ছিলেন। মিনমিনে গলায় বলেন, —না, মানে আমার গুদাম থেকে আগুন প্রথম লাগাটা সম্ভব নয়, সেইটে বলতে চাইছিলুম আর কি। আগুন লেগেছে অন্যত্র, যে বা যারাই লাগাক। তবে আমার বহু টাকার মাল গেছে, এইটে জেনে রাখুন সবাই।

সাক্ষী তৈরীর ফন্দি দেখে হরেনবাবু মনে মনে চটেন, কিন্তু উকিল মানুষ, হাকিমের বাসায় বসে চটাচটি করতে চান না—তবে চিপটেন কাটতেও ছাড়েন না,—পঞ্চাশ হাজার টাকার ভিজে খোলা পাট আপনার গুদামে আঁটে, একথা মামলা উঠলে কোটেই প্রমাণ করবেন প্যারীবাবু. আমরা আপনার গুদাম কত বড় তাও জানিনে, পাটের দরও জানিনে। সাক্ষী সাবুদ হবার মতো জ্ঞান এখানে কারও নেই আশা করি। তবে জানিনে, বিপিনবাবু ত সর্বজ্ঞ মনে হচ্ছে—উনি হয়ত—

—আঃ হরেনবাবু, ওঁকে আবার কেন?

—না মানে, নিজের ঘরে শুয়ে উনি হাতগুণে নিবারণটা আগুন ধরিয়েছে এত্তেলা দিয়ে এলেন পুলিশে কিনা, তাই হয়ত পাটের বাজার বিষয়েও ওঁর দৈবাধিকার থাকতে পারে।

সাপের মতো ক্রুর চোখে তাকান বিপিনবাবু হরেনের দিকে। পুরু ঠোঁটে বাঁকা হাসি কিলবিল করে ওঠে কে'চোর গতিভঙ্গীতে। কিন্তু কথা বলেন ঠাণ্ডা শান্ত গলায়,—কি যে বলেন চাকী মশাই, আমরা আর কতটুকু জানি। প্যারীবাবুই আমায় খুঁজে বের করে বললেন সব। স্কুলের ছেলেদের কিছু কিছু খোঁজ-খবর আমাদের রাখতে হয় বৈ কি। তাই যতটুকু জানি বলবার জন্য প্যারীবাবু পরশু নিয়ে গেলেন ধরে পুলিশ সাহেবের ডেরায়। ইস্কুলে চাকরি করি মশাই, সরকারের কাছে যা জানি কবুল না করলে অপরাধ হবে যে!

হৃষীকেশ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেন বোঝা যায়। একটু অধৈর্যের সাথেই বলেন, —থাক না এ প্রসঙ্গ। অন্য কিছু আলাপচারি চলুক না! আপনারা আমার রুজি মারবেন দেখছি!

বলেন বটে ঠাট্টার সুরে, কিন্তু হুকুমের আমেজ পাওয়া যায় বলার ধরনে। থেমে যায় ওসব আলোচনা।

তারপর আর বেশীক্ষণ জমে না। যে যার মতো উঠতে আরম্ভ করেন একে একে। প্যারীবাবু সব শেষে ওঠেন।

হৃষীকেশ অতি ভদ্র। অভ্যাগতরা উঠলে সাধারণত গেট পর্যন্ত নিজে সঙ্গে যান। আজ তা করেন না। প্যারীবাবুর যাবার প্রায় সাথে সাথে চেঁচিয়ে ওঠেন,—রহমৎ, ওঠাও চেয়ার টেবিল।

আপিস কামরায় বাতি দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। সেইখানে গিয়ে বসেন বাগচী। অন্দরে তখনো প্রতিবেশিনী মহিলাদের কেউ কেউ আছেন—নিভাননীর সাথে কথা বলার জন্যে ছটফট করেন বাবা—বুঝতে পারে কনখল।

বড়দের কথাবার্তা যথাযথ কনখল বোঝে না। বোঝবার চেষ্টাও করে না। এটুকু খালি বোঝে, আগুন লাগানোর ব্যাপারে নিবারণকে জড়ানো, আর নিবারণকে মানেই দলপতি প্রকাশকে জড়ানো, এতে প্যারীবাবুর স্বার্থ আছে, আর তাতে সাহায্য করছে বিপিন কার্লাইল। ঐ স্প্লাইটা। দাঁত কিড়মিড় করে কনখল।

রাতে খাবার টেবলে মা বাবার কথার আঁচে বোঝে বাবা অসম্ভব চটে আছেন। তাঁর কাছে বিচারের জন্যে এলে প্যারীবাবুর সাজা হবে শোনে ও; বাজারে আগুন লাগানোর জন্যে আর মিথ্যে টাকার দাবী করে বিলিতী কোম্পানীকে ঠকানোর জন্যে। বিপিন সম্বন্ধে বাবা কোনো উল্লেখ করেন না দেখে ক্ষুণ্ণ হয়। প্যারীবাবুর কিছু হোক না হোক, ওটার শাস্তি হওয়া উচিত। মা তো বলেইছেন, ভগবান ওদের শাস্তি দেন। আচ্ছা, রইল তবে ওর জন্যে তোলা কঠিন সাজা। দেরী হয়ত হবে, কিন্তু ভগবান ভোলেন না। দেবেনই শাস্তি ঠিক সময়ে।

প্যারীবাবু ঠক, প্যারীবাবু আগুনবাজ, এসব শুনে দুঃখিত হয় না একটুও। ঐ সব অপরাধে প্যারীবাবু শাস্তি পেলে খুব খুশী হত দুদিন আগে; কিন্তু ঐ অপরাধীরই স্ত্রী উষা, এই কথা মনে হতে বুকটা ধড়ফড় করে আজ।

[ক্রমশঃ]

নৈরাজ্যবাদ : বিপ্লবযুগ

অতীন্দ্রনাথ বসু

৮। ইয়োরোপ : মাইকেল বাকুনিন (১৮১৪-১৮৭৬)

ইতিহাস তার রঙ্গমঞ্চে কখন কখন এমন এক একটি লোককে এনে হাজির করে যাঁরা যেন এক এক ঝলক বিদ্যুৎ, যাঁদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত দীপ্ত শিখার মত জ্বলন্ত কিন্তু মৃত্যুর যবনিকা ভেদ করে যাঁদের খুঁজে পাওয়া যায় না। মাইকেল বাকুনিন এই দলের মানুষ। তিনি ১৮৪৮-১৮৭৮ কালের প্রলয়-নাটোর নটরাজ। তিরিশ বছর তিনি ইয়োরোপের আকাশ বাতাস তোলপাড় করে বেড়িয়েছেন। তাঁর কল্পনা ও কর্ম ছিল উল্কার মত, বিদ্রোহীর আশার বাতি আর রাষ্ট্রশক্তির বিভীষিকা। কিন্তু এ আগুন উল্কার মতই অকস্মাৎ নিভে গেল। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাকুনিনের অগ্নিগর্ভ চিন্তা অন্ধকারে ডুবে গেল।

নিয়তির এক নিষ্ঠুর অভিশাপে বাকুনিনের ব্যক্তিত্ব আচ্ছন্ন। ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্‌ডি, কসাথ, প্রুদঁ ও মার্ক্স ছিলেন তাঁর সমসাময়িক। এঁরা বিপ্লবী ভাবনা ও সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয়, এঁরা পেয়েছেন বীরের বরমাল্য লোকোত্তর খ্যাতি। বাকুনিন এ সম্মানে বঞ্চিত, যদিও দুঃসাহসিক চিন্তায় ও কর্মে এবং আদর্শের জন্যে আত্মবলিদানে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

বাকুনিন লিখেছেন প্রচুর তবু তাঁর চিন্তার থই পাওয়া যায় না। অজস্র ভাবনা মাথায় উঁজিয়ে উঠত, কাজের তাড়ায় সেগুলিকে গুছিয়ে তোলা হয়ে উঠত না, অসমাপ্ত লেখার মধ্যে থেকে যেত অসঙ্গতি। লেখার চেয়েও তাঁর বক্তৃতা ছিল গরম। কিন্তু তাঁর লিখিত অথবা ভাষিত কথা থেকে তাঁর দর্শনকে বোঝা সম্ভব নয়। তাঁর দর্শনের ভাষ্য তাঁর ব্যক্তিত্ব। বিরাট বলিষ্ঠ দেহ, প্রকাণ্ড মাথা ঘিরে ঘন অসম্বৃত কেশরাশি, কণ্ঠে বজ্রের নির্ঘোষ—মানুষটি যেন মূর্তিমান বিপ্লব। এক বন্ধে দিনের পর দিন দিবারাত্র কেটে যাচ্ছে, কখন হয়ত খোলা আকাশের নীচে রাত্রিবাস, যেদিকে ঝড় সেদিকে তৎক্ষণাৎ তাঁর গতি। যারা সংস্পর্শে আসত তারা এই দুর্দম আত্মভোলা প্রকৃতির প্রভাব এড়াতে পারত না। যারা দূরে থাকত তারা তাঁকে ঘিরে উপকথার ঊর্ণজাল বয়ন করত।

১৮১৪ সালের তিরিশে মে রুশের ভের প্রদেশে প্রেমুখিনো নামক পল্লীগ্রামে এক বর্ধিষ্ণু জমিদারের ঘরে বাকুনিনের জন্ম হয়। পনের বছর বয়সে বাবা তাঁকে সেণ্ট পিটার্স-বার্গের গোলন্দাজ স্কুলে ভর্তি করে দেন। পাঁচ বছর শিক্ষানবীসির পর তাঁকে পোল্যাণ্ডের একটি ফৌজের অফিসার করে পাঠানো হল। শিবির জীবনের গতানুগতা ও নিয়মশৃঙ্খলা বেশীদিন তাঁর মেজাজে পোষাল না। একুশ বছর বয়সে কাজে ইস্তফা দিয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে তিনি মস্কো চলে এলেন দর্শন পড়তে।

রুশের স্বৈরাচারী জার প্রথম নিকলাসের আমলে সকল প্রকার উদারনৈতিক চিন্তা ও কার্য ছিল নিষিদ্ধ। শুধু নিরামিষ দর্শন চর্চায় কোনো বাধা ছিল না। এই সুযোগে মস্কোর বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি পাঠচক্র জমে উঠেছে,—একটি আলেকজাণ্ডার হারজেনকে ঘিরে ফরাসী সমাজবাদ নিয়ে, আর একটি নিকলাস স্ট্যাংকেভিচের নেতৃত্বে জার্মান ভাববাদকে অবলম্বন করে। বাকুনিন দ্বিতীয় দলে ভিড়ে পড়লেন। শেলিং ও কাণ্ট পেরিয়ে তিনি

ফিক্‌টে এবং হেগেলে এসে আবদ্ধ হলেন। ফিক্‌টে থেকে তিনি শিখলেন যে বিশ্বনিয়মের সর্বোত্তম প্রকাশ মুক্তি, হেগেল থেকে জানলেন ঐতিহাসিক বিকাশ দ্বান্দ্বিক নিয়মের বশ। পাঁচ বছর মস্কোতে কাটিয়ে তিনি দর্শনের উৎসের সন্ধানে এলেন জার্মানী (১৮৪০)। এখানে প্রগতিশীল বিদগ্ধমহলে তখন বাম হেগেলপন্থী লাডভিগ ফয়েরব্যাকের আসর পড়েছে। তাঁর প্রভাব পড়ল বাকুনিনের ওপর যেমন পড়েছিল মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্‌-এর উপরে। এই দলের অন্যতম প্রচারক ছিলেন আর্নল্‌ড্‌ রুগে। বাকুনিন ড্রেসডেনে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। ১৮৪২ সালে রুগের পত্রিকা "ডয়েশ জারবুশের"-এ বেরুল বাকুনিনের প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ 'ডাই রিএকশ্যান ইন ডয়েশ্‌ল্যাণ্ড'—জার্মানীতে প্রতিক্রিয়াশীল শাসন। চিৎশক্তির অধ্যাত্মতত্ত্ব ছেড়ে তিনি বিপ্লবের দ্বন্দ্ববাদে নেমে পড়লেন।

লেখাটি বেরিয়েছিল জুল্‌স্‌ এলিসার্ড এই ছদ্মনামে, কিন্তু লেখকের পরিচয় গোপন রইল না। লেখা ও লেখকের ওপর স্যাকসন সরকারের নজর পড়ল। বাকুনিন পালিয়ে গেলেন সুইজারল্যাণ্ড। এখানে তাঁর আলাপ হল উইলহেল্‌ম্‌ উইট্‌লিং নামে একজন আধা জার্মান নৈরাজ্যবাদী ভবঘুরের সঙ্গে। তাঁর বই "মিততা ও মুক্তির রক্ষাকবচ" পড়ে বাকুনিন মুগ্ধ হলেন, এ থেকে এই কথাটি তুলে বন্ধু রুগেকে পাঠালেন—

> শ্রেষ্ঠ সমাজব্যবস্থায় সরকার নেই আছে লোককর্ম, আইন নেই আছে দায়িত্ব, শাস্তি নেই আছে শোধনের উপায়।[১]

রাষ্ট্র ও ধর্মের বিরুদ্ধাচরণের অপরাধে উইট্‌লিং-এর সাজা হল। বাকুনিনেরও ডাক পড়ল তাঁর পিতৃভূমি থেকে। বাকুনিন ফিরে যেতে রাজী হলেন না। সুইস সরকারের হুকুমে বিতাড়িত হয়ে তিনি এলেন পারী (১৮৪৩)। এখানে তাঁর পরিচয় হল প্রুদঁ ও মার্ক্স-এর সঙ্গে—এবং এঁদের দুজনের ভাবনার ছাপ গভীর হয়ে এঁকে বসল তাঁর মনের ওপর।

এখানে এক সভায় পোল বিপ্লবের পক্ষে ওকালতি করার ফলে রুশ সরকার থেকে ফরাসী সরকারের ওপর চাপ এল। বাকুনিনকে আবার তাড়া খেয়ে পারী ছাড়তে হল। তিনি পালিয়ে এলেন ব্রাসেল্‌স্‌, বেলজিয়ামের রাজধানী (১৮৪৭)। অল্পকাল পরে পারীর হাওয়া বদলাল, এল ১৮৪৮ ফেব্রুয়ারীর বিপ্লব। দুর্যোগ-পাগল বাকুনিন চলে এলেন এখানে। পারীর ঝড় যেমন ছুটল পূর্বদিকে, সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন বাকুনিন। প্রাগে অনুষ্ঠিত শ্লাভ কংগ্রেসকে মাতিয়ে তুলে তিনি প্রাগের বিদ্রোহীদের সঙ্গে রাজপথে নামলেন। "শ্লাভদের প্রতি আবেদন" (১৮৪৮) পুস্তিকায় তিনি শ্লাভ চাষীদের ডাক দিলেন বুর্জোয়াদের ওপর আশা ভরসা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের জোরে রুশ অস্টিয়া প্রাশিয়া এই তিন দুরন্ত রাজশক্তির বিরুদ্ধে মোহড়া গড়তে। পরের বছর ড্রেসডেনের জনবিদ্রোহে তিনি পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। পাঁচদিন সংগ্রামের পর বিদ্রোহীরা পরাস্ত হল। স্যাক্সুন সরকার বাকুনিনকে গ্রেপ্তার করে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। ইতোমধ্যে অস্ট্রিয় সরকার তাঁকে দাবি করলেন প্রাগ বিদ্রোহের শাস্তি দেবার জন্য। তাঁকে হাতে পেয়ে এঁরা আবার অপরাধীকে সমর্পণ করলেন রুশ কর্তৃপক্ষের দাবিতে তাঁদের হাতে (১৮৫১)।

রুশে কয়েদীদের বিভীষিকা ছিল কুখ্যাত পীটার এণ্ড পল দুর্গ। এখানে এসে অন্ধকার নিষ্ফল ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বাকুনিনের মন ভেঙে পড়ল। তিনি লিখলেন

---

[১] ই. এইচ. কার : মাইকেল বাকুনিন, লণ্ডন, ১৯৩৭, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

জারের প্রতি স্বীকারোক্তি নামে এক সুদীর্ঘ পত্র, জারকে জাতির নায়ক হয়ে রুশ বিপ্লবের নেতৃত্ব নেবার জন্যে আহ্বান জানালেন, সবিনয়ে নিবেদন করলেন—'যেমন করে উচ্ছৃঙ্খল, পরিত্যক্ত, বিপথগামী পুত্র অপমানিত রুগ্ন পিতার সামনে দাঁড়ায়', তেমন করে তিনিও দাঁড়িয়েছেন জারের সামনে; আর পত্রের পাদনামায় লিখলেন 'অনুতাপী পাপী মাইকেল বাকুনিন।'

আসলে এ নরম সুরে নিছক অনুতাপের নয়। এর কিছুটা ছিল ব্যাজস্তুতি, জারের মন ভিজিয়ে মুক্তি পাবার আশায় লেখা। জার খুসী হলেন কিন্তু ভিজলেন না। নিকলাসের মৃত্যুর পর জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার অনুতপ্ত বেয়াড়া ছেলেকে সাইবেরিয়া পাঠিয়ে দিলেন। এখানে চার বৎসর কাটল এবং তাঁর বিয়ে হল। ১৮৬১ সালে একটি আমেরিকান জাহাজে চেপে তিনি পালিয়ে গেলেন জাপান, জাপান থেকে আমেরিকা, আমেরিকা থেকে লণ্ডন।

তখন লণ্ডনে আলেকজাণ্ডার হারজেন সমাজবাদী প্রচারে ব্যস্ত। বাকুনিন তাঁর সঙ্গে জুটলেন। ১৮৬৩ সালে পোল বিদ্রোহের সময়ে তিনি একদল স্বেচ্ছাবাহিনী সংগ্রহ করে সাগর পাড়ি দিলেন। জায়গায় পৌঁছবার আগে তাঁর বাহিনী ও পোল বিদ্রোহ খতম হয়ে গেল। একটির পর একটি ধাক্কা খেয়ে বাকুনিন তাঁর চিন্তাভাবনাগুলিকে আবার যাচাই করতে বসলেন।

১৮৪৮ সালে ইয়োরোপের দেশে দেশে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তার প্রাণ ছিল জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবি। এই মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে বাকুনিন বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ব্যর্থতার আঘাতে তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল, তিনি দেখলেন এ মন্ত্র মুক্তির মন্ত্র নয়। জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রাধিকারের দাবি ছেড়ে দিয়ে তিনি এলেন নৈরাজ্যবাদে। "স্লাভদের প্রতি আবেদন" পুস্তিকায় তিনি সমাজবিপ্লবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। এবার "বিপ্লবের বিতর্কিকা" পুস্তিকায় নৈরাজ্যবাদের আদর্শকে রূপ দিলেন (১৮৬৬)। ১৮৬৭ সালে 'লীগ অব পীস এণ্ড ফ্রীডম' নামক সংঘ গঠিত হল, জেনেভায় তার প্রথম বৈঠক বসল আর বাকুনিন তার ইস্তাহার রচনা করলেন। এই ইস্তাহার "ফেডারেলিজম্, সোস্যালিজম্ এণ্ড এণ্টিথিওলজিজম্" নামে প্রকাশিত হল (১৮৬৮)। লীগে ছিল বুর্জোয়া মতের প্রাধান্য। তাদের বরদাস্ত করতে না পেরে তিনি বন্ধুদের নিয়ে বেরিয়ে এসে গড়লেন 'ইণ্টারন্যাশন্যাল এলায়েন্স অব সোস্যাল ডিমক্রাসী' নামে নতুন এক প্রতিষ্ঠান। ১৮৬৯ সালে এলায়েন্সকে নিয়ে তিনি মার্ক্স্-এর আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনে ঢুকলেন।

পর বৎসর জুলাই মাসে ফ্রান্স ও প্রাশিয়ায় লড়াই বাধল। বাকুনিন 'একজন ফরাসীর প্রতি পত্র' মারফত ফ্রান্সের শ্রমিক ও কৃষকদের ডাক দিলেন একযোগে তৃতীয় নেপোলিয়ন ও জার্মান হানাদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমাজবিপ্লব সাধন করবার জন্য। তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি লোকার্নো থেকে ছুটে এলেন লিয়ঁ[১] নগরে, সেখানে এক রাষ্ট্র-বিরোধী গণঅভ্যুত্থান পরিচালনা করলেন। ফ্রান্সের নূতন প্রজাতান্ত্রিক সরকারের হাতে এই অভ্যুত্থান বিধ্বস্ত হল। বাকুনিন অস্ত্র ছেড়ে কলম ধরলেন, লিখলেন "নাউটো-জার্মান এম্পায়ার এণ্ড দি সোস্যাল রিভলুশন"[২] (১৮৭২) নামে এক বিরাট গ্রন্থ। রাজনীতি থেকে নক্ষত্রতত্ত্ব পর্যন্ত কোন বস্তু এতে বাদ নেই। অবশ্য এ বইও শেষ হল না। এর

[১] নাউট অর্থ জানোয়ারের নাসিকা। রুশ সাম্রাজ্যপ্রী জানোয়ার ও জার্মান সাম্রাজ্য উভয়ের মিতা ও তার বিরুদ্ধে সমাজ বিপ্লব—নামের এই তাৎপর্য।

একখণ্ড পরে "ঈশ্বর ও রাষ্ট্র" নামে প্রকাশিত হয়।

পারীর শ্রমিক বিদ্রোহ ও পারী কমিউনের ক্ষণিক সাফল্য (মার্চ—মে ১৮৭১) তাঁকে আবার চঞ্চল করে তুলল। ম্যাট্‌সিনি কমিউনকে নিরীশ্বরবাদী বলে তিরস্কার করলে বাকুনিন তার তীব্র প্রতিবাদ করে ম্যাটসিনির ধর্মনিষ্ঠ জাতীয়তাবাদকে পাল্টা আক্রমণ করলেন। পরের বছর মার্ক্সের সঙ্গে তাঁর বিবাদ ঘনিয়ে উঠল। আন্তর্জাতিক থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি "রাষ্ট্রবাদ ও নৈরাজ্যবাদ" নামক পুস্তক (১৮৭২) রচনা করলেন।

ইতোমধ্যে তাঁর দেহ ভেঙে পড়েছিল। আদর্শের নেশায় পাগল হয়ে তিনি নিজেকে ক্ষয় করে ফেলেছিলেন। ধনীর দুলাল ঘর ছেড়ে আসা অবধি আকাশবৃত্তি নিয়েছিলেন, দারিদ্র্য ও ক্লেশ হয়েছিল জীবনসঙ্গী। এক কঠিন ব্যাধির যন্ত্রণায় তাঁর অফুরন্ত জৈব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। ১৮৭৩ সালে সৈনিক অস্ত্রত্যাগ করে অবসর নিলেন। ১৮৭৪ সালের মে মাসে ইটালীতে দুর্যোগ দেখা দেবার পর আবার তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন, ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে বলোনায় এক বিদ্রোহ পরিচালনা করলেন। বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কর্মশক্তির অবসান হল।

অক্ষম অচল অনির্বাণ এই বিপ্লবীর জীবনসায়াহ্নের দিকে তাকালে চোখের জল রাখা যায় না। পঙ্গু নরশার্দুলের দিকে ভেড়ো ফিরে তাকায় না। একনিষ্ঠ বিপ্লব সাধনা পরিবারের শান্তিনীড় ভেঙে দিয়েছে। প্রিয়তমা এণ্টনিয়া ঘর ও সন্তান কামনায় ব্যর্থ হয়ে তাঁরই এক ভাগ্যবান সহকর্মীকে বরণ করেছেন। বেপরোয়া ধার নেওয়া ও শোধ না দেবার অভ্যাস বন্ধুদের দূরে ঠেলে দিয়েছে। স্ত্রীর উপপতি তাঁর অন্নদাতা আশ্রয়দাতা। অবশেষে ১৮৭৬ সালের পয়লা জুলাই বার্নের হাসপাতালে নির্বাসিত দেশহীন গৃহহীন নিঃস্ব অবস্থায় তাঁর প্রাণবিয়োগ হল। যাঁকে দেখে একদিন সারা ইয়োরোপের মানুষ মেতে উঠত তাঁর শবযাত্রায় চল্লিশজন লোকও উপস্থিত হয়নি।

মস্কোতে দর্শন চর্চার সময়ে বাকুনিন প্রথমে ফিক্‌টের প্রতি আকৃষ্ট হন। ঈশ্বর সর্বমানবব্যাপী, মানুষের মহিমায় ঈশ্বরের মহিমা, এর চেয়ে মধুর কথা আর কি আছে? কিছুকাল পরে এই রহস্যালোকে আঘাত করল হেগেলের পরমাদ্বৈতবাদ ও দ্বন্দ্ববাদ। ১৮৩৭ সালে তাঁর লেখা—

> আমার ব্যক্তি-আত্মা এখন আর নিজের জন্য কিছুই চায় না; এখন হইতে আমার জীবন পরমসত্তায় লীন হইয়া গিয়াছে। জীবন ভয়াল সংঘর্ষে ভরপুর....., তথাপি ইহা সুন্দর, ইহার মর্ম অলৌকিক পবিত্র—ইহা চিরন্তন ঐশ্বরিক সত্তায় বিধৃত।[৩]

দ্বন্দ্বপর পরমসত্তায় ডুবে গেলেন বাকুনিন। কিন্তু রক্তে যার সর্বনাশের নেশা এ ভাবালুতায় তিনি কতদিন মেতে থাকবেন? খট্‌কা লাগল হেগেলের বচনে—যাহা বাস্তব তাহাই প্রজ্ঞান যাহা প্রজ্ঞান তাহাই বাস্তব। পরম প্রজ্ঞানে আত্মহারা হলে আর বিদ্রোহের অবকাশ কোথায়? প্রজ্ঞান যদি হয় সকল বস্তুর আধার তাহলে বাস্তবকে নির্বিচারে স্বীকার করতে হয়। বামপন্থী হেগেলবাদীদের সংসর্গে আসবার পর তাঁর সংশয় ঘনীভূত হল,

[৩] ভি. ভি. জেকভস্কী : এ হিস্ট্রী অব রাশিয়ান ফিলজফি। অনুবাদ—জর্জ এল. কিন্‌সে, লণ্ডন, ১৯৫৩। খণ্ড ১, ২৪৮ পৃষ্ঠা।

পরমাদ্বৈতকে ছেড়ে তিনি ধরলেন দ্বন্দ্ববাদের নাশকতা। ফয়েরব্যাকের প্রতিধ্বনি করে বাকুনিন বললেন—'আমি ঈশ্বরকে খুঁজি মানুষে, মানুষের মুক্তিতে এবং বর্তমানে তাঁর সন্ধান করি বিপ্লবে।'

তখন তাঁর চিত্ত ধ্বংসের নেশায় মশগুল—ক্ষেপা মন দর্শনের বাঁধন মানতে চায় না। কর্মপিপাসুর কোন জিজ্ঞাসা নেই আছে শুধু জিগীষা। পিছনে পড়ে রইল ফয়েরব্যাক। বাকুনিন লিখলেন—

> দূর হোক ধর্ম ও দর্শনের তত্ত্ব। সত্য তত্ত্বকথায় নাই, আছে কর্মে জীবনে...; বসিয়া বসিয়া ভাবিলে সত্য আবিষ্কার হয় না, বাঁচিতে হয়, জীবন চিন্তার অপেক্ষা ব্যাপক; সত্যের রহস্য লুকাইয়া আছে জীবনে।[৪]

বিপ্লব সৃজনচাঞ্চল্যের বিস্ফোরণ। বস্তু দ্বান্দ্বিক নিয়মে চিরচঞ্চল। যা অচল তা অবাস্তব, সুতরাং প্রজ্ঞানবিরোধী। সুতরাং বিপ্লব বাস্তব প্রজ্ঞানসম্মত সত্য। গোঁড়া হেগেলবাদীরা বাস্তব ও প্রজ্ঞান, প্রত্যক্ষ ও অন্তরীক্ষ উভয়ের মাঝে দুলতে দুলতে যেন ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকে চলেছে।

বিপ্লব অবিশ্রাম চিরন্তন। অবিরাম ও সর্বান্তক বিশ্ববিবর্তন, এই পরম সত্য—এখানে কোন শাস্ত্র কোন বিধানের জায়গা নেই। এই সর্বনাশের সত্য থেকে আসবে নীতির বিচার, ভালমন্দর মাপকাঠি।

তিনজন ব্যক্তির প্রভাব বাকুনিনের ওপর কায়েম হয়েছিল,—ফয়েরব্যাক, মার্ক্স্ ও প্রুদঁ। এঁদের আওতায় এসে তিনি হেগেলের ঐশ্বরিক ভাববাদ থেকে মুক্ত হয়ে পুরোদস্তুর নাস্তিক ও জড়বাদী হলেন। ফয়েরব্যাক তাঁর "খ্রীষ্টানত্বের সারমর্মে" (১৮৪১) ধর্মের মুখোস খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মধ্য ইয়োরোপে দার্শনিক চেতনার মোড় ঘুরল—তাঁর সঙ্গে সুর মেলালেন বাম হেগেলবাদীরা ও প্রুদঁ। এঁদের ছাড়িয়ে গেলেন বাকুনিন।

> জড়বাদ পশুত্ব হইতে শুরু করে মানবত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। ভাববাদ দেবত্ব হইতে শুরু করে দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার এবং জনতাকে চিরতরে পশুত্বে আবদ্ধ রাখিবার জন্য ("নাউটো-জার্মান সাম্রাজ্য ও সমাজবিপ্লব")।[৫]

"ঈশ্বর ও রাষ্ট্র" পুস্তিকাটি ভরে তিনি তীব্র শ্লেষের বিষ ঢেলেছেন। ওল্ড টেস্টামেণ্টের আদিম পাপ নিয়ে এর সূচনা। আত্মম্ভরি একাকী জিহোভার খেয়াল হল কিছু দাস নিয়ে বসবাস করবার,—সৃষ্টি করলেন মানবযুগল। সবই দিলেন তাদের, নিষেধ রইল কেবল জ্ঞানবৃক্ষের ফলের ওপর, যাতে তাদের পশুত্ব না ঘোচে। এমন সময়ে এল শয়তান 'চিরন্তন বিদ্রোহী এবং প্রথম স্বাধীনচিন্তক'। তার প্ররোচনায় মানবমানবী ঈশ্বরকে অমান্য করে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেল। প্রভুত্বগর্বী ঈশ্বর রাগে অন্ধ হয়ে শুধু অপরাধীযুগলকে নয় তাদের সকল উত্তরপুরুষকে অধঃপাতে ফেললেন। কিন্তু ক্রোধের প্রতিমূর্তি যিনি তিনি তো প্রেমেরও অবতার! তাই হতভাগ্য পাপীদের উদ্ধার করবার জন্যে নিজের পুত্রকে প্রায়শ্চিত্ত করতে পাঠালেন। বেচারা ক্রুশবিদ্ধ হয়েও কি পাপীদের ত্রাণ করতে পারল? তাদের জন্যে মজুত আছে অনন্ত নরক।

আসলে এই যীশুটি একটি অকর্মা অপোগণ্ড। পাইলেটের উচিত ছিল তাকে ক্রুশে

[৪] ঐ, ২৫৫ পৃষ্ঠা।

[৫] ম্যাক্সিমফ: দি পলিটিক্যাল ফিলজফি অব বাকুনিন, ইউ. এস. এ. ১৯৫৩। ৬৪ পৃষ্ঠা। এটি বাকুনিনের রচনার একটি বাছাই করা সংকলন। পরবর্তী পৃষ্ঠা নির্দেশ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

না ঝুলিয়ে বরং জেলে পুরে আচ্ছা করে খাটানো।

ফয়েরব্যাক ধর্মবিশ্বাসের একটা বাস্তব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মানুষের আকাঙ্ক্ষা অমিত, সাধ্য সীমিত। অল্প ক্ষমতায় আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় না বলে সে কল্পনার শরণ নেয়, সান্ত মানুষিক শক্তিকে অনন্ত অমানুষিক করে তাকে বলে দৈব। নিজের সত্তাকে খণ্ডিত করে, বিচ্ছিন্ন করে, নিজের উপরে দাঁড় করিয়ে সে তার ভজন করে। এমনি করে আসে ঈশ্বর ও মানুষের দ্বৈত, মর্ত্য ও স্বর্গের ব্যবধান। এই প্রসঙ্গ ধরে বাকুনিন এলেন উগ্র ধর্মদ্রোহিতায়। স্বর্গ মানুষেরই উলটিত বিবর্ধিত প্রতিচ্ছায়া, অজ্ঞ অন্ধ বিশ্বাসে নিজের বিকৃত ছবিকে সে দেবায়িত করেছে। এই প্রকারে

> পৃথিবীর সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া স্বর্গ হইয়াছে সমৃদ্ধ এবং ইহার অনিবার্য পরিণামে স্বর্গ যতই সমৃদ্ধ হইয়াছে মানুষ ও পৃথিবী ততই শ্রীহীন হইয়াছে।
>
> ঈশ্বরই যখন সব তখন বাস্তবজগত ও মানুষ কিছুই নহে। যেহেতু ঈশ্বর সত্য, ন্যায়, সততা, সৌন্দর্য, শক্তি ও জীবন, সেহেতু মানুষ অসত্য, অন্যায়, অসততা, কুশ্রীতা, অক্ষমতা ও মৃত্যু। যেহেতু ঈশ্বর প্রভু সেহেতু মানুষ দাস। সে নিজের চেষ্টায় ন্যায় সত্য ও অমরত্ব লাভ করিতে পারে না বলিয়া এই সকল অভীষ্টলাভের জন্য দৈবাদেশের উপর নির্ভর করে। আর দৈবাদেশের কথা বলিলেই আসে আদেষ্টার কথা, ত্রাণকর্তা, ধর্মাবতার, পুরোহিত ও ঈশ্বরে অনুপ্রাণিত শাস্ত্রকারের কথা। ইহারা পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি, মানুষকে মুক্তির পথে চালাইয়া লইবার জন্য ঈশ্বর ইহাদিগকে বাছিয়া বাছিয়া পবিত্র উপদেষ্টা করিয়া পাঠাইয়াছেন—এ কথা মানিয়া লইলে ইহাদের হাতে গিয়া পড়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা।[৬]

এইরূপে মানুষ আপনার দেবায়িত ছায়াকে বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়বোধ সমর্পণ করে। সে হয় প্রভুর ভয়ে তটস্থ, প্রভুর দয়ার কাঙাল জানোয়ারের সামিল।

> মনে কর একটি পোষা কুকুর প্রভুর একটু আদরের জন্য, একটু কৃপাদৃষ্টির জন্য আবেদন করিতেছে। তাহার চেহারায় কি ঈশ্বরের নিকট নতজানু ভক্তের ছাপ ফুটিয়া ওঠে না? পরিবেশের প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া মানুষ তাহা আরোপ করিয়াছে ঈশ্বরে। ঐ কুকুরটাও কি তেমন তার কল্পনা ও অভিজ্ঞতালব্ধ ক্ষীণ চিন্তাশক্তি দিয়া প্রকৃতির পরম শক্তিকে প্রভুর মধ্যে দেখিতেছে না? ("ফেডারেলিজ্‌ম্, সোস্যালিজ্‌ম্ এণ্ড এণ্টি-থিয়লজিজ্‌ম্", ম্যাক্সিমফ, ১০৯)

ভলতের বলেছিলেন ঈশ্বর যদি নাও থাকে মানুষকে নিজের দরকারে তাকে সৃষ্টি করতে হয়। বাকুনিন তাঁর কথা উলটিয়ে বললেন "ঈশ্বর যদি থাকেও তাহলে তাকে বাতিল করা দরকার।" বাতিল তাকে হতেই হবে। জৈব প্রকৃতির অমানিশা পিছনে ফেলে মানুষ এসেছে বুদ্ধির মুক্ত দিবালোকে। আমাদের প্রথম পূর্বপুরুষরা বন্য পশুর সামিল হলেও দুটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল—'চিন্তার ক্ষমতা ও বিদ্রোহের প্রবৃত্তি।' ধর্ম, দর্শন ও আইনের শাস্ত্র যত মিথ্যা আমদানি করেছে সমস্তের বিরুদ্ধে বুদ্ধি করেছে বিদ্রোহ ঘোষণা। আজ বুদ্ধি শানিত হয়েছে বিজ্ঞানে, বিজ্ঞান বিদ্রোহীর প্রচণ্ড হাতিয়ার। মুষ্টিমেয় বিদ্যা-

[৬] গড এণ্ড দি স্টেট, মাদার আর্থ পাবলিশিং এসোসিয়েশন, নিউ ইয়র্ক সিটি। ২৪ পৃষ্ঠা।

বিলাসীর হাত থেকে এ হাতিয়ার ছিনিয়ে নিয়ে তুলে দিতে হবে জনতার হাতে। এই হাতিয়ার নিয়ে মুক্তবুদ্ধি জনতা চড়াও হবে স্বর্গের ওপর, লুণ্ঠন করবে স্বর্গের ঐশ্বর্য।

গডউইনের মত বাকুনিনও শান্তশুদ্ধ প্রাকৃতিক সমাজের ওপর বিজ্ঞানের আলোকপাত করেছেন, একে পশুর স্বর্গ বলে বিদ্রূপ করেছেন। প্রকৃতির কোলের মুক্ত বর্বর যেন মায়ের কোলের দুষ্টু ছেলে! কল্পনাটি আকাশের ফুলের মত সুন্দর এবং অলীক। বস্তুত মানুষ কোনকালে প্রকৃতির দাস ছিল না, প্রভুও ছিল না। তার মুক্তি আপেক্ষিক। সে প্রকৃতির অংশ কাজেই প্রকৃতির কার্যকারণ নিয়মে আবদ্ধ।

> মানুষের স্বাধীনতা বলিতে কেবল ইহাই বুঝায়—যে সে প্রাকৃতিক নিয়মের বাধ্য নিজ হইতে ইহাকে নিয়ম বলিয়া বুঝিয়াছে তাই, বাহির হইতে অপরের ইচ্ছার তাগিদে নহে,—তা সে ইচ্ছা দৈব কিংবা মানসিক, যৌথ কিংবা একক যাহাই হউক না কেন।[৭]

মানুষ নীতিবোধ নিয়ে জন্মায় না। সে পরিবেশের সৃষ্টি, সামাজিক আবহাওয়ায় তার নীতিবোধ গড়ে ওঠে। গডউইনের মত বাকুনিনও অপরাধের জন্যে দায়ী করেছেন সমাজ-ব্যবস্থাকে। শাস্তির মত অন্যায় আর নেই, কারণ

> যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে সে ভূমিষ্ঠ ও লালিত হইয়াছে এবং যাহার আওতায় সে এখনও বর্তমান, ব্যক্তি তাহারই অনিচ্ছাকৃত উৎপন্ন জীব।[৮]

অতএব হিতোপদেশে কিছু হয় না।

> মানুষকে নীতিবান করিতে হইলে দরকার তাহার সমাজপরিবেশকে নীতিবান করা। ইহার উপায় মাত্র একটি;—সকলকে ন্যায্য প্রাপ্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া, অর্থাৎ সকলের সম্পূর্ণ সমতার মধ্যে প্রত্যেকের অবাধ স্বাধীনতা ("ইণ্টিগ্র্যাল এডুকেশন," ম্যাক্সিমফ, ১৫৫)

ঐশ্বরিক নীতিশাস্ত্র দাঁড়িয়ে আছে প্রভুর ও মানুষের অবনতির ওপর, মানবিক নীতি-বোধ দাঁড়িয়ে আছে মানুষের সাম্য ও মুক্তির ওপর। ঐশ্বরিক নীতিশাস্ত্র শ্রমকে বলেছে পাপের শাস্তি, মানবিক নীতিবোধ শ্রমকে দিয়েছে মর্যাদা।

> আমরা বিপ্লবের সন্তান, বিপ্লবের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি মানবতার ধর্ম, দেবতার ধর্মের ধ্বংসাবশেষের উপর আমাদিগকে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে ("ফেডারেলিজ্‌ম্‌", ম্যাক্সিমফ ১৪২)।

এসব প্রুদঁ'র কথার পুনরাবৃত্তি। ঐতিহাসিক জড়বাদের শিক্ষাও বাকুনিন প্রথম পান প্রুদঁ'র কাছে—

> হাঁ, প্রুদঁ ঠিক বলিয়াছেন, আদর্শ একটি ফুল যার শিকড় জীবনের বাস্তব অবস্থায় নিহিত। মানুষের দার্শনিক, নৈতিক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাস কেবল আর্থিক ইতিহাসের প্রতিফলন ("গড এণ্ড দি স্টেট",৯)

এ তত্ত্ব পূর্ণাঙ্গ হয়েছে মার্ক্সের কলমে। তাঁর কাছে বাকুনিন ঋণ স্বীকার করেছেন। তাঁর অজস্র পত্রে ও পুস্তিকায় আছে মার্ক্‌স্‌-এর ধনতান্ত্রিক শোষণ, প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া অধিকার, শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক ঐক্য ইত্যাদি সূত্রের পুনরুক্তি। সম্পত্তিপ্রথার বিশ্লেষণে, ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় তিনি মার্ক্সের

[৭] গড এণ্ড দি স্টেট, ৩০ পৃষ্ঠা।
[৮] ইণ্টারন্যাশন্যাল এলায়েন্স অব সোস্যাল ডিমক্রাসীর কার্যসূচী।

অনুগামী। কিন্তু একটি বিষয়ে আছে মৌলিক পার্থক্য। তিনি সম্পত্তিকে এনেছেন রাষ্ট্রের আগে নয়, পরে। মার্ক্সের মতে রাষ্ট্রিক অবস্থার উৎপত্তি আর্থিক অবস্থা থেকে,

> সে বলে দারিদ্র্য রাষ্ট্র ও তার দাসত্বের জন্ম দেয়। সে সায় দিবে না যদি কথাটা ঘুরাইয়া বলা হয়—রাষ্ট্র এবং তার দাসত্ব নিজেদের বজায় রাখিবার জন্য দারিদ্র্য সৃষ্টি করে ও জীয়াইয়া রাখে, এবং দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে রাষ্ট্রকে নাশ করা দরকার।[৯]

শ্রমিককে শোষণ করে জমা হয় সম্পত্তি ও পুঁজি। রাষ্ট্রের প্রথম কাজ হল আইনের বলে সম্পত্তিকে রক্ষা করা অর্থাৎ শ্রমিককে শোষণ করবার অধিকারটিকে কায়েম করা। সুতরাং রাষ্ট্রকে আগে উচ্ছেদ করা দরকার। রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করবার কথা বলে মার্ক্স বুর্জোয়া গণতন্ত্রবাদীদের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন। বুর্জোয়া-শাসিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আর শ্রমিক-শাসিত একতান্ত্রিক রাষ্ট্র দুয়ে আসলে কোন তফাত নেই। এ বিষয়ে বাকুনিনের মন্তব্য প্রুদঁ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, যুক্তকরণ ও নৈরাজ্যের আদর্শ তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। বাকুনিনের বিদ্রোহী স্বভাব যে একটা নাশাত্মক দর্শনে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছিল তার কৃতিত্ব প্রুদঁ'র। প্রুদঁ'র দর্শনের জোরেই তিনি পরে মার্ক্‌স্‌-এর সঙ্গে লড়তে পেরেছিলেন।

বাকুনিনের চিন্তাগুলি ধারালো উজ্জ্বল, কিন্তু তাতে দর্শনের পরিণতি ও সামঞ্জস্য নেই। তাঁর দার্শনিক দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যেত আবেগে। প্রজ্ঞাকে ছাপিয়ে উঠত কর্মের নেশা। তাঁর রাজনীতিতে ছিল বেশ কিছু জাত্যন্ধতার খাদ। শ্লাভপ্রীতি, ইহুদী ও জার্মান বিদ্বেষ ছিল তাঁর অস্থিমজ্জায়। ১৮৬২ সালে ভ্রাতৃবধূ নাটালীকে তিনি এক পত্রে লিখছেন—

> পোল, রুশ ও শ্লাভজাতির ইণ্টকামনায় আমি কর্মব্যস্ত হইয়া আছি এবং নিয়মিতভাবে একান্ত বিশ্বাসের সহিত জার্মানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াইতেছি। ঈশ্বর প্রসঙ্গে ভলতেরের উক্তির অনুকরণ করিয়া আমি বলি যদি জার্মানরা নাও থাকিত তাহা হইলেও জার্মানদিগকে আবিষ্কার করিতে হইত কারণ সুগভীর জার্মান বিদ্বেষ শ্লাভদিগকে যেমন একতাবদ্ধ করিতে পারে তেমন আর কিছুতে নয়।[১০]

মার্ক্‌স্‌ ছিলেন জার্মান ইহুদী, বাকুনিন শ্লাভ রুশ। উভয়ে যে অহিনকুল সম্পর্ক দাঁড়াবে তা আর বিচিত্র কি?

উইটলিং ও প্রুদঁ বাকুনিনের কানে যে মন্ত্র দিয়েছিলেন তাতে তিনি সিদ্ধ হলেন সাইবেরিয়া থেকে পালিয়ে আসার পর। "বিপ্লবের বিতর্কিকা" ও পরবর্তী লেখায় তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য হল সর্ববিধ কর্তৃত্ব। কর্তৃত্ব কর্তা ও দাস দুজনকেই হেয় করে—কারণ তার কাজের ধারা জবরদস্তি, বুদ্ধি ও অন্তরের কাছে আবেদন নয়। জোরজুলুম আদিম কালের চাল, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এ চাল অচল হবে। জোরজুলুম সমাজে তিন আকারে অধিষ্ঠিত—ধর্ম, রাষ্ট্র ও সম্পত্তি। "ফেডারেলিজ্‌ম্‌, সোস্যালিজ্‌ম্‌ এণ্ড এণ্টিথিয়লজিজ্‌ম্‌" ইস্তাহারে তিনি এদের অপসারণ করবার উপায় বাতলালেন। ধর্মকে সরকারী ও শিক্ষার

[৯] মার্ক্‌সিজ্‌ম্‌, ফ্রীডম এণ্ড দি স্টেট; অনুবাদ ও সম্পাদনা, কে. জে. কেনাফিক, লণ্ডন। ৪৮-৪৯ পৃষ্ঠা।
[১০] ই. এইচ. কার : মাইকেল বাকুনিন। ২৫১ পৃষ্ঠা।

ক্ষেত্র থেকে বার করে দিতে হবে, ধর্ম হবে যার যার ব্যক্তিগত বিবেকের ব্যাপার। রাষ্ট্র তুলে দিতে হবে, তার জায়গায় থাকবে সমাধিকারী ব্যক্তি, স্বাতন্ত্র্যশীল কমিউন ও প্রদেশ এবং পরস্পরের সহযোগ। বর্তমান সম্পত্তিপ্রথার আমূল পরিবর্তন করে বিত্ত, শ্রম, অবসর ও শিক্ষা সকলকে সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে।

সকল প্রকার কর্তৃত্বের ভিত্তিপ্রস্তর হল রাষ্ট্র। সম্পত্তি ও ধর্মের জুলুম রাষ্ট্রশাসনের ওপর ভর করে আছে। রাষ্ট্র ভেঙে পড়লে এরা হবে নিরালম্ব। সুতরাং নৈরাজ্যবাদীর লড়াই প্রধানত রাষ্ট্রের সঙ্গে।

> পশুবলের উপর বিধাতার আশীর্বাদ লইয়া রাষ্ট্রের জন্ম। ইহা স্বাভাবিক সুস্থ সমাজ নহে যেখানে সকলের যৌথ জীবন প্রত্যেকের জীবনকে ধারণ করিয়া আছে। ঠিক তার বিপরীত। ইহাতে প্রত্যেকটি ব্যক্তি ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের বলিদান হয়। জীবন্ত সমাজকে নষ্ট করিয়া ইহা তাহার কায়াহীন ছায়া লইয়া দাঁড়ায়। সর্বসাধারণের স্বার্থের নাম করিয়া ইহা প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকারকে সঙ্কুচিত, এমন কি সমূলে বিনাশ করে, তাহার জীবনকে পঙ্গু করে। এ এক সর্বগ্রাসী সার্বজনীনতা যার বেদীমূলে স্বাভাবিক সমাজের বলিদান হয়। ("দেশপ্রেমের পত্রাবলী", ম্যাক্সিমফ, ২১৬)

রাষ্ট্রের কোন নীতির বালাই নেই। পরস্পর বিবাদ বিদ্বেষ ও অবিরাম যুদ্ধ এই এদের কারবার। চুরি, বাটপাড়ি, ডাকাতি, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা এমন কোন দুষ্কর্ম নেই যা রাজনৈতিক ধুরন্ধররা রাষ্ট্রস্বার্থের নামে অহরহ না করে থাকেন।

> সুতরাং রাষ্ট্র কখনো সৎ ন্যায়বান ও নীতিবান হইতে পারে না। সকল রাষ্ট্র এই অর্থে মন্দ যে তাহারা যে ধাতুতে যে উদ্দেশ্যে গড়া সেই স্বভাবদোষে মানবিক ন্যায় নীতি ও মুক্তির আমূল পরিপন্থী।[১১]

রাজনীতি জনতাকে শাসন ও শোষণ করবার ফিকির। প্রভুত্বের সূত্র হল এই যে,

> যেহেতু জনগণ কখনই আপনাদিগকে শাসন করিতে পারে না সেহেতু তাহাদিগকে সদাসর্বদা কোন না কোন কল্যাণকামী জ্ঞানী ও বিচারকের শাসন মানিয়া চলিতে হইবে।...জনগণ কর্তৃক এই প্রকারে স্বীকৃত ও সম্মানিত প্রভুত্ব তিন উপায়ে আসিতে পারে—বল, ধর্ম ও উচ্চতর বুদ্ধি। আর এ সবগুলি থাকে লঘুতর সংখ্যার জিম্মায়।[১২]

গণতন্ত্রের আইনে জনসাধারণ রাষ্ট্রের প্রভু। কিন্তু তাদের না আছে শিক্ষা, দিনগত পাপক্ষয়ের পর না আছে অবসর। বাধ্য হয়ে তারা প্রভুত্ব ছেড়ে দেয় কায়েমীস্বার্থদের হাতে। তারা মাস্টার জনতা বেয়াড়া ছাত্র, তারা মেষপাল জনতা মেষ।

> মেষপালক হইতে সাবধান। কারণ যেখানে ভেড়ার পাল আছে সেখানে আছে মেষপালক তাহাদের পশম ও পেট কাটিবার জন্য ("গড এণ্ড দি স্টেট", ৩৯)।

এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা কিংবা গণভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ যে বা যারাই দেশ শাসন করুক, তাতে রাষ্ট্রের চরিত্র বদলায় না। অনতিবিলম্বে প্রতিনিধিবর্গ হয়ে দাঁড়ায় এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ যারা জাত হাকিম, শাসন চালানো যাদের এখতিয়ার। যদিও বা গুণী ও সৎ লোকেরা নির্বাচিত হয় হুকুম করার অভ্যাস তাদের চরিত্র নষ্ট করে, ক্ষমতা ও সুবিধার

[১১] লীগ অব পীস এণ্ড ফ্রীডম-এর কংগ্রেসে দেওয়া বক্তৃতা। কার : ৩৪০ পৃষ্ঠা।
[১২] মার্ক্সিজ্‌ম্‌ ফ্রীডম এণ্ড দি স্টেট, ৩৭ পৃষ্ঠা।

মোহে তারা ভ্রষ্ট হয়। ক্ষমতার অবধারিত পরিণাম জনতার প্রতি অবজ্ঞা ও আত্মপ্রসাদের অতিরঞ্জন। শ্রমিকরাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। একবার পার্লামেণ্টে এলে তাদেরও মাথা ঘুরে যায়। বুর্জোয়াদের পার্লামেণ্টারী কায়দাকানুন রপ্ত হবার পর তারা আর শ্রমিক থাকে না তারা হয় রাজনীতিজ্ঞ, পলিটিশিয়ান।

প্রুদঁ বলেছিলেন সার্বজনীন ভোটাধিকার বিপ্লব-বিরোধী। বাকুনিন এই বচনের বিস্তার করেছেন।

> যতক্ষণ লঘুসংখ্যক লোক দেশের বিত্ত ও পুঁজি করায়ত্ত করিয়া জনগণ তথা শ্রমিক সাধারণের উপর আর্থিক আধিপত্য খাটায় ততক্ষণ জনসাধারণ রাজনৈতিক অর্থে মুক্ত ও স্বাধীন হইলেও তাহাদের সার্বজনীন ভোটের নির্বাচন ফলত ছলনাময় ও অগণতান্ত্রিক হইয়া দাঁড়ায়। নির্বাচনের ফল জনসাধারণের প্রয়োজন, প্রবৃত্তি ও প্রত্যাশার প্রতিকূল হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ("নাউটো-জার্মান সাম্রাজ্য", ম্যাক্সিমফ, ২১৩)

প্রুদঁর ন্যায় বাকুনিনেরও ছিল সংবিধান ও আইনসভায় বিতৃষ্ণা। ইয়োরোপের পার্লামেণ্ট ও কংগ্রেসগুলিতে জনপ্রতিনিধিদের কার্যকলাপ দেখে তিনি হতাশ হয়েছিলেন। এদের দলাদলি, বাক্‌বিতণ্ডা এবং কথা ও কাজে আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখে তিনি বুঝেছিলেন এরা জনতার মানুষ নয়। 'জারের প্রতি স্বীকারোক্তি'তে তিনি লিখছেন—

> প্রতিনিধিমূলক শাসন, বৈধানিক ব্যবস্থা, পার্লামেণ্টের অভিজাত শ্রেণী এবং তথাকথিত ক্ষমতার ভারসাম্য—যাহাতে রাষ্ট্রের অপ্রত্যঙ্গ এমনভাবে বিন্যস্ত হয় যে কোনটিই কার্যকরী হইতে পারে না,—এককথায় পাশ্চাত্ত্য উদারনৈতিকদের চুলচেরা সূচতুর অন্তঃসারশূন্য রাষ্ট্রদর্শনের বাকজাল,—এ সকলকে আমি কখনও প্রশংসা, সহানুভূতি ও সম্মানের চক্ষে দেখিতে পারি নাই। তারপর যখন আমি ফ্রান্স, জার্মানী, এমন কি শ্লাভ কংগ্রেসেও পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের পরিণাম দেখিতে পাইলাম তখন হইতে এ সকলকে আমি আরো বেশি অবজ্ঞা করিতে শুরু করিয়াছি। (কার, ১৭২)

পার্লামেণ্টারী শাসন আসলে গণতন্ত্রের ছদ্মবেশধারী স্বৈরশাসন। মানুষকে নিজের অধিকার নিজের হাতে রাখতে হবে। নূতন সমাজের বনিয়াদ হবে যে স্বাধীনতা তা প্রতিনিধি দ্বারা সুরক্ষিত হতে পারে না।

> রাষ্ট্রাধিকারের সাম্য এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই কথাগুলির মধ্যে এক জাজ্বল্যমান বৈষম্য রহিয়াছে। রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রাধিকার বলিতে বুঝায় বল, কর্তৃত্ব, আধিপত্য, তার মানে অসাম্য। যেখানে সকলেই শাসক, সেখানে কেহ শাসিত নয়, সেখানে রাষ্ট্র নাই। যেখানে সকলে সমান মানবাধিকার ভোগ করে সেখানে রাষ্ট্রাধিকার থাকিবার কোন যুক্তি নাই। রাষ্ট্রাধিকার অর্থ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে বিশেষ সুবিধা। যেখানে সকলের সুযোগ সুবিধা সমান সেখানে বিশেষ সুবিধার জায়গা নাই, রাষ্ট্রাধিকারও নাই। সুতরাং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রাধিকারের সমতা বলিতে বুঝায় রাষ্ট্রের বিনাশ ও যাবতীয় রাষ্ট্রাধিকারের বিলোপন। ("সমাজ বিপ্লববাঁদের আন্তর্জাতিক মৈত্রী", ম্যাক্সিমফ, ২২২-২৩)

স্বাধীনতাকে ভেঙে টুকরা টুকরা করা যায় না। কিছুটা স্বাধীনতা খর্ব করে বাকিটুকু রাষ্ট্রের মারফত সুরক্ষিত করার যুক্তি একেবারে অসার।

ঐ যেটুকু স্বাধীনতা কাড়িয়া লওয়া হইতেছে ঐটুকু আমার সব, আমার স্বাধীনতার সার। অতি স্বাভাবিক অনিবার্য প্রয়োজনে আমার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ঠিক ঐ জায়গাটুকুর মধ্যে আসিয়া জড় হইয়াছে ("ফেডারেলিজ্‌ম্‌", ম্যাক্সিমফ, ২০৯)।

মুক্তির মূল সমাজে। একে পাওয়া যাবে তখনই যখন রাষ্ট্রকে ভেঙে দিয়ে ব্যক্তি সকল রকম কর্তৃত্ব থেকে ছাড়া পাবে, সকলে সমাজের সমান সভ্য হয়ে দাঁড়াবে।

রাষ্ট্রের আত্মা দেশপ্রেম। স্বভাবজাত দেশপ্রেম একটি জৈব বৃত্তি। এ এক যূথবদ্ধনীন আত্মম্ভরিতা, যে পৈত্রিক বা ঐতিহ্যবাহী জীবনশৈলী সমাজের স্বীকৃতি পাইয়াছে তাহার প্রতি জন্মগত যুক্তিহীন যন্ত্রপর আকর্ষণ, এবং অন্যবিধ জীবনশৈলীর বিরুদ্ধে তেমনি অন্ধ যন্ত্রবৎ শত্রুতা ("দেশপ্রেমের পত্রাবলী," ম্যাক্সিমফ, ২২৭)

গাঁয়ের কুকুরগুলো যেমন স্বাধীনভাবে চলেফেরে যে যার ওপর পারে জোর খাটায়, কিন্তু ভিনগাঁয়ের একটি কুকুর যদি তাদের সামনে এসে পড়ে অমনি সারমেয়গণতন্ত্রের যত বিশিষ্ট নাগরিক হৈ হল্লা করে হতভাগ্য আগন্তুকের ওপর একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে দেশ-প্রেমিকরাও ঠিক তেমনি।

যে জাতি যত পিছিয়ে আছে অভ্যস্ত জীবনের ওপর জৈবিক টান ও অনভ্যস্ত অন্য জীবনের ওপর ঘৃণা তার তত বেশি। ইতিহাসের সূচনায় বর্বরদের মধ্যে ভাষা, দেবদেবী, পুরোহিত এবং জাদুকরকে নিয়ে যে গোষ্ঠীপ্রীতি জাগরূক ছিল, যা জাতিযূথের বাইরে কোন কিছু মানত না, দেশপ্রেমের সূত্রপাত সেইখান থেকে। মেরুদেশের লোকেরা এখনো বাস করে পশুর মত, অতি সামান্য প্রয়োজনও তাদের মেটাবার সাধ্য নেই, তবু তারা অন্যত্র নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না। আর ফরাসী জার্মান ও ইংরাজ, যারা প্রগতির পুরোভাগে চলছে তারা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে।

স্বদেশের প্রতি ভালবাসা একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। এ নিয়ে বড়াই করবার কিছু নেই। অহংকারে অন্ধ হয়ে পিতৃভূমির গৌরব ও প্রতাপ বাড়াবার জন্যে মাতামাতি করা একটা বিকার।

জাতীয়তা একটা বাস্তব সত্য, যেমন ব্যক্তিত্ব বাস্তব সত্য—ইহা কোন নীতি নয়। ছোট বড় সকল জাতির নিজের স্বভাবধর্মে বসবাস করিবার অবিসংবাদী অধিকার আছে। ইহা সর্বপ্রযুজ্য স্বাধীনতা-নীতির অনুসিদ্ধান্ত। ("নাউটো-জার্মান সাম্রাজ্য," ম্যাক্সিমফ, ৩২৫)

দম্ভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাদ দিলে স্বাভাবিক দেশপ্রীতি সমাজে সচ্ছন্দ সহযোগিতার আকার নেয়।

সামাজিক একতার অভ্যুদয় হয় ঐতিহ্য, অভ্যাস, প্রথা, ভাবধারা, বর্তমান অনুষ্ঠান এবং সমবেত আশাআকাঙ্ক্ষার যোগাযোগে। ইহা সচল সফল বাস্তব একতা। আর রাষ্ট্রীয় একতা মিথ্যা, একতার ছলনা। ইহার মধ্যে বৈষম্য লুকাইয়া আছে। শুধু তাহাই নয়। যেখানে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ না করিলে একটি সক্রিয় ঐক্য অবশ্য গড়িয়া উঠিত সেখানে ইহা কৃত্রিম উপায়ে বৈষম্য সৃষ্টি করে। (ইটালীর বন্ধুদের প্রতি পত্র, ম্যাক্সিমফ, ২৭২)

ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডি ইতালীতে যে জাগরণের ঢেউ এনেছেন তার গৌরব একতাবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র সংগঠনে নয়। বরং এইটেই হয়েছে তাদের ভুল, কারণ স্বাধীনতা ও জনগণের

উন্নতি না হারিয়ে রাষ্ট্রীয় ঐক্য লাভ করা যায় না। এর সার্থকতা এইখানে যে এই আন্দোলন ইতালীয় জনতার সামাজিক সংহতির বিঘ্নস্বরূপ ছোট ছোট প্রভুত্বশীল রাজ্যগুলিকে বিনাশ করেছে।

আধুনিক রাষ্ট্রে দেশপ্রেম মানে সুবিধাভোগীদের স্বার্থে মানবতার বিরুদ্ধাচার। প্রজার ধর্ম রাষ্ট্রানুগত্য, রাষ্ট্রের কাজ শোষকদের স্বার্থ বাঁচিয়ে চলা। এই স্বার্থ যখন বিপন্ন হয় তখন সুবিধাভোগীরা দেশের স্বাধীনতা বিদেশীর পায় সঁপে দিতে কসুর করে না, যেমন ১৮৭০ সালে ফরাসী বুর্জোয়ারা জার্মানদের পায় তাদের স্বাধীনতা সঁপেছিল। কিন্তু যদি তাদের স্বার্থ শ্রমিকদের হাতে বিপন্ন হয়, এবং যদিও বা শ্রমিকরা স্বাধীনতার জন্যে লড়তে থাকে তাহলে তারা গায়ের জোরে তাদের দমন করতে ইতস্তত করে না, যেমন ১৮৭১ সালে তারা পারী কমিউনকে দমন করেছিল। তাদের কাছে বিদেশীর আক্রমণের চেয়ে সমাজবিপ্লব গুরুতর সংকট। খাঁটি দেশভক্ত হল প্রতিতারিয়রা যারা দেশরক্ষার জন্যে এগিয়ে এসেছিল, যদিও তাদের পিতৃভূমি প্রসারিত হয়েছিল দুনিয়ার মজদুরকে নিয়ে। ("রাষ্ট্রবাদ ও নৈরাজ্যবাদ")

১৮৪২ সালে বাকুনিন 'জর্মানীতে প্রতিক্রিয়াশীল শাসন' প্রবন্ধের উপসংহারে বলেছিলেন

আমরা সেই চিরন্তন চিৎশক্তির উপর আস্থা রাখিব যাহা ধ্বংস ও বিলোপ করে জীবনের অজ্ঞেয় অবিরাম সৃষ্টি-উৎস বলিয়াই। বিনাসের বাসনা সৃষ্টিরই বাসনা।

দুর্দান্ত নাশবৃত্তির সঙ্গে হেগেলীয় স্বন্দ্ববাদ মিলিয়ে রচিত হয়েছে বাকুনিনের বিপ্লববাদ। নৈরাজ্যবাদে আসবার আগেই এর খসড়া তৈরি হয়েছিল। ১৮৪৮ সালে 'স্লাভদের প্রতি আবেদনে' তিনি লিখছেন

এই স্থাবির সমাজ জগৎকে আপাদ মস্তক উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে, উষর অক্ষম এই সমাজের সাধ্য নাই এই প্রচণ্ড মুক্তির উচ্ছ্বাসকে ধারণ করে। সকলের আগে শোধন করিতে হইবে আবহাওয়া, বদলাইতে হইবে আমাদের জীবনের পরিবেশ যাহা আমাদের বৃত্তি ও বাসনা কলুষিত করিতেছে, অন্তর ও বুদ্ধি সংকুচিত করিতেছে। সামাজিক প্রশ্ন প্রধানত বর্তমান সমাজের উচ্ছেদের প্রশ্ন (কার ১৭৩)।

"বিপ্লবের বিতর্কিকা"য় নাশকতা নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে সংযুক্ত হল। নিরাজ সমাজের ভূমিকা হল মহাপ্রলয়।

বিপ্লব মানে যুদ্ধ আর যুদ্ধ মানে মানুষ ও বস্তুর বিনাশ। বড়ই দুঃখের কথা আজ পর্যন্ত অগ্রগতির কোন শান্তিপূর্ণ উপায় আবিষ্কার হয় নাই, রক্তস্নানের মধ্য দিয়া ইতিহাস তার প্রত্যেকটি পা ফেলিয়া অগ্রসর হইয়াছে। ইহার জন্য প্রতিক্রিয়া বিপ্লবে দোষারোপ করিতে পারে না কারণ বিপ্লবের অপেক্ষা প্রতিক্রিয়ার হাতে রক্তপাত হইয়াছে বেশি।

গড়বার ভাবনা এখন নয়। এযুগে শুধু নাশ, ধ্বংস, কোন কিছুর অবশেষ থাকবে না। এযে কেবল বিপ্লবীর নেশা তা নয়। সে কাল বয়ে এনেছিল মহাকালের পদধ্বনি, আকাশে ছিল মেঘের গর্জন বাতাসে ঝড়ের নিঃস্বন। ১৮৪৮-এর ধূলিসাৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা

পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল সংহার মন্ত্রে। হারজেনের মত একজন স্থিতধী প্রচারকও তাঁর "ঝড়ের পরে" বইতে এই জাগরণের সংবর্ধনা করেছিলেন—'গোল্লায় যাক সারা দুনিয়া, ধ্বংস ও উচ্ছৃঙ্খলার জয় হোক।' আদর্শবাদীর শেষ স্বপ্ন ছিল প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যা সমাজে আনবে ন্যায়ের বিধান। সে স্বপ্নসাধ মিলিয়ে যাবার পর আশার আর কোন আশ্রয় রইল না। ইয়োরোপের জনমানসকে অধিকার করে বসেছিল এক ভয়ংকর সর্বনাশা নেতিবাদ যা স্টার্নারের মত দর্শনে আবদ্ধ নয়, যার যুক্তি কথায় নয়, হিংসাত্মক কর্মে। এই অব্যক্ত আবেগকে ভাষা দিলেন বাকুনিন, তাঁর বিপ্লববাদ সমকালীন ক্ষিপ্ত যুযুৎসার তুর্যধ্বনি।

১৮৬৯ সালে রুশের তরুণ পলাতক বিপ্লবী সার্জী নেচাএভ জেনেভায় এসে বাকুনিনের সঙ্গে মিলিত হন। ইনি ছিলেন বাকুনিনের চেয়েও উগ্র, ন্যায়নীতির ধার ধারতেন না। গুরুশিষ্য মিলে তিনটি বেনামী ইস্তাহার রচনা করলেন, "বিপ্লবের প্রশ্ন কি আকারে আসিয়াছে", "বিপ্লবের নীতিকথা" এবং "বিপ্লবের বিতর্কিকা"[১৩]। তিনখানি পুস্তিকায় আছে নাশকতার পাঠ, নির্মম নির্বিবেক হিংসাত্মক কাজের ফিরিস্তি।

প্রথমটি রুশ কৃষাণদের চিরাচরিত বিদ্রোহ-প্রণালী দস্যুবৃত্তির বন্দনা।

> দস্যুবৃত্তি রুশ জাতীয় জীবনের অতি সম্মানিত বৈশিষ্ট্য।...একমাত্র খাঁটি বিপ্লবী রুশের দস্যু, যে গরম কথার ও কেতাবী বিদ্যার বিপ্লবী নয়, আপোসহীন ক্লান্তি-হীন দুর্দমনীয় কর্মের বিপ্লবী।...যে রুশে ষড়যন্ত্র করিয়া গণবিপ্লব সাধন করিতে চায় তাহাকে ঐ রাজ্যে যাইতে হইবে।...স্টেংকা রাজিন ও পুগাচেভের বর্ষতিথি সমাগত। এই জনযোদ্ধাদের সম্মানে উৎসব পালনের সময় আসিয়াছে।[১৪]

দ্বিতীয় ইস্তাহারটির নির্দেশ আরো সরল সুস্পষ্ট।

> আমরা নাশকার্য ছাড়া অন্য কাজের মূল্য বুঝি না। অবশ্য আমরা স্বীকার করি এ কাজ নানা আকার লইতে পারে—যথা, বিষ, ছুরি, দড়ি ইত্যাদি। এই যুদ্ধে যাবতীয় কুকর্ম বিপ্লবের ছোঁয়ায় পবিত্র হইয়া যায় (কার, ৩৭৯-৮০)।

তৃতীয় পুস্তিকা "বিপ্লবের বিতর্কিকা" গুপ্ত ষড়যন্ত্রের নির্দেশিকা। এতে আছে গুপ্ত সমিতির নিয়মকানুন ও সভ্যদের কর্তব্য সম্বন্ধে কঠোর নির্দেশ।

> বিপ্লবীর জীবন উৎসর্জিত। তাহার সর্বস্ব দখল করিয়া থাকিবে এক আগ্রহ, এক চিন্তা, এক কামনা—বিপ্লব (ধারা ১)।
>
> আজিকার নীতিশাস্ত্র, ইহার ভিতরের অভিসন্ধি ও বাহিরের অভিব্যক্তি তাহার নিকট জঘন্য ও বর্জনীয়। তাহার কাছে যাহা বিপ্লবের অনুকূল তাহাই নীতি-সঙ্গত, যাহা প্রতিকূল তাহাই অপরাধ ও অন্যায় (ধারা ৪)।

---

১৩ এটি ১৮৬৬ সালের বিতর্কিকা থেকে স্বতন্ত্র। বাকুনিনের ভক্তরা স্বীকার করেন না যে বই তিনটির মুসাবিদায় তাঁর কোন হাত ছিল। কেনাফিক "মার্কসবাদ, মুক্তি ও রাষ্ট্রে"র ভূমিকায় বাকুনিনের দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন। ম্যাক্সিমফ তাঁর সংকলনে এই ইস্তাহারগুলিকে ও 'জারের প্রতি স্বীকারোক্তি'-কে স্থান দেননি, সম্ভবত লেখকের যশের হানি হয় বলে। নেট্‌ল, কার প্রভৃতি লেখক বাকুনিনকে দায়মুক্ত করতে রাজী নন কারণ তাঁর রচনাভঙ্গী ও শব্দসম্ভার বইগুলিতে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে।

১৪ ১৬৭০ সালে ডনতীরের কসাক স্টেংকা রাজিন দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলে জার আলেক্সিসের বিরুদ্ধে এক চাষীবিদ্রোহ পরিচালনা করেন। তাঁর দল কয়েকমাস ধরে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে লুটপাট করে বেরিয়েছিল। মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে অনেক উপকথার সৃষ্টি হয়। এর ঠিক একশ বছর পরে মহারানী ক্যাথারিনের সময়ে এমিলিয়ান পুগাচেভ আরো ভয়ঙ্কর এক কিষাণ বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। এক প্রতিসরকার গঠন করে তিনি চাষীদের মুক্তি, জমিদারদের মৃত্যুদণ্ড ও তাদের সম্পত্তির বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন। দু বছর ধরে ভলগা উপত্যকার বহুল অংশ তাঁর অধিকারে ছিল এবং তিনি সাম্রাজ্যের বিভীষিকা হয়ে উঠেছিলেন।

> একটি মাত্র বিজ্ঞান তাহার জানা আছে, ধ্বংসের বিজ্ঞান। কেবল এই উদ্দেশ্যে সে বলবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন এবং সম্ভব হইলে চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে (ধারা ৫)।
>
> অহোরাত্র তাহার এক ধ্যান এক জ্ঞান—নির্দয় সংহার (ধারা ৬)[১৫]

পরের ধারাগুলি কুটিলতা ও নৃশংসতায় অতুলনীয়।

বিপ্লবীর প্রাথমিক কাজ রাষ্ট্রের বিনাশ। সরকারী দপ্তর, আইন সভা, আদালত, সেনা, পুলিস, চার্চ বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাঙ্ক, সম্পত্তির দলিল সব দূর করতে হবে। দেনাদাররা ধার শোধ দেবে না। প্রজারা খাজনা দেবে না। আইনের দেওয়া অধিকার, দলিলপত্র, দানপত্র, উইল, কবালা, আদালতের সমন—কেউ এসব মানবে না। পুঁজি ও কলকারখানা শ্রমিকসংঘের হাতে চলে আসবে এবং সামুদায়িক উদ্যোগে ব্যবহৃত হবে। চার্চ ও সরকারের সম্পত্তি এবং ব্যক্তির জমানো সোনারুপা বাজেয়াপ্ত হবে। সরকারী নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলা হবে।

প্রাগের বিদ্রোহে (১৮৪৮) তিনি যা যা করতে চেয়েছিলেন 'জারের প্রতি স্বীকারোক্তি'-তে বাকুনিন তার ফিরিস্তি দিয়েছেন।

> আমি স্থির করিয়াছিলাম অভিজাত ও বিরুদ্ধাচারী যাজকদিগকে তাড়াইয়া দিব এবং নির্বিচারে সমস্ত ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তার কিছু অংশ ভূমিহীন কৃষাণদের মধ্যে বিলি করিব যাহাতে তাহারা বিপ্লবের পক্ষে যোগ দেয়, আর বাকি অংশ রাখিব বৈপ্লবিক তহবিলে। আমি স্থির করিয়াছিলাম অভিজাতদের দুর্গগুলি ভাঙিয়া ফেলিব, বোহেমিয়ার যেখানে যত দলিলের তাড়া আছে, লাল ফিতায় বাঁধা যত সরকারি কাগজপত্র সব পুড়াইয়া ফেলিব, সমস্ত বন্ধকী তমসুক ও দু হাজার গিল্ডেনের উপর যত দেনার খত সব মকুব করিয়া দিব। মোট কথা আমার পরিকল্পিত বিপ্লব ছিল ভয়ঙ্কর অভূতপূর্ব, যদিও ইহার আঘাত ছিল মানুষের অপেক্ষা বস্তুর উপরে বেশি (১৯৮ পৃষ্ঠা)।

লিয়'র বিদ্রোহের (১৮৭০) সময়ে 'দেশরক্ষার যুক্ত সমিতি'র পক্ষ থেকে বাকুনিন একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। এতে নির্দেশ ছিল সরকারি শাসনযন্ত্র রদ হয়ে যাবে, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত উঠে যাবে, তার জায়গায় আসবে পঞ্চায়েতী বিচার, খাজনা দেওয়া বন্ধ হবে, তার বদলে কমিউনগুলি দেশরক্ষার প্রয়োজন অনুসারে বড়লোকদের কাছ থেকে চৌথ আদায় করবে এবং তার কিছু ভাগ যুক্তসমিতির তহবিলে দেবে। দায় দেনা সব দূর হবে। পৌরসভাগুলি ভেঙে দিয়ে তাদের জায়গায় বসবে দেশরক্ষা সমিতি, এরা জনগণের তদারকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবে (কার, ৪০২-০৩)।

এ সকল বিবর্তন গৃহযুদ্ধ ছাড়া সম্ভব নয়। তাতে ভয় পেলে চলবে না।

> গৃহযুদ্ধ রাষ্ট্রশক্তির কাছে অতি ভয়াবহ। আর এই কারণেই ইহা জনতার আত্ম-প্রয়াস জাগাইয়া তুলিবার এবং তাহাদের মানসিক, নৈতিক এমন কি আর্থিক উন্নতির পক্ষে সহায়ক। ইহার কারণ খুব সরল। সরকার পক্ষের আকাঙ্ক্ষা জনসাধারণ ভেড়ার পালের মত শান্ত হইয়া থাকুক যাহাতে মেষপালকরা ইচ্ছামত

---

১৫ ম্যাক্স্ নোমাড : এপসল্স অব রিভলুশেন, বস্টন, ১৯৩৯, ২২৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা। অতিগর্হিত ধারাগুলোর মুসাবিদায় সম্ভবতঃ বাকুনিনের হাত ছিল না। তাঁর হৃদয় ছিল অত্যন্ত কোমল, তিনি ভালবাসতে জানতেন। স্ত্রী, বন্ধু, ভাই সকলের প্রতি তাঁর ছিল গভীর দরদ। পরে এই সকল দুর্নীতির জন্যে নেচায়েভের সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

তাহাদিগকে চরাইতে ও তাহাদের পশম ছাঁটিতে পারে। গৃহযুদ্ধ জনতার এই মেষসুলভ নিষ্ক্রিয়তা ভাঙিয়া দেয়। ("নাউটো-জার্মান সাম্রাজ্য", মার্ক্সিমফ, ৪০৭)

গৃহযুদ্ধ অনন্তকাল ধরে চলে না—কিছুকাল পরে আপনি থেমে যায়। আত্মরক্ষার সহজ প্রবৃত্তি মানুষকে ধ্বংস থেকে বাঁচাবে। কিছুকাল লড়াই করবার পর তারা একটা বোঝাপড়ায় আসবে।

আহার ও সন্তানপালনের প্রয়োজন এবং তার জন্য জমি চাষ করিবার ও ক্ষেতের কাজ চালাইয়া যাইবার প্রয়োজন, গৃহে পরিবার এবং আপন প্রাণ বাঁচাইবার প্রয়োজন, এই সকল প্রয়োজন তাহাদিগকে পরস্পরে আপোস করিতে বাধ্য করিবে। ('একজন ফরাসীর প্রতি পত্র', মার্ক্সিমফ, ৪০৭)

ফতোয়া জারি করে বিপ্লব হয় না, জনতাকে নিষ্ক্রিয় রেখে বিপ্লবীদল আচমকা কেন্দ্রীয় শক্তি দখল করলেও বিপ্লব হয় না। আসল কথা গণ-অভ্যুত্থান। বহু রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটেছে ব্যক্তির নেতৃত্বে। সমাজবিপ্লবে ব্যক্তিনেতৃত্ব অচল, শুধু তাই নয়, এর যে প্রধান লক্ষ্য জনগণের মুক্তিসাধন তার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর।

সমাজবিপ্লব সর্বপ্রকারে রাষ্ট্রবিপ্লবের ঠিক বিপরীত। ইহাতে ব্যক্তির বীর্যবত্তার কোন দাম নাই, জনতার স্বতঃস্ফূর্ত কার্যকলাপই সব। ব্যক্তির কাজ শুধু গণচেতনার অনুসারী চিন্তাধারার বিস্তার, ব্যাখ্যান ও প্রচার, অধিরাম প্রচেষ্টায় জনতার স্বভাবশক্তির বৈপ্লবিক সংগঠন, ইহার অধিক কিছু নয়। বাকি যা কিছু কাজ তাহা জনগণের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। ("পারী কমিউন ও রাষ্ট্র", মার্ক্সিমফ, ৩২)

বিপ্লবের সামনে থাকবে জনতা পিছনে থাকবে নেতৃত্ব। নেতৃত্ব জনতাকে উস্কানি দেবে, কাড়াকাড়ি লুটপাটের কাজ তাদের দিয়ে করিয়ে নেবে। এই কায়দাটি খোলাখুলি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে 'একজন ফরাসীর প্রতি পত্রে'।

জনসাধারণ নিজেরাই যাজকদের উপর হাত তুলিবে আর বিপ্লবী কর্তৃপক্ষ ধর্মীয় স্বাধীনতার নাম করিয়া যাজকদিগকে রক্ষা করিবার ভান করিবে। আমাদের শত্রুদের চালাকি আমরা নকল করিব। দেখ না সরকার বাহাদুররা কেমন বড়-গলায় স্বাধীনতার কথা বলে আর কাজের বেলা তাহারা পুরাদস্তুর প্রতিক্রিয়া-শীল। বিপ্লবী কর্তৃপক্ষও তেমন মিষ্টিকথা বলিতে সংকোচ করিবে না। তাহারা একদিকে যথাসম্ভব শান্তিপূর্ণ ও সংযত ভাষা প্রয়োগ করিবে অন্যদিকে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া যাইবে (মার্ক্সিমফ, ৩১৬)।

যদিও জনশক্তিই বিপ্লবের প্রাণ তবু তাকে সংহতভাবে স্থির লক্ষ্যে পরিচালনা করবার জন্যে বিপ্লবী সংগঠনের প্রয়োজন আছে। এই উদ্দেশ্যে আদর্শে নিবেদিত বিপ্লবীদের নিয়ে গুপ্ত সমিতি গড়তে হবে। এর খসড়া দেওয়া হয়েছে স্বীকারোক্তিতে।

গুপ্ত সমিতিতে থাকিবে তিনটি বিভাগ, পরস্পরে কোন যোগাযোগ ও পরিচয় থাকিবে না। একটি নগরবাসীদের জন্য, একটি তরুণদের জন্য, একটি কৃষকদের জন্য। প্রত্যেক বিভাগ নিজ নিজ শ্রেণীর পরিবেশ অনুযায়ী আন্দোলনের ধারা স্থির করিবে। প্রত্যেক বিভাগ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অধীনে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা মানিয়া চলিবে। সকলের উপরে থাকিবে তিনজন কি বড়জোর পাঁচজন লইয়া একটি কেন্দ্রীয় গুপ্ত সমিতি। বিপ্লব সার্থক হইলে সমিতি ভাঙিয়া দেওয়া

হইবে না, বরং ইহাকে আরও বিস্তার করিয়া শক্তিশালী করিয়া পুনর্গঠনের কাজে বহাল রাখা হইবে (২০৮-০৯ পৃষ্ঠা)।

১৮৬৬ সালে নেপ্‌লস্‌-এ বাকুনিন 'আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃসংঘ' নাম দিয়ে একটি গুপ্ত সমিতি গড়বার চেষ্টা করেন। এর মাথায় ছিল 'আন্তর্জাতিক পরিবার', অধস্তন 'জাতীয় পরিবারগুলির হর্তাকর্তা। প্রত্যেক 'জাতীয় পরিবারে' ছিল কার্যসভা, তার নির্দেশ সভ্যদের নির্বিচারে মানতে হত। জাতীয় কার্যসভা নির্বিচারে মানত কেন্দ্রীয় কার্যসভার নির্দেশ। সভ্য ছিল দুই প্রকার—সক্রিয় কর্মী ও নিষ্ক্রিয় সমর্থক। শেষোক্তরা ধনী ও প্রতিষ্ঠাবান লোক। প্রথমোক্তদের একটি ছোরা স্পর্শ করে শপথ নিতে হত, শপথ ভঙ্গ করলে তার হত চরম দণ্ড। ভ্রাতৃসংঘের ওপর ভার ছিল জনবাহিনীকে পরিচালনা করা এবং বিপ্লবোত্তর কালে যাতে রাষ্ট্রের পুনরাবির্ভাব না হয় তার প্রহরা দেওয়া।

এমন অজস্র পরিকল্পনা বাকুনিনের মাথায় কিলবিল করত। কিন্তু তার মগজের ও কাগজের বাইরে এরা স্থান পেত না, কদাচিৎ বাস্তবে ফুটে উঠলেও বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যেত।

রাষ্ট্রদ্রোহী বিপ্লবের বাহক মধ্যবিত্তরা নয়। মধ্যবিত্তের জাতীয় আশাআকাঙ্ক্ষা বরাবর কৃষাণ ও ভূমিদাসদের মুক্তিকামনার বিরোধিতা করে এসেছে। পোল জাতীয়তার ধুরন্ধরদা দমন করেছে রুথেনীয় ভূমিদাসদের, ম্যাগিয়ার বিদ্রোহীরা ক্রোয়াট কৃষাণদের। বিপ্লবের বাহক হবে গ্রামের চাষী। রুশোর মত বাকুনিনও বিশ্বাস করতেন মানুষের যে স্বাভাবিক সততা সমাজ ও রাষ্ট্রের চাপে বিকৃত হয়ে যায় চাষীদের মধ্যে এখনও তার কিঞ্চিৎ অবশেষ আছে আর এই 'বলিষ্ঠ বর্বর উপাদানে' নতুন সমাজ তৈরি হবে। ছেলেবেলায় দেশের গাঁয়ে তিনি চাষী ও ভূমিদাসদের ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন আর রুশে এই শ্রেণীর লোকই কারখানায় গিয়ে মজুর হত। তাঁর শ্লাভপ্রীতিও তাঁকে আকর্ষণ করত গ্রামের দিকে। রুশের গ্রাম্য কমিউন 'মির'কে ঘিরে ছিল আদিম যুগের যৌথ ভূমিস্বত্বের ঐতিহ্য। এই প্রাচীন বর্বর শক্তির ধারক রুশ মৌজিক পারবে নতুন স্বর্ণযুগ রচনা করতে।

শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা শহরের বিকার থেকে মুক্ত নয়। তাদের সমাজবাদ বুর্জোয়া-ভাবাপন্ন। গ্রামের সরল স্বাভাবিক যৌথজীবনের প্রতি তারা উদাসিক। চাষীও শ্রমিককে বুর্জোয়ার লেজুড় বলে ঘৃণা করে এবং তাতে বিপক্ষরা লাভবান হয়। শ্রমিকচাষীর এই মনোমালিন্য ইয়োরোপের বিপ্লব প্রচেষ্টাকে অসাড় করে ফেলেছে।

একবার যদি চাষীরা বোঝে যে তারা জমি দখল করতে পারবে এবং সে জমি ফিরিয়ে নেওয়া হবে না আর তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ওপর কোন বন্দোবস্ত চাপিয়ে দেওয়া হবে না তাহলেই তারা শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মেলাবে। এতে ব্যক্তিসম্পত্তি ফিরে আসবে এমন আশঙ্কা নেই। যেখানে মালিকানার সরকারী সমর্থন নেই, দায়াধিকার নেই, সেখানে স্বত্ব মানে হবে প্রত্যেকের কিছু কিছু জোত চাষ করার ও ভোগ করার অধিকার।

বাকুনিন বিশ্বাস করতেন ইতালী, স্পেন ও ইংলাণ্ডে সমাজবিপ্লব আসন্ন এবং একবার শুরু হলে তা দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়বে। পশ্চিম ইয়োরোপে বিপ্লবের অগ্রদূত হবে শহরের শ্রমিক, রুশ পোলাণ্ড ও শ্লাভদেশগুলিতে গ্রামের চাষী। পশ্চিম ইয়োরোপের শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে শ্রমিকরা সমাজবিপ্লবের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু

শুধু শ্রমিক অভ্যুত্থান যথেষ্ট নয়। ইহা হইতে একটা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিবে মাত্র আর চাষীদের মধ্যে অনিবার্য হইয়া দেখা দিবে এক স্বাভাবিক ও সংগত

প্রতিক্রিয়া। যদি তাহারা কেবল উদাসীন হইয়া থাকে তাহা হইলেও শহরে নিবদ্ধ বিপ্লবের অকালমৃত্যু হইবে, যেমন সম্প্রতি হইয়াছে ফ্রান্সে।[১০] (ইতালীর বন্ধুদের প্রতি পত্র, ম্যাক্সিমফ, ৩৭৮)

চাষীজাগরণের ওপর বেশি জোর দিলেও বাকুনিন শ্রমিকশক্তিকে উপেক্ষা করেননি। শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্বে শ্রমিক ধর্মঘটের বিপুল সম্ভাবনা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। ধর্মঘট সাধারণ ধর্মঘটে পরিণত হলে সমাজবিপ্লবের সূচনা হয়। এই প্রসঙ্গে "ইন্টারন্যাশন্যাল এলায়েন্স অব সোস্যাল ডিমক্র্যাসী"তে তিনি লিখছেন—

> স্ট্রাইক মানে সংগ্রাম আর সংগ্রামের মধ্য দিয়াই জনগণ সংঘবদ্ধ হয়, সাধারণ শ্রমিক তাহার একঘেয়ে জীবনযাত্রা ঝাড়িয়া ফেলিয়া নিরর্থক নিরানন্দ নিরাসক্ত একাকীত্ব হইতে বাহির হইয়া আসে। সংগ্রাম তাহাকে এক আবেগ ও এক লক্ষ্যের প্রেরণায় অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে মিলাইয়া দেয়…যে সমাজবিপ্লবী প্রবৃত্তি জনগণের হৃদয়ে সুপ্ত হইয়া আছে, যে সম্বন্ধে তাহারা সচেতনও নয়, ধর্মঘট সেই প্রবৃত্তি জাগাইয়া তোলে।…
>
> বুর্জোয়া শ্রেণী ও জনসাধারণের মধ্যে যে ব্যবধান ধর্মঘট তাহা আরো বাড়াইয়া দেয়, ইহা শ্রমিকদিগকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেয় যে পুঁজিপতি ও বিত্তবানদের স্বার্থের সঙ্গে তাহাদের স্বার্থের বৈষম্য আমূল। ধর্মঘট আরো মূল্যবান এইজন্য যে ইহা দলিত শোষিত জনসাধারণের মন হইতে শত্রুর সঙ্গে আপোস মীমাংসার সমস্ত সম্ভাবনা দূর করিয়া দেয়। ইহা বুর্জোয়াদের সমাজবাদ শিকড়সমেত উপড়াইয়া ফেলে এবং জনস্বার্থকে বিত্তবান শ্রেণীর রাষ্ট্রিক ও আর্থিক জালে জড়াইয়া পড়িতে দেয় না। বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক প্রভাব হইতে শ্রমিকদিগকে মুক্ত রাখিতে হইলে ধর্মঘটের অপেক্ষা প্রকৃষ্ট উপায় আর নাই (ম্যাক্সিমফ, ৩৮৪)।

হুবহু সিণ্ডিক্যালিস্টদের কথা। চল্লিশ বছর পরে জর্জ সরেল ঠিক এই ভাষায় এই যুক্তিতে ধর্মঘটের প্রশস্তি করেছেন।

নির্বিশেষ ধ্বংসের উদ্গাতা বাকুনিনেরও মতিভ্রম হয়েছে, দু এক জায়গায় তিনি বিপ্লবোত্তর সংগঠনের কথা উত্থাপন করেছেন। "রাষ্ট্রবাদ ও নৈরাজ্যবাদে" তিনি বিপ্লবীকে ভবিষ্যত সমাজের একটা পরিষ্কার ধারণা করে নেবার জন্যে সতর্ক করে দিচ্ছেন।

> ভবিষ্যতের ধারণা যত স্পষ্ট হইবে বিনাশের শক্তি তত প্রবল হইবে। আর এই ধারণা সত্যের যত নিকটবর্তী হইবে অর্থাৎ বর্তমান সমাজপরিস্থিতির অবধারিত পরিণতির সঙ্গে যত খাপ খাইবে ধ্বংসাত্মক কাজ তত সার্থক ও সফল হইবে। ("প্রটেস্টেশন্স অব দি এলায়েন্স", ম্যাক্সিমফ, ৩৮১)

এলায়েন্সের কার্যক্রমে নববিধানের একটা নক্সা দেবার চেষ্টা হয়েছে। এর মূল নীতি দায়াধিকার রদ, নরনারীর সমান অধিকার, ভূমি পুঁজি ও যন্ত্রের যৌথকরণ[১১], শিল্পীসংঘগুলির যুক্তকরণ, জাতির আত্মস্বাতন্ত্র্য এবং রাষ্ট্রের অবসান। সকলের আগে হবে অর্থনৈতিক

[১০] প্যারী কমিউন ১৮৭১

[১১] কৃষকের ভূমিস্বত্ব নীতির সঙ্গে অসঙ্গতি লক্ষণীয়।

পুনর্গঠন। বিপ্লবের পর প্রথম কাজ নরনারী নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়া, শ্রমিক শোষণ বন্ধ করে শ্রেণীভেদ দূর করা। শ্রমিকসংঘগুলি মূলধন ও যন্ত্র হাতে নেব, গ্রামের চাষী-কমিউনগুলি জমির মালিক হবে ও জমি চাষ করবে। শ্রমিক ও চাষী পরস্পরের চাহিদা মেটাবে, শিল্প ও কৃষির সঙ্গে হাত মেলাবে বিজ্ঞান, চারুকলা ও সাহিত্যের বৃত্তি—সহযোগিতা ও যুক্তকরণের ধাপে ধাপে উঠবে নতুন সমাজ।

সকলকে সমান পরিশ্রম করতে হবে, কেউ সমাজের ঘাড়ে বসে খেতে পারবে না। বড় বড় মনীষীরাও কায়িক শ্রমিক থেকে রেহাই পাবেন না। এতে মনীষার মান কিছুটা নামবে বটে কিন্তু সাধারণ বুদ্ধির মান অনেক ওপরে উঠবে। মনীষীদেরও দেহের ও মনের জোর বাড়বে এবং তাঁদের মধ্যে জনসাধারণের সঙ্গে একাত্মবোধ জন্মাবে। কায়িক শ্রমকে মর্যাদা দান করবার এবং মানুষে মানুষে সমভাব সৃষ্টি করবার এই একমাত্র উপায়।

উত্তরাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হবে বিবাহ ও পরিবার। শাস্ত্র ও আইনের বিবাহ-বন্ধনের জায়গায় আসবে প্রেমের অবাধ মিলন। উভয় পক্ষের সমান অধিকার থাকবে অপর পক্ষের সম্মতি ছাড়া তালাক দেবার। সন্তানদের ওপর বাপমার হক থাকবে না। মাতৃগর্ভে আসবার পর থেকে সাবালক হওয়া পর্যন্ত তাদের ভরণপোষণ ও শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব নেবে সমাজ।

> পিতামাতার অধিকার সীমাবদ্ধ হইবে সন্তানদের ভালবাসায়। বাৎসল্যের জোরে তাহারা যৎসামান্য কর্তৃত্ব খাটাইতে পারিবে, কিন্তু দেখিতে হইবে এই কর্তৃত্ব সন্তানদের নীতিজ্ঞান, বুদ্ধির বিকাশ ও ভবিষ্যত স্বাধীনতায় ব্যাঘাত না জন্মায়। (এলায়েন্সের কার্যক্রম, ম্যাক্সিমফ, ৩২৭)

নতুন সমাজের বনিয়াদ হবে স্বাধীনতা, সরকারী দপ্তরের ছাড়পত্র নেওয়া স্বাধীনতা নয়, বুর্জোয়া উদারনৈতিকদের হিসাব করা মাপাজোখা স্বাধীনতা নয়।

> আমি বলিতেছি স্বাধীনতা নামের যোগ্য খাঁটি স্বাধীনতার কথা, যে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় প্রত্যেকের ভিতরে যে বাস্তব মানসিক ও নৈতিক সম্ভাবনা লুকাইয়া আছে তাহার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ, যে স্বাধীনতা আমাদের স্বভাবগত নিয়মের বাহিরে আর কোন বন্ধন স্বীকার করে না।…
>
> আমি বলিতেছি প্রত্যেক ব্যক্তির সেই স্বাধীনতার কথা যাহা অন্যের স্বাধীনতার সীমান্তে আসিয়া থামিয়া যায় না, বরং অন্যের স্বাধীনতায় সমর্থন লাভ করে, অনন্তে বিস্তৃত হয়, সকলের স্বাধীনতায় মিশিয়া প্রত্যেকের স্বাধীনতা হয় নিরঙ্কুশ, যাহা হইল ঐক্যের স্বাধীনতা, সাম্যের স্বাধীনতা (কেনাফিক, ১৭)।

স্বাধীনতার দুটি দিক আছে। একদিকে ইহা প্রকৃতির নিয়মের প্রতি আনুগত্য, যে নিয়ম আমাদের ভিতরে ও বাহিরে সক্রিয়। অন্য দিকে ইহা সর্ববিধ বহিরাগত মানবিক শাসনের অস্বীকৃতি। মানুষের প্রকৃতি যূথগামী। সুতরাং স্বাধীনতা ব্যক্তিপরায়ণ হতে পারে না।

> প্রথম মানবিক নিয়ম সমাজ-ঐক্য, দ্বিতীয় নিয়ম স্বাধীনতা। দুই নিয়ম পরস্পরে বিজড়িত অবিচ্ছেদ্য এবং ইহাই মানবতার সত্তা। অতএব স্বাধীনতা একতার পরিপন্থী নয়, বরং একতার পরিপূরক, মানবত্বে পরিণতি (এলায়েন্সের কার্যক্রম, ম্যাক্সিমফ, ১৫৬)।

চারদিকে সকলে যখন সমান স্বাধীন তখনই আমার স্বাধীনতা বাস্তব হল। একের স্বাধীনতা অপরের স্বাধীনতার সর্তসাপেক্ষ। দাসপতি স্বাধীন নয় কারণ দাসের মানবত্ব

অবজ্ঞা করে সে নিজের মানবত্ব হারিয়েছে। স্বাধীনতা একটি সামাজিক ধন, সমাজের মধ্যে একে পেতে হয়। সমাজবাদ মানে সমাজসাম্য যা নইলে স্বাধীনতা আসে না।

> সমাজবাদকে বাদ দিলে স্বাধীনতা হইয়া দাঁড়ায় অন্যায় সুবিধা ভোগ। স্বাধীনতাকে বাদ দিলে সমাজবাদ হইয়া দাঁড়ায় দাসত্ব ও পাশবিকতা। ("ফেডারেলিজ্‌ম্‌" ম্যাক্সিমফ, ২৬৯)

মানুষ তখনই নিজেকে স্বাধীন বলে বোধ করবে যখন দেখবে অন্যেও তার মত স্বাধীনতা ভোগ করছে। কারণ বিচ্ছিন্ন একক জীবনে মুক্তির স্বাদ নেই, আদানপ্রদান ও সহযোগিতার ভেতর দিয়ে মানুষ অধিকার অনুভব করে। কাজেই মুক্ত সমাজের গাথুনি হবে সহযোগিতা। বর্তমান আইন কানুন ও বাধ্যবাধকতার বদলে আসবে পরস্পরিক চুক্তি ও স্বেচ্ছায় মিলিত সমিতি সংসদ। স্বাভাবিক প্রয়োজন ও প্রবৃত্তির তাগিদে মিলনের আসর বাড়তে থাকবে। 'লীগ অব পীস এন্ড ফ্রীডম'-এর কংগ্রেসে বাকুনিন সার্বভৌম যৌথ সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন।

> এতদিন সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছে শাসন ও হিংসার জোরে উপর হইতে নীচের দিকে। এবার জনতার স্বার্থ, প্রয়োজন ও স্বাভাবিক আকর্ষণের ভিত্তিতে নূতন সংহতির ইমারত উঠিবে নীচ হইতে উপরের দিকে। ব্যক্তিরা ইচ্ছামত যুক্ত হইবে কমিউনে, কমিউন যুক্ত হইবে প্রদেশে, প্রদেশ যুক্ত হইবে জাতিতে, জাতির মিলনভূমি হইবে ইয়োরোপের যুক্তরাষ্ট্র এবং সর্বশীর্ষে উঠিবে সারা বিশ্বের যুক্তরাষ্ট্র। (ম্যাক্সিমফ, ২৭৪)

যুক্তরাষ্ট্র বস্তুত রাষ্ট্র নয়, নিরাজ গণতন্ত্র। প্রুদঁ ও বাকুনিনের রাষ্ট্রহীন সমাজতন্ত্রের সঙ্গে স্যাঁ সিমঁ, লুই ব্লাঁক ও কার্ল মার্ক্স-এর রাষ্ট্রাশ্রয়ী সমাজতন্ত্রের পার্থক্য মৌলিক। প্রথমটিতে ব্যক্তি থেকে জাতি পর্যন্ত নিরাজ যুক্তসভার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার আছে। এ অধিকার না থাকলে যুক্তসভা কেন্দ্রায়িত রাষ্ট্রে পর্যবসিত হবে। বাকুনিনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এ অধিকার পেয়েও কেউ প্রয়োগ করবে না। পরস্পরে স্বার্থ ও সুবিধার বন্ধন এত নিবিড় যে কেউ সরে যেতে চাইবে না, পারবেও না।

সত্যিই কি বাকুনিন বিশ্বাস করতেন যে বেপরোয়া ভাঙনের পালা শেষ হলে স্বর্গরাজ্য এত সহজে নেমে আসবে? একথা বোঝা যায় যে ভাঙনের কাজ যত নিখুঁত হবে পুরাতন ব্যবস্থার পুনরাবর্তন তত কঠিন হবে। কিন্তু নূতন ব্যবস্থা যে আসবে তার নিশ্চিতি কি? এর উত্তরে বাকুনিন দ্বান্দ্বিক সূত্রের শরণাপন্ন হয়েছেন, বলছেন রাষ্ট্রবাদ হল ভাব, ধ্বংস ও শূন্যবাদ হল প্রতিভাব, উভয়ের দ্বন্দ্বের অবসান হবে নিরাজ গণতন্ত্রের সম্ভাবে। অবশ্য অন্ধ বিশ্বাস ও দর্শনের সূত্র ছাড়াও তাঁর আর একটি ভরসা ছিল—সেটি গুপ্ত সমিতি। নাশযজ্ঞের পর সমিতি হবে ভবিষ্যতের স্রষ্টা, নববিধানের প্রহরী। গুপ্ত সমিতির প্রহরায় ও প্রচেষ্টায় কেমন করে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জনসমিতি গড়ে উঠতে পারে, যে আমলাশাসন রুখবার জন্যে গুপ্ত সমিতি কায়েম হবে তার সঙ্গে বস্তুত এর কোন তফাত আছে কিনা, এসব কূট প্রশ্নের জবাব দেবার দরকার তিনি বোধ করেন নি।

মার্ক্স-এর সঙ্গে বাকুনিনের পঁচিশ বৎসরব্যাপী দ্বৈরথ সমর ইতিহাসে সুপরিচিত। স্বভাবচরিত্রে ও চিন্তাভাবনায় দুজনায় ছিলেন ঠিক বিপরীত। বাকুনিন ছিলেন প্রখর

ব্যক্তিত্বশালী, আবেগপ্রবণ, কর্মচঞ্চল। মার্ক্স ছিলেন ধীর স্থির হিসেবী, দল ও আদর্শের সংগঠনে একাগ্র। বাকুনিনের কথায় ও কলমে আগুন ছুটত, আর পতঙ্গের মত তিনিও ছুটতেন আগুনের দিকে। মার্ক্স হাতাহাতি লড়াই এড়িয়ে চলতেন, পড়তেন আর লিখতেন মত প্রতিষ্ঠার জন্যে। বাকুনিন ছিলেন এনার্কিজ্‌ম্‌-এর যোদ্ধা, মার্ক্স ছিলেন কমিউনিজ্‌ম্‌-এর গুরু। বাকুনিনের মৃত্যুর পর রইল তাঁর কাহিনী ও উপকথা। মার্ক্স-এর মৃত্যুর পর রইল তাঁর মতবাদ ও দলীয় আদর্শ।

দুজনেই ছিলেন দুর্জয় আশাবাদী যা প্রত্যেক বিপ্লবীকে হতে হয়। মার্ক্স মনে করেছিলেন ধনতন্ত্রের দিন ফুরিয়ে এসেছে এবং ইয়োরোপে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব অদূরবর্তী। বাকুনিন ভেবেছিলেন অচিরে সারা ইয়োরোপের রাষ্ট্রকাঠাম ভেঙে পড়বে এবং শতকান্তের আগেই দেখা দেবে নিরাজ সমাজতন্ত্র। উভয়েই বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা পেয়েছিলেন হেগেল ও ফয়েরব্যাক থেকে এবং উভয়েই বিশ্বাস করতেন সমাজদ্বন্দ্বের অবধারিত পরিণাম বিপ্লব।

এ মিল বাহ্য। এর আড়ালে অমিল ছিল গভীর অতলস্পর্শী। ঝগড়ার সূত্রপাত প্রুদঁ ও মার্ক্স-এর মতদ্বন্দ্ব থেকে। এই প্রসঙ্গে ক্রপট্‌কিন বলছেন—'এ ব্যক্তিগত বিবাদ নয়, নীতির বিবাদ, যুক্তকরণ ও কেন্দ্রীকরণ, মুক্ত কমিউন ও রাষ্ট্রকর্তৃত্ব, জনসাধারণের স্বাধীন কর্মপরতা আর আইনের জোরে ধনতান্ত্রিক অনিষ্টের প্রতিকার দুই বিরোধী নীতির দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব ল্যাটিন ও জার্মান ভাবের দ্বন্দ্ব। ফ্রান্সের পরাজয়ের পর জার্মান ভাবের বাহকরা বিজ্ঞান রাষ্ট্রনীতি দর্শন এমন কি সমাজবাদেও তাদের প্রভুত্ব জাহির করতে লাগল, প্রচার করল তাদের সমাজবাদ বৈজ্ঞানিক আর সব সমাজবাদ কাল্পনিক।'[২৮] 'লীগ অব পীস এন্ড ফ্রীডম'-এর কংগ্রেসে (১৮৬৮) বাকুনিন মার্ক্স-এর সঙ্গে তাঁর মৌলিক মতভেদ কোথায় তা স্পষ্ট করে বলেছেন।

> আমি কমিউনিজ্‌ম্‌কে ঘৃণা করি, কারণ ইহা মানুষের স্বাধিকার গ্রাস করে এবং স্বাধিকার বাদ দিয়া আমি মানুষকে ভাবিতে পারি না। আমি কমিউনিস্ট নই কারণ কমিউনিজ্‌ম্‌ রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের জন্য সমাজের যাবতীয় শক্তিকে কেন্দ্রায়িত ও আত্মসাৎ করে, কারণ ইহা অনিবার্যভাবে সকল বিত্ত রাষ্ট্রের মুঠায় আনিয়া দেয়। পক্ষান্তরে আমি চাই রাষ্ট্রের অবসান—যে রাষ্ট্র মানুষের সভ্যতা ও নৈতিক মান উন্নয়ন করিবার অছিলায় এতদিন শোষণ ও অত্যাচার চালাইয়াছে, মানুষকে দাসত্বে পরিণত ও কলুষিত করিয়াছে—তাহার প্রভুত্ব ও অভিভাবকত্বের নিঃশেষ বিলুপ্তি। আমি চাই সমাজ ও যৌথ বিত্ত উপর হইতে কোন প্রকার কর্তৃত্বের শাসনে পরিচালিত হইবে না, পরন্তু স্বাধীন সমবায়ের মাধ্যমে নীচ হইতে উপরে গড়িয়া উঠিবে। রাষ্ট্রের উচ্ছেদ যেমন আমি চাই, তেমন দায়লব্ধ ব্যক্তিসম্পত্তির উচ্ছেদও আমার কাম্য। মহাশয়গণ, আমি এই অর্থে কলেক্টিভিস্ট কিন্তু কমিউনিস্ট নই (কার, ৩৪১)।

মার্ক্স বা বাকুনিন কারও প্রতিনিধিমূলক সরকারে আস্থা ছিল না। তবে দুজনের অনাস্থা জন্মেছিল দুই প্রকারে। মার্ক্স মনে করতেন যে ভোটপ্রথা বুর্জোয়াদের শাসন ও শোষণ কায়েম রাখবার একটা ফিকির। রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের মত গণতন্ত্রও প্রভু-

---

[২৮] মেময়র্‌স্‌ অব এ রিভলিউশনিস্ট, লন্ডন, ১৮৯৯। খণ্ড ২, ১৯২ পৃষ্ঠা।

শ্রেণীর শাসন। বাকুনিনের ধারণাও তাই ছিল, কাজেই তিনি চেয়েছেন সকল তন্ত্র ঘুচিয়ে দিয়ে মুক্ত সমাজ আনতে। তাঁর মতে মার্ক্স-এর সর্বহারার একনায়কত্ব আর বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র উভয়ের সারবস্তু এক—

> অধিক সংখ্যক লোক মূর্খ ও অল্প সংখ্যক লোক বুদ্ধিমান এই অজুহাতে সংখ্যালঘু কর্তৃক সংখ্যাগুরুদের শাসন। ("রাষ্ট্রবাদ ও নৈরাজ্যবাদ", ম্যাক্সিমফ, ২৮৪)

বিপ্লবী একনায়কত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দলনায়কত্ব। এর শাসন আরো কঠোর কারণ এখানে শাসকরা জনতাকে প্রভু বানিয়ে জনতার ইচ্ছা পরিপূরণ করার ভড়ং করে। মার্ক্স ও বিসমার্ক দুই জার্মানের এক জায়গায় সুন্দর মিল আছে—সে হল রাষ্ট্রপূজা।

রাষ্ট্রবাদ ও নৈরাজ্যবাদ দুই আদর্শের গোড়ায় ছিল দুই ভিন্ন বাস্তব পরিবেশ। মার্ক্স-এর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মধ্য ইয়োরোপে যেখানে যন্ত্রশিল্পের প্রসারের ফলে শ্রেণী-সচেতন সর্বহারার সংগ্রাম ঘনিয়ে উঠেছে। বাকুনিনের আকর্ষণ ছিল পূর্ব ইয়োরোপের কৃষিপ্রধান শ্লাভ দেশগুলিতে যেখানে চাষীরা তখনও সামন্ত প্রভুদের ভূমিদাস। মার্ক্স-এর মতে চাষীরা স্বভাবত রক্ষণশীল, তাদের ঝোঁক প্রতিক্রিয়ার দিকে। বাকুনিনের মতে তাদের মধ্যে আছে খাঁটি বিপ্লবশক্তি, শুধু শ্রমিকের হঠকারিতা তাদেরকে বিপক্ষে ঠেলে দেয়।

কম্যুনিস্ট ইস্তাহারে মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্‌ বলেছেন বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ হবে সর্বহারাদের শাসকশ্রেণীর জায়গায় বসানো। বাকুনিন প্রশ্ন করছেন—

> তাহারা কাহাদিগকে শাসন করিবে?...এই নয়া শাসনের নয়া রাষ্ট্রের অধীনে থাকিবে আর এক সর্বহারার দল। হইতে পারে ইহারা ছোটলোক চাষী, মার্ক্স-বাদীদের কাছে যাহাদের বিশেষ খাতির নাই, যাহারা শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর হওয়ার দরুন শহর ও কারখানার শ্রমিকদের তাঁবেদারি করিবে। কিংবা জাতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে হয়ত বা শ্লাভরা ঠিক একই কারণে বিজয়ী জার্মান সর্বহারাদের দাসত্ব করিবে, যেমন ইহারা এখন স্বদেশের বুর্জোয়াদের দাসত্ব করিতেছে। ("রাষ্ট্রবাদ ও নৈরাজ্যবাদ", ম্যাক্সিমফ, ২৮৬-৮৭)

মার্ক্স প্রলিতারিয় রাষ্ট্রের যে ছক এঁকেছেন তার প্রত্যয় স্ববিরোধী। এ যদি জনগণের রাষ্ট্র হয় তবে এ বিলীন হবে কেন? আর যদি এর উদ্দেশ্য হয় জনগণের মুক্তি-সাধন তবে এ জনগণের রাষ্ট্র হয় কেমন করে?

> আপনাকে জীয়াইয়া রাখা ছাড়া একনায়কত্বের আর কোন লক্ষ্য থাকিতে পারে না, যাহারা ইহাকে সহ্য করে তাহাদের মনে দাস্যভাব জন্মানো ছাড়া ইহার আর কোন কাজ হইতে পারে না। কেবল মুক্তি দিয়াই মুক্তি সৃষ্টি করা যায়। ("রাষ্ট্রবাদ ও নৈরাজ্যবাদ," ম্যাক্সিমফ, ২৮৮)

আর একনায়কত্ব কি সত্যিই সর্বহারাদের হাতে থাকবে? তাদের নামে গদিতে বসবে দল। যদিও বা জনকয়েক শ্রমিক সেখানে জায়গা পায় তারা তখন আর শ্রমিক থাকবে না, তারা হবে হুজুর মালিক, প্রতিনিধিত্ব করবে নিজের নিজের। অবশিষ্ট শ্রমিকরা অভাবের চাপে এবং ন্যায্য ভাগবাটোয়ারার আশায় স্বাধীনতা বিসর্জন দেবে। কে তাদের বোঝাবে নিজের স্বাধীন অধিকার ছেড়ে দিলে আর্থিক সমতা ও ন্যায় অপরের দয়ায় পাওয়া যায় না?

> বস্তুত শ্রমিক সাধারণের জন্য ইহা হইবে সেনাবাসের জীবন, যেখানে পুরুষ ও নারী শ্রমিক বাহিনী কলের পুতুলের মত ঢাকের বাদ্যে জাগিবে ঘুমাইবে খাটিবে বাঁচিবে। আর জাতীয় ব্যাঙ্কের টাকা দেশ বিদেশে খাটাইয়া পকেট ভারি করিবার মস্ত সুযোগ আসিবে, ভাগ্যসন্ধানীদের হইবে পৌষ মাস (কেনাফিক, ৫২)।

মার্ক্সের আক্রমণ সম্পত্তি ও শোষণের ওপর, বাকুনিনের আক্রোশ রাষ্ট্র ও শাসনের ওপর। মার্ক্সের মতে রাষ্ট্র যেমন বুর্জোয়ার হাতে শোষণের কল, তেমন শ্রমিকের হাতে হবে শোষণ বন্ধ করবার কল। বাকুনিনের মতে রাষ্ট্রের ধর্ম শোষণের সংরক্ষণ, তার বিপরীত কাজ একে দিয়ে হয় না। রাষ্ট্র বিকল হলে সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি ও শোষণও দূর হবে। মার্ক্সের বিশ্বাস ছিল একনায়কত্বের ফলে শ্রেণীভেদ ঘুচে যাবে এবং তারপর রাষ্ট্র আপনিই লোপ পাবে। বাকুনিনের আশঙ্কা ছিল রাষ্ট্র ক্রমশ বলশালী হবে এবং তার আশ্রয়ে নতুন সুবিধাবাদী শ্রেণী গজিয়ে উঠবে।

রাজনীতির সংঘর্ষ শুধু আদর্শের সংঘর্ষ নয়, তার সঙ্গে আসে চালবাজি ও ষড়যন্ত্রের লড়াই। একাজে দুই মহারথী ছিলেন সমান তৎপর। প্রথম প্রথম বাকুনিন মার্ক্সের চিন্তার মৌলিকতা দেখে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর শ্রদ্ধার অনেকখানি শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। যুগের শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক ও সমাজবাদী পণ্ডিত বলে তিনি মার্ক্সের সুখ্যাতি করেছেন, স্বীকার করেছেন

> সমাজতন্ত্রের প্রতি তাহার অতুল অবদান, আমি তাহাকে জানিবার পর পঁচিশ বৎসর ধরিয়া সে অক্লান্ত ও একনিষ্ঠভাবে যাহার সেবা করিয়া আসিয়াছে এবং যে কাজে আমাদের সবাইকে সে ছাড়াইয়া গিয়াছে (কার, ৩৭০)।

শ্রদ্ধার সঙ্গে অনেকখানি বিদ্বেষের খাদ মেশানো ছিল মার্ক্স শুধু জার্মান ও ইহুদী বলে নয়। আরো যা কারণ ছিল তা প্রকাশ পেয়েছে ১৮৪৮ সালে ব্রাসেল্‌স্‌ থেকে বন্ধু হেরওয়েকে লেখা এক পত্রে।

> জার্মানরা মানে ঐ ধড়িবাজ বার্নস্টেড, মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্‌ বিশেষ করিয়া মার্ক্স তাহাদের অভ্যাসমাফিক অপকর্মের ফন্দি আঁটিতেছে। দম্ভ, বিদ্বেষ, বিবাদ, পরমত-অসহিষ্ণুতা, কার্যক্ষেত্রে কাপুরুষতা আর মতবাদের কচকচানি... একটি শব্দ 'বুর্জোয়া' সর্বদা তাহাদের মুখে লাগিয়া আছে, যদিও তাহারা নিজেরা আপাদমস্তক হাড়ে হাড়ে বুর্জোয়া। এককথায় মিথ্যাচার ও মূঢ়তা, মূঢ়তা ও মিথ্যাচার। ইহাদের সংসর্গে অবাধে শ্বাস প্রশ্বাস লওয়া যায় না (কার ১৪৬)।[১১]

এই প্রশস্তিবাচনের কয়েকমাস বাদে মার্ক্স তাঁর পত্রিকা "নয়া রাইন সমাচারে" এক খবর ছাপলেন,—বাকুনিন রুশের বেতনভোগী গুপ্তচর। দুর্নামটা আগেও ছিল, এবার গায় লেগে রইল আঠার মত।

বাকুনিনের মনের ঝালের সঙ্গে ছিল জাতীয়তার ঝাঁঝ, আদর্শের তর্ক ছাপিয়ে যার উগ্র গন্ধ টের পাওয়া যায়।

---

[১১] বাকুনিনের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত মার্ক্স-এর আর একজন সহকর্মী ঠিক এই বছর তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন : 'নিজের বিষয়ে যথেষ্ট পণ্ডিত বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল এবং সত্যই সে যাহা বলিত তাহা পরিস্কার, যুক্তিসংগত ও মূল্যবান। কিন্তু এমন অপমানজনক, অসহ্য ঔদ্ধত্য আমি আর কোথাও দেখি নাই। যে মত তাহার নিজের মতের সঙ্গে মেলে না তাহাকে ভদ্রভাবে বিচার করিবার সম্মান সে দিত না। কাহারও যুক্তি তাহার ভাল না লাগিলে সে তাহাকে অজ্ঞ মূঢ় বলিয়া তামাসা করিত কিংবা অভিসন্ধির ইঙ্গিত দিয়া তাহার চরিত্রের উপর কটাক্ষ করিত। আমার মনে আছে কী গভীর ঘৃণার সহিত সে 'বুর্জোয়া' শব্দটি উচ্চারণ করিত, বলিত থুতু ফেলার মত করিয়া। যে কেহ তাহার মতের বিরুদ্ধে কথা বলিত তাহাকেই সে 'বুর্জোয়া' বলিয়া গালি দিত—যে গালির অর্থ নৈতিক ও আত্মিক অধঃপাতের একটি নির্ভুল দৃষ্টান্ত।' হ্যাম্পডেন জ্যাকসন : মার্ক্স, প্রুদঁ এন্ড ইয়োরোপীয়ান সোস্যালিজ্‌ম্‌, লন্ডন, ১৯৫৭, ৯৩ পৃষ্ঠা।

> মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্‌ দুই দণ্ডমুণ্ডের কর্তার অধীন জার্মান শ্রমিকদের যে সোস্যাল ডিমক্রেটিক দল, যাতে আছে বেবেল, লাইব্‌নেক্‌ট্‌ এবং জনকয়েক ইহুদী সাহিত্যিক, আমরা আমাদের শ্লাভ ভাইদিগকে তাহাতে ভিড়িতে প্ররোচিত করিব না। আমরা কখনই শ্লাভ সর্বহারাদিগকে ঐ দলে যোগ দিয়া আত্মহত্যা করিতে দিব না, যে দল স্বভাবে, আদর্শে, কার্যপ্রণালীতে জনগণের দল নয় আসল বুর্জোয়ার দল, অধিকন্তু জার্মান অর্থাৎ শ্লাভবিরোধী দল। ("রাষ্ট্রবাদ ও নৈরাজ্যবাদ", ম্যাক্সিমফ, ২৮৩)

জাতিবৈরিতা ছাড়াও দুজনের মধ্যে ছিল ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও মনমেজাজের সংঘাত। কারও ধাতে সমান সাথী সইত না, যারা কাছে আসবে তাদের হতে হবে শিষ্য কিংবা শত্রু। একে অন্যকে কেন বরদাস্ত করতে পারতেন না বাকুনিন তার একটি সুন্দর কৈফিয়ত দিয়েছেন।

> আমাদের মধ্যে কোন সময়ে সত্যিকার অন্তরঙ্গতা ছিল না। আমাদের মেজাজ তাহা হইতে দেয় নাই। সে আমাকে বলিত ভাবপ্রবণ, আদর্শবাদী এবং সে ঠিক বলিত। আমি তাহাকে বলিতাম বিষণ্ণ, দাম্ভিক, বিশ্বাসঘাতক এবং আমিও ঠিক বলিতাম (কার, ১৩০)।

অবশ্য বাকুনিন অত নরম গালাগালি খেয়ে পার পান নি।

১৮৬৮ সালে বাকুনিন 'লীগ অব পীস এণ্ড ফ্রীডম' ভেঙে দিয়ে গড়লেন 'ইণ্টারন্যাশন্যাল এলায়েন্স অব সোস্যাল ডিমক্রেসী'। পরের বছর বাসেলের কংগ্রেসে তিনি দলবল নিয়ে মার্ক্সের আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তিনি এলায়েন্স ভাঙতে চাইলেন না। তাঁর মতলব ছিল এর মারফত আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব হাতে নেওয়া। কিন্তু এ খেলায় মার্ক্স ও তাঁর সাকরেদরা ছিলেন বাকুনিনের চেয়ে পাকা। আন্তর্জাতিক দুর্গে ট্রয়ের ঘোড়াকে ঢোকাবেন এত নির্বোধ তাঁরা ছিলেন না। বাকুনিন নালিশ আনলেন মার্ক্স ও জেনারেল কাউন্সিল

> আন্তর্জাতিককে একটি দানবীয় রাষ্ট্রে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহারা ইহাকে একটি মাত্র সরকারী মতের অধীনে রাখিতে চায়—যে মতের মুখপাত্র এক শক্তিমান কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব।

তিনি মার্ক্সকে এই বলে অভিযুক্ত করলেন যে তিনি জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপন করবার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিককে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছেন।

> যে আন্তর্জাতিক কংগ্রেস তথাকথিত বিপ্লবের স্বার্থে সারা দুনিয়ার সর্বহারাদের উপর এক সর্বশক্তিমান সরকার চাপাইয়া দেয়, ইহাকে তথাকথিত সরকারী নীতির দোহাই দিয়া আঞ্চলিক যুক্তসভা বাতিল করিবার এবং গোটা জাতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা দেয়, যখন এই সরকারি নীতি মিথ্যা ভোটগরিষ্ঠতার জোরে পরম সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত মার্ক্সের ব্যক্তিগত মত ছাড়া আর কিছুই নহে তখন ইহাকে কি বলিব? (কেনাফিক, ৪৫)।

বিভিন্ন দেশের এত রকমারি অবস্থা, স্বার্থ ও চিন্তাধারার বৈচিত্র্য, কয়েকটিমাত্র লোক তা আয়ত্ত করে সারা দুনিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনকে চালনা করবে—এ অতি অসম্ভব কথা।

১৮৭২ সালে হেগ কংগ্রেসে বাকুনিন আন্তর্জাতিক থেকে বিতাড়িত হলেন। সহকর্মীদের নিয়ে সুইজার্ল্যাণ্ডে ঘাঁটি করে তিনি এক পাল্টা আন্তর্জাতিক গড়লেন যার বাঁধুনি হল 'মিত্রতা একতা ও আত্মরক্ষার চুক্তি'। পূর্ববর্তী সংগঠনগুলির মত এরও আয়ু বেশীদিন

রইল না। কিন্তু মার্ক্‌স্‌-এর আন্তর্জাতিক এই ভাঙনের চোট সামলে উঠতে পারেনি। তিনি এর দপ্তর সরিয়ে নিলেন নিউ ইয়র্কে। সেখানে কাঁচের ঘরে তাঁর চারাগাছটি ঝড়ঝাপটা থেকে বাঁচল বটে কিন্তু জলবায়ুর অভাবে শুকিয়ে গেল।

বাকুনিন নিজে যেমন তেমন তাঁর চিন্তাও উচ্ছৃঙ্খল। স্থির হয়ে ভেবে চিন্তে ধারণাগুলিকে সুসম্বন্ধ করে বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলায় প্রকাশ করবার মত ধৈর্য ও সংযম তাঁর ছিল না। তাঁর ভাবনাগুলি বিদ্যুতের মত ক্ষণপ্রভ, চমক লাগিয়ে নিভে যায়, প্রজ্ঞার আলো তাতে নেই। তাঁর দর্শনের সূত্র নির্ধারিত হত তাঁর রাগবিরাগ পছন্দ-অপছন্দ দিয়ে। ইতিহাসের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা, কৃষকের ভূমিস্বত্ব, বৈপ্লবিক কার্যকলাপে ন্যায় অন্যায়ের মাপকাঠি ইত্যাদি প্রসঙ্গে পারিবেশিক অবস্থার চাপে অথবা সাময়িক উচ্ছ্বাসের বশে তিনি উল্টোপাল্টা মন্তব্য করেছেন। তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের চরম দুর্বলতা লক্ষ্য ও উপলক্ষ্যে আমূল অসঙ্গতি। আন্তর্জাতিকের জন্যে তিনি চাইলেন এক শিথিল বিকেন্দ্রিত সংগঠন আর নিজস্ব এলায়েন্সের বেলায় রাখলেন একনায়কত্ব ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা। তাঁর 'আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃসংঘে' কেন্দ্রীয় কার্যসভার ক্ষমতা যে কোন স্বৈরাচারী সরকারের চেয়ে বেশি। একটি বিধিতে জাতীয় কার্যসভাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে

> নিজ নিজ দেশে সংঘের প্রভাব বদ্ধমূল করিবার জন্য এবং নিজ নিজ দেশকে আন্তর্জাতিক শক্তির অসপত্ন পরিচালনায় সমর্পণ করিবার জন্য তাহারা যেন কোনপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে কসুর না করে।

এই আন্তর্জাতিক শক্তি তিনজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির একটি গুপ্ত সভা, সারা দুনিয়ার গণবিপ্লব তারা পরিচালনা করবে। বিপ্লবের পরেও রাষ্ট্রের পুনরাবর্তন রোধ করবার জন্যে তারা বহাল থাকবে। সংঘে আদর্শের বন্ধনের ওপর আছে কেন্দ্রীয় শাসনের নাগপাশ। মার্ক্স চেয়েছিলেন শ্রেণীবিদ্বেষের মাধ্যমে সহযোগিতার সত্যযুগ আনতে, বাকুনিন ভেবেছিলেন রামরাজ্য আনবে গুপ্ত নায়কের আজ্ঞাবাহী যো-হুকুমের দল। তাঁর দল যে মুক্ত সমাজের স্বাধীন নাগরিক গড়বার উপযুক্ত শিক্ষাগার ছিল না তা বলা বাহুল্য।

বিপ্লবীকে হতে হয় স্থিতপ্রজ্ঞ, গভীর মননশীলতায় অচলপ্রতিষ্ঠ। তা নইলে লক্ষ্যে স্থিরতা থাকে না, চিন্তায় সামঞ্জস্য আসে না। বাকুনিনের ছিল না চিত্তসংযম, আত্মসমাধি, তাই বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে তিনি জাতীয়তার নিন্দা করেছেন আর শ্লাভপ্রেমে আত্মহারা হয়েছেন, রাষ্ট্রপ্রভুত্ব ভাঙবার জন্যে বিপ্লবী একনায়কত্বের জয়গান করেছেন। তাই জার নিকলাস অথবা সেনাপতি মুরাভিয়েভকে রুশ বিপ্লবের নায়কত্বে বরণ করতে তাঁর বাধেনি।[২০] চিন্তার শিথিলতা ও চরিত্রের দুর্বলতা তাঁর দর্শনের ইমারতে বারবার ফাটল ধরিয়েছে। দায়াধিকার রদ করবার জন্যে যিনি বিপ্লবী আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে মার্ক্সবাদীদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করেছেন তিনিই অভাবের পীড়নে বারবার ভাইদের তাগাদা দিয়েছেন পিতৃসম্পত্তি ভাগ করে তাঁর পাওনা পাঠিয়ে দেবার জন্যে। আজীবন ব্যক্তিসম্পত্তির ওপর বাক্যবান বর্ষণ করে জীবনসায়াহ্নে এক ভক্ত বন্ধুর টাকায় পরিবার নিয়ে ঘর বাঁধবার জন্যে তিনি পাগল হয়ে উঠলেন। হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় ধ্বংসবাদী জড়বাদী যোদ্ধার মনে পড়ল

[২০] তাঁর সম্বন্ধে রুশের গুপ্তচর বলে অপবাদ এ থেকে প্রশ্রয় পেয়েছে।

সাতাশ বছর আগে ভাগ্‌নারের সংগীত শুনেছিলেন, বললেন 'সব চলে যাবে, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু থাকবে নাইন্‌থ্‌ সিমফনী।' বাকুনিন যখন হেগেলবাদ পেরিয়ে সমাজবাদে আসেন তখন বন্ধু বেলেন্‌স্কী তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন—'সে জন্মেছে এবং মরবে রহস্যবাদী, আদর্শবাদী ও ভাবপ্রবণ হয়ে। দর্শন বদলালেই তো আর মানুষের স্বভাব বদলায় না।' বোধ হয় লেখক নিজেও জানতেন না তাঁর উক্তি এখন অক্ষরে অক্ষরে ফলবে।

বাকুনিনের রক্তে ছিল সংহার ও ষড়যন্ত্রের নেশা। কিন্তু এ কাজে যে নির্মম চরিত্র ও কুটিল বুদ্ধির দরকার তা তাঁর ছিল না। তাঁর হৃদয় ছিল অত্যন্ত কোমল, ন্যায়নীতির বালাইও তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। চক্রান্তের কারুশিল্পেও তিনি ছিলেন স্নেহাত আনাড়ি। প্রশংসায় তিনি গলে যেতেন এবং একজন অপরিচিত লোক তাঁর কাজকর্মের তারিফ করলে তাঁকে সব গোপনকথা বলে ফেলতেন। কখনো বা তিনি সাংকেতিক ভাষায় পত্র লিখে সংকেতটি চিঠির ভেতরই পুরে দিতেন। বিদেশী গুপ্তচর, নেচাএভের মত ধাপ্পাবাজ, কাউকে বিশ্বাস করতে তাঁর আটকাত না। নিজে বাস করতেন এক স্বপ্নের মায়াপুরীতে, গুটিপোকার মত রেশমের কোষ দিয়ে বাস্তবকে আড়াল করে। তাই ছলনায় প্রতারণায় তাঁর আত্মপর ভেদ ছিল না, যত সহজে নিজেকে ঠকাতেন তত অনায়াসে অন্যকে ধাপ্পা দিয়ে চলতেন।

তাই তাঁর তর্ক ও সমালোচনায় কথার ধার যেমন আছে যুক্তির ধার তেমন নেই। ধর্মের ওপর তাঁর আক্রমণ ভল্‌তের ও প্রুদ'র বচনের প্রতিধ্বনি কিংবা স্ট্রাউস ও ফয়েরব্যাকের সমালোচনার পুনরাবৃত্তি। কেবল তাঁর উষ্মা ও কটুতা বেশি। ধর্মের ওপর ঘৃণার বিষেষে তাঁর বিচারশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। তা নইলে তিনি দেখতে পেতেন যে ধর্মের মোহে মধ্যযুগের চার্চ এত অত্যাচার করেছে, সেই ধর্মের প্রেরণায় চার্চদ্রোহী রাষ্ট্রবিরোধী সংগ্রামও হয়েছে একাধিকবার।

সৃষ্টিরহস্যের অন্তরালে বাকুনিন দেখেছেন চিরন্তন বিবর্তন। তাই সমাজবিপ্লবও অবিরাম। এই তত্ত্ব দিয়ে তিনি তাঁর নাশকতার পাগলামিকে দর্শনের সাজ পরিয়েছিলেন। বিপ্লব যদি অবিরাম হয় তা হলে গৃহযুদ্ধ থামবে কেন, নিরাজ সমাজই বা টিকবে কি করে এসব প্রশ্ন তাঁর মনে আসেনি। ইতিহাসের যেমন চণ্ডমূর্তি আছে তেমন শান্তরূপ আছে, যেমন গতি আছে তেমন যতি আছে, বিপ্লবের পাশাপাশি আছে বিরাম ও বিকাশ—এ সহজ ছন্দটি তিনি ধরতে পারেন নি কারণ যা তাঁর মেজাজে পোষায় না তা তাঁর যুক্তিতে আসে না।

যে বিপুল সামাজিক দায়িত্ব এখন কর্তৃত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলো বহন করছে সে দায় কাঁধে নেবার আগে জনতার কোন শিক্ষার দরকার নেই, নূতন অভ্যাস নীতিমান মূল্যবোধ গড়ে তোলার দরকার নেই, কেবল একবার সব নিঃশেষে ভেঙে চুরে দিতে পারলেই ভোজবাজির মত নিরাজ ভ্রাতৃসমাজ এসে হাজির হবে এ বিশ্বাস সম্ভব একমাত্র শিশু ও কবির পক্ষে। মাঝে মাঝে তাঁর খেয়াল হত এ কল্পনা কত অবাস্তব। "স্বীকারোক্তি"-তে তিনি স্বীকার করেছেন—বিপ্লবের সর্বাত্মক নাশকতা ও অবাধ মুক্তি অন্ধ বিশ্বাসে আঁকড়ে ধরা একটা প্রতিজ্ঞা। 'আমার অন্তরের বাণী কানে কানে বলত এ আশা বাতুলতা—সে বাণীকে অমানুষিক চেষ্টায় রুদ্ধ করে আমি আমার প্রতিজ্ঞা বাঁচিয়ে রেখেছিলাম।' সর্বভুক শূন্যবাদের ওপর কোন কিছু দাঁড়াতে পারে না—তখন পশুবল হয় ধ্বংসকর্তার একমাত্র অবলম্বন।

সার্থক বিপ্লবী রহস্য ও রোমাঞ্চের টানে আত্মহারা হয় না। আর বাকুনিন এর পিছনে মাতালের মত ছুটতেন। যখন তিনি পথে পা বাড়াতেন ভাবতেন না পথ তাঁকে কোথায় নিয়ে যাবে। নিজ চরিত্রের এই পাগলামির কথা তাঁর অজানা ছিল না। "স্বীকারোক্তি"-তে

তিনি সুন্দর আত্মপরিচয় দিয়েছেন।

> আমার চরিত্রে একটি মারাত্মক দোষ অন্ভূতের প্রতি আকর্ষণ। গতানুগতিকের বাহিরে দুঃসাহসিক কর্মপ্রয়াস যার সম্মুখে উন্মুক্ত হয় এক অনন্ত দিক্‌চক্রবাল এবং যাহার সীমানা কেহই দেখিতে পায় না, তার টানে আমি আত্মহারা হইয়া যাই।

এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন যদি তাঁর সকল স্বপ্ন সফল হয় তা হলে তিনি কি করবেন। তিনি জবাব দেন 'আমি তৎক্ষণাৎ আমার গড়া জিনিসগুলো ভাঙতে শুরু করব।' ঠিক 'চিরন্তন বিপ্লবী'র মত কথা। এই নির্বোধ বিনাশবৃত্তি, উদ্দেশ্য ও উপায়ের অসংগতি এবং বাস্তববোধের অভাব—এই তিন দোষে বাকুনিনের বিপ্লব সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেল। বন্ধু বিরুভভ তাঁর সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন, 'যতবার তিনি রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিপ্লবের ছক কেটেছেন ততবারই সেই আয়োজন তাঁর কাঁধের ওপর ধ্বসে পড়েছে। সারাজীবন তিনি সিসিফাসের খেলা খেলে গেলেন (কার, ৪৪০)।

তা বলে কি মানুষের মুক্তি-অভিযানে বাকুনিনের কিছুই অবদান রইল না? এ কথা ঠিক নৈরাজ্যবাদী দর্শনে তিনি নূতন কিছু দিয়ে যাননি। কিন্তু কে অস্বীকার করবে একথা যে তাঁর তেজস্বী ব্যক্তিত্ব ও নিরলস সংগ্রাম নৈরাজ্যবাদকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে, পণ্ডিতের আসর থেকে নিয়ে এসেছে ঘোষ্যার কুরুক্ষেত্রে, দার্শনিকের মিনার থেকে নামিয়ে এনেছে পথে ঘাটে বস্তিতে পল্লীতে? বিলধ্বরা দেখেছে তাঁর যুক্তির হেত্বাভাস, দর্শনের দারিদ্র্য, মানুষ শুনেছে সর্বাঙ্গীন বিপ্লবের বাণী, ধ্বংসের আহ্বান, তারা প্রতিশ্রুতি পেয়েছে সাম্রাজ্য নিপাত হবে, রাজমুকুটগুলি খসে পড়বে, ধনীর বিত্ত আসবে গরীবের ঘরে, চাষী পাবে মুক্ত জীবন, ছোট ছোট স্বাধীন গণতন্ত্রের স্বেচ্ছাকৃত সম্মিলনে সৃষ্টি হবে নতুন সমাজ, আর এই উদাত্ত আহ্বানের পিছনে দেখেছে এক আত্মভোলা সর্বত্যাগী পরমক্ষত্রিয়কে। উত্তরকাল তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতারও পরিচয় পেয়েছে। ১৮৪৮ সালে 'শ্লাভদের প্রতি আবেদনে' তিনি অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে শ্লাভরাষ্ট্রগুলির একটি সংহতি সৃষ্টি করবার নক্‌সা দেন। সত্তর বৎসর পরে ১৯১৮ সালে দক্ষিণপূর্ব ইয়োরোপের মানচিত্র সেইভাবে চিত্রিত হল। ১৮৭২ সালে "রাষ্ট্রবাদ ও নৈরাজ্যবাদ"-এ তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন জার্মান ঐক্যের আবেগ জার্মান স্বাধীনতাকে বলি দিয়ে ইয়োরোপে বিভীষিকা সৃষ্টি করবে। পঁচিশ বছরের মধ্যে এই চেতাবনির বাস্তবতা প্রমাণিত হল।

উনিশ শতকের শেষার্ধের সকল প্রকার বিপ্লব আন্দোলনে বাকুনিনের ব্যক্তিত্ব, কৌশল ও চিন্তার ছাপ আছে। তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছে ক্রুপটকিনের নৈরাজ্যবাদ, ফ্রান্সের সিণ্ডিকালিজ্‌ম্‌, রুশের নিহিলিজ্‌ম্‌ ও বলশেভিজ্‌ম্‌।

বাকুনিন প্রুদ'র শিষ্য হলেও তাঁর নৈরাজ্যবাদের নিরিখ আলাদা। প্রুদ'র নৈরাজ্যবাদ প্রজ্ঞানশীল, তার আবেদন বুদ্ধি ও বিবেকে। বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদ বিপ্লবনিষ্ঠ, তার আবেদন সংগঠন ও সংগ্রামে। প্রুদ'র কেন্দ্র ব্যক্তি, বাকুনিনের কেন্দ্র সমাজ। বাকুনিনের কলেক্‌টিভিজ্‌ম্‌ সমর্পিত হল তাঁর উত্তরসূরী ক্রুপট্‌কিনের হাতে, এর নূতন রূপায়ন ও নামকরণ হল এন্যার্কিস্ট কমিউনিজ্‌ম্‌।

নিহিলিজ্‌ম্‌-এর মন্ত্রগুরু বাকুনিন। তাঁর ধ্বংসবাদ শূন্যবাদের ভূমিকা। আবার তারই আহ্বান গিয়ে পৌঁছল এই নৈতিবাদী তরুণদের কানে,—বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহ ছেড়ে গ্রামে যেতে হবে, চাষীদের জাগিয়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে নেচাএভের গর্হিত

ষড়যন্ত্র প্রচেষ্টাও তাঁর কাছে সমান ঋণী, তাঁর রোমাণ্টপ্রীতির এ এক অশুভ প্রতিফলন। তারপর এল যে মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদের দল তাদের সামনেও ছিল এই অকুতোভয় অগ্নিহোত্রী সন্ন্যাসীর জীবন্ত বিগ্রহ।

সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌-এর মন্ত্রগুরু যদিও প্রুদঁ, তবু এর সঙ্গে বাকুনিনের চিন্তার সাদৃশ্য অধিক। শ্রেণীসংগ্রাম ও হিংসার সমর্থন, শ্রমিক ধর্মঘটের শক্তি, রাজনৈতিক দলগঠন ও আন্দোলনে অবিশ্বাস, শিল্পসমবায়ের মালিকানায় কারখানা পরিচালনা ইত্যাদি যাবতীয় সিণ্ডিক্যালিস্ট সূত্র বাকুনিনের রচনায় বিদ্যমান। নিরাজ সমাজের যে রেখাচিত্র তিনি তুলে ধরেছেন শতকের শেষে তাতেই রং দিয়েছেন পেলুতিয়ে ও সরেল।

তারপর বলশেভিজ্‌ম্‌ বা লেনিনবাদ। আলবের কামুঁ-র কথায় বলতে গেলে 'লেনিনের মতবাদে বাকুনিনের দান তাঁর শত্রু মার্ক্‌স্‌-এর চেয়ে কিছু কম নয়। অধিকন্তু বিপ্লবী শ্লাভ সাম্রাজ্যের যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন এবং তার যে চিত্র তিনি জারের সামনে তুলে ধরেছিলেন তা পুংখানুপুংখ প্রতিটি সীমান্তসমেত রূপ পেয়েছে স্টালিনের হাতে'।[২১] বিপ্লবের কৌশল ও দলগঠনের নীতি লেনিন মার্ক্সে-এর চেয়ে বাকুনিনের কাছ থেকে শিখেছেন বেশি। ফরাসী-প্রাশিয়ান যুদ্ধের সময়ে বাকুনিন ফরাসী মজুরদের ডেকে বলেছিলেন এ যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে নিয়ে যেতে। সাতচল্লিশ বছর পরে লেনিন রুশ শ্রমিকদের ডেকে বলেছিলেন ঠিক এই কথা। লেনিনের শ্রেণীসংগ্রামকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া এবং চাষীদের জমি দখল করতে প্ররোচিত করার বিপ্লবী নীতিও বাকুনিনের কাছ থেকে পাওয়া। আদর্শের ঐক্যে ও নিয়মশৃঙ্খলায় দৃঢ়বদ্ধ বিপ্লবী সংগঠনের যে পরিকল্পনা বাকুনিন দিয়েছিলেন তার সার্থক রূপায়ন হয়েছিল বলশেভিক ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যান্য দলে। বিপ্লবী সংঘের ঐক্যবদ্ধ সামরিক নেতৃত্ব, মতবাদে একনিষ্ঠ আনুগত্য, বিপ্লবের পরে অসপত্ন কর্তৃত্ব, এর কাঠাম ও বাইরের সম্পর্ক, এসব লেনিনবাদের পূর্বাভাস। "বিপ্লবের বিতর্কিকা"য় (১৮৬৬) সংগঠনের নিয়মপ্রসঙ্গে প্রত্যেক সভ্যকে স্বাধীন মত ব্যক্ত করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে,

> কিন্তু যে মুহূর্তে কার্যসভা অধিকাংশের মতানুসারে উচ্চতম কর্তৃপক্ষের নামে তাহার বিপক্ষে সিদ্ধান্ত লইবে সেই মুহূর্ত হইতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনমত প্রভাবিত করিবার কোন অধিকার তাহার থাকিবে না।

এই সাংগঠনিক নীতি ধার করে বলশেভিকরা আখ্যা দিয়েছে 'ডিমক্রেটিক সেন্ট্রেলিজ্‌ম্‌' বা 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রায়ন'। বাকুনিন গুপ্ত সমিতির সভ্যদের 'কর্মী' ও 'সমর্থক' দুই ভাগে ভাগ করেছেন। শেষোক্তদের সামনে দাঁড় করিয়ে এবং তাদের নামের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করে সমিতি নিজের কাজ হাসিল করবে। এই কৌশল কমিউনিস্ট দলে চালু হয়েছে এবং এই জয়ঢাক বইবার লোকেরা 'ফেলো-ট্রাভলার' বা সহযাত্রী বলে পরিচিত। "স্বীকারোক্তি"-তে বাকুনিন বলছেন

> আমার বিশ্বাস অন্য যে কোন জায়গা অপেক্ষা রুশে এক সুদৃঢ় একনায়কশক্তি অপরিহার্য যে শক্তির একমাত্র কাজ হইবে চাষীদিগের শিক্ষা ও জীবনের মান উন্নয়ন, যে শক্তির প্রেরণা ও চালনা হইবে অব্যাহত, যাহাতে কোন পার্লামেণ্টারী অধিকার থাকিবে না, যাহা স্বাধীনতার ভাবধারা প্রকাশ করিয়া বই ছাপিবে,

[২১] লাম্‌ রেভল্তে (বিদ্রোহী), অনুবাদ এণ্টনী বাওয়ার, লণ্ডন, ১৯৫৪, ১৩০ পৃষ্ঠা।

> কিন্তু যাহাতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা থাকিবে না, যাহাকে ঘিরিয়া থাকিবে এক-মতাবলম্বী জনতা, যাহা মুক্ত স্বাধীন পঞ্চায়েতী শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত (১৭৯ পৃষ্ঠা)।

বিস্ময়ের কিছু নেই যে বাকুনিনের রচনাবলীর সোভিয়েত রুশ সংকলক য়ুরি স্টেক্‌লভ্‌ পুলকিত হয়ে বলছেন এ চিত্র রাষ্ট্রান্তিক বিপ্লবের নয়, কমিউনিস্ট বিপ্লবের। 'নৈরাজ্যবাদ বলতে যা বোঝায় এ সে বস্তু নয়, বরং এ হল সোভিয়েত শক্তি, সর্বহারার একনায়কত্ব।'[২২] খুবে ভুল তিনি করেননি। ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে লেনিন তিন দফা শ্লোগান দিয়েছিলেন 'চাষীকে জমি দাও', 'মজুরকে কারখানা দাও' আর 'সকল ক্ষমতা যাক পঞ্চায়েতের হাতে'। সেই থেকে শুরু করে স্টালিনের পার্টি শোধন ও কমিউনিস্ট সাম্রাজ্য বিস্তার পর্যন্ত সমস্ত পদক্ষেপের ইঙ্গিত বাকুনিন দিয়ে গেছেন। ম্যাসারিক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'বলশেভিকরা মার্ক্‌স্‌বাদকে নিয়ে বড়াই করে যে তারাই এর একনিষ্ঠ ভক্ত। তারা বোঝে না মার্ক্সের প্রতিদ্বন্দ্বী বাকুনিনের কাছে তাদের ঋণ কতখানি।'[২৩]

নিয়তির কি নির্মম পরিহাস? এই ব্যক্তিই প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে জীবনপণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে মার্ক্সের সর্বহারার একনায়কত্ব এক অভূতপূর্ব স্বৈর-শাসন নিয়ে আসবে, সর্বহারাদের দেবে 'সেনাবাসের স্বাধীনতা'। এই ব্যক্তিই তাঁর সকল স্ববিরোধী উক্তি ও কার্যকলাপ সত্ত্বেও মানবজাতির মুক্তিযজ্ঞের হোমাগ্নিশিখার মত ইতিহাসের পাতা উজ্জ্বল করে আছেন। বাকুনিন ইতিহাসের একটি মূর্তিমান দ্বন্দ্ব। মুক্তি ও ধ্বংস, লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য, আদর্শ ও আবেগ বিপ্লবী আত্মার এই চিরন্তন সংঘাত বাকুনিনের জীবনে সামঞ্জস্যের আস্তরণ চূর্ণ করে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে ফেটে পড়েছে। সেই সংঘাতের চিহ্ন বহন করেছে ইতিহাস, তাতে ধ্বংস হয়েছেন বাকুনিন।

[২২] বাকুনিনের রচনাবলী, খণ্ড ১, ৩৪৫ পৃষ্ঠা।
[২৩] সর লা বলশেভিজ্‌ম্‌, জেনেভা, ১৯২১, ২৯ পৃষ্ঠা।

অচেনা

আলবেয়ার কাম্যু

আমার উকিলের কথা শেষ হতে না হতে সরকারি উকিল প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন—ঠিক কথা। জুরীরা এ স্বীকারোক্তির মূল্য নিশ্চয় বুঝবেন। তাঁরা এই কথাই বুঝবেন যে বাইরের কেউ কফি খেতে দিতে চাইলেও আসামীর পক্ষে তা প্রত্যাখ্যান করাই শোভন ছিল—যিনি তাকে এই পৃথিবীতে জন্ম দিয়েছেন সেই হতভাগিনী মা-র মৃতদেহের প্রতি এতটুকু সম্মান যদি তার মনে থাকত।

দারোয়ান এবার তার জায়গায় গিয়ে বসল।

টমাস পেরেজের ডাক পড়তে আদালতের একজন কর্মচারী তাঁকে হাত ধরে কাঠগড়ায় উঠতে সাহায্য করলেন। পেরেজ তাঁর জবানবন্দীতে বললেন যে আমার মার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও আমায় তিনি মার শেষকৃত্যের দিন ছাড়া আর কখনো দেখেন নি। সেদিন আমার চালচলন কি রকম দেখেছেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন—দেখুন আমি নিজে সেদিন একটু বেশী ভেঙে পড়েছিলাম। কোনো কিছু লক্ষ্য করবার মত অবস্থা আমার ছিল না। মনে এত বেশী আঘাত পেয়েছিলাম যে শেষ কাজের সময় একবার অজ্ঞান-ই হয়ে যাই। এ ছেলেটির দিকে তাই নজরই দিই নি বললে হয়।

সরকারি উকিল পেরেজকে আমায় কাঁদতে দেখেছেন কিনা আদালতে জানাতে বললেন। পেরেজ দেখেন নি বলায় সরকারি উকিল জোর দিয়ে বললেন,—আমার বিশ্বাস জুরীরা এ কথাটাও মনে রাখবেন।

আমার উকিল তৎক্ষণাৎ উঠে পেরেজকে একটু যেন বেশী রূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—ভালো করে ভেবে দেখুন দিকি, আসামী যে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে নি, একথা শপথ করে আপনি বলতে পারেন?

পেরেজ বললেন,—না।

আদালতে কেউ কেউ একথায় একটু হেসে ওঠায় আমার উকিল তাঁর গাউনের একটা হাতা গুটিয়ে নিয়ে কঠিন স্বরে বললেন,—এ মামলা যেভাবে চালান হচ্ছে, এটা তার একটা উদাহরণ। সত্যি ঘটনা কি তা বার করবার কোনো চেষ্টাই নেই।

সরকারি উকিল এ মন্তব্য গ্রাহ্যই করলেন না। যেন এ ব্যাপারে তাঁর কোনো গা-ই নেই এইভাবে তাঁর নথির ওপরকার কাগজে তিনি তখন পেন্সিল ঠুকছেন।

পাঁচ মিনিটের জন্যে আদালতের কাজ বন্ধ রইল। আমার উকিল সেই অবসরে আমায় জানালেন যে আমার মামলা ভালোর দিকেই যাচ্ছে।

এবার ডাক পড়ল সিলেস্তির। আসামী পক্ষ, মানে আমার তরফে সে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াল।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সিলেস্তি মাঝে মাঝে আমার দিকে চাইছিল। মাথায় পানামা টুপিটা সাক্ষ্য দিতে দিতে সে দুহাতে টিপছিল। তার সবচেয়ে ভালো স্যুটটা সে পরে এসেছে। এইটে পরেই মাঝে মাঝে রবিবার আমার সঙ্গে সে ঘোড়দৌড়ের মাঠে যেত। গলার কলারটা অবশ্য সে লাগাতে পারে নি। সার্টের গলাটা শুধু একটা পেতলের বোতাম

দিয়ে আটকানো দেখলাম। আমি তার একজন খদ্দের কিনা জিজ্ঞাসা করায় সে বললে যে শুধু খদ্দের নয় আমি তার বন্ধুও বটে। আমার সম্বন্ধে কি তার ধারণা প্রশ্ন করায় জানালে যে আমি লোক ভালো। কথাটা বুঝিয়ে দিতে বলায় সে বললে যে এ কথার মানে সবারই বোঝা উচিত।

আমি চাপা গোছের মানুষ কিনা জানতে চাওয়ায় সে বললে,—না, আমি তা বলি না। তবে অনেকের মত অকারণে বকবক করে না।

সরকারি উকিল জিজ্ঞাসা করলেন, আমি রেস্তোরার মাসিক পাওনা ঠিকমত বরাবর চুকিয়ে দিই কিনা।

সিলেস্তি হেসে উঠে বললে,—হ্যাঁ ঠিক মতই চুকিয়ে দেয়, তবে পাওনা গণ্ডার ওসব হিসেব আমাদের দুজনের নিজস্ব ব্যাপার।

খুনের অভিযোগ সম্বন্ধে তার ধারণা কি এবার তাকে জিজ্ঞাসা করা হল।

কাঠগড়ার রেলিং-এর ওপর যেভাবে সে হাত রাখল তাতে বোঝা গেল একটা বক্তৃতা সে তৈরি করেই এনেছে।

সে বলতে শুরু করলে,—আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা নেহাত আকস্মিক দুর্ঘটনা, বলতে পারেন। হঠাৎ এরকম সময়ে মানুষ কেমন বেসামাল হয়ে যায়।

আরো কিছু বলার ইচ্ছে তার ছিল, কিন্তু বিচারক তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—তাই বটে। আচ্ছা ধন্যবাদ।

এক মুহূর্তের জন্যে সিলেস্তি যেন কেমন হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর সে বোঝাবার চেষ্টা করলে, যে তার কথা এখনো শেষ হয়নি।

আদালত থেকে তাকে সংক্ষেপে সারবার অনুমতি দেওয়া হল। কিন্তু ব্যাপারটা নেহাৎ আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু নয়—এর বেশী আর কিছু সে বলতে পারল না।

তা হতে পারে।—বলে বিচারক মন্তব্য করলেন,—কিন্তু আমরা এখানে আইন অনুসারে এই ধরনের দুর্ঘটনার বিচারই করতে বসেছি। আপনি এখন বসতে পারেন।

সিলেস্তি ফিরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাল। তার চোখের পাতা ভিজে, ঠোঁট কাঁপছে। তার ভাব দেখে মনে হল সে যেন বলতে চাচ্ছে,—তোমার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম ভাই। লাভ কিছু হল না বলেই ভয় হচ্ছে। সত্যি আমি দুঃখিত।

কিছুই আমি বললাম না, একটু নড়লাম না পর্যন্ত, কিন্তু জীবনে এই প্রথম মনে হল একটি পুরুষমানুষকে আমি জড়িয়ে চুমু খেতে পারি।

বিচারক আবার তাকে নেমে যেতে বলায় সিলেস্তি ভিড়ের মধ্যে তার জায়গায় গিয়ে বসল। যতক্ষণ তারপর মামলার শুনানি চলল, হাঁটুর ওপর কনুইভর দিয়ে পানামা টুপিটা হাতে ধরে ঝুঁকে পড়ে যে-রকম ব্যগ্রভাবে সে বসে রইল তাতে মনে হল একটা কথাও সে না শুনে ছাড়ছে না।

এবার মারীর পালা। সে টুপি মাথায় দিয়ে এসেছে। বেশ ভালোই তাকে দেখাচ্ছিল, তবে আমার তাকে খোলা চুলেই বেশী ভালো লাগে। আমি যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে মাঝে মাঝে তার বুকের নরম ডৌল আর তার নিচের ঠোঁটের সেই আদুরে উল্টোন ভাবটুকু দেখতে পাচ্ছিলাম। ঐ দেখে আমি বরাবর মুগ্ধ হয়েছি। মনে হচ্ছিল সে বেশ ঘাবড়ে গেছে।

প্রথম প্রশ্ন তাকে করা হল, কতদিন সে আমায় জানে। সে বললে আমাদের অফিসে

কাজ করবার সময় থেকে। আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কি বিচারক জানতে চাইলেন। মারী জানালে সে আমার বান্ধবী। আর একটি প্রশ্নের জবাবে সে আমায় বিয়ে করতে রাজী হওয়ার কথা স্বীকার করলে।

সরকারি উকিল তাঁর নথিপত্র দেখতে দেখতে বেশ একটু চড়া গলায় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের ঘনিষ্ঠতাটা কবে থেকে শুরু হয়েছে। মারী তারিখটা জানালে।

সরকারি উকিল নেহাৎ যেন সাধারণভাবে বললেন,—তার মানে আসামীর মায়ের শেষ কৃত্যের পরের দিন।

কথাটা বেশ ভালো করে জুরীদের মনে বসতে দিয়ে তিনি একটু বিদ্রূপভরে বললেন যে প্রসঙ্গটা যদিও ঠিক প্রকাশ্য আলোচনার নয়, এবং তরুণী সাক্ষীর মনের অবস্থা যদিও তিনি বোঝেন তবু কর্তব্যের খাতিরে যা কিছু সঙ্কোচ তাঁকে জয় করতে হচ্ছে। শেষ কথাগুলো বলবার সময় তাঁর কণ্ঠ কঠিন হয়ে এল।

এই ভূমিকাটুকুর পর মারীকে আমাদের প্রথম দিনের মিলনের সম্পূর্ণ বিবরণ তিনি দিতে বললেন। মারী প্রথমে কিছু বলতে চাইলে না। কিন্তু সরকারি উকিল ছাড়বার পাত্র নয়। মারী তখন বললে যে স্নান করতে গিয়ে আমাদের দেখা হয়, তারপর আমরা সিনেমায় ছবি দেখতে যাই ও শেষে সে আমার বাসায় আসে।

সরকারি উকিল এবার আদালতকে শোনালেন যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মারী যে জবানবন্দী দিয়েছিল তা দেখে তিনি সেই দিন নানা সিনেমায় যে সব ছবি দেখান হয়েছিল তার খোঁজ নিয়েছেন।

মারীর দিকে ফিরে কি ছবি আমরা সেদিন দেখেছি তিনি জানতে চাইলেন।

মৃদু গলায় মারী বললে যে, সে ছবিতে ফার্ণান্ডেল অভিনয় করেছিল।

মারীর কথা যখন শেষ হল তখন আদালতে আলপিন ফেললে শোনা যায়।

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে সরকারি উকিল আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে এমন ভাবে কয়েকটি কথা এবার বললেন যে তিনি সত্যি সত্যি মর্মাহত হয়েছেন বলে আমার মনে হল।

তিনি বললেন,—জুরীদের কাছে আমার নিবেদন এই যে মা-র শেষ কৃত্যের পর দিনই আসামী যে সাঁতার কাটতে গেছে, একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম জমিয়েছে ও একটা হাসির ছবি দেখতে গেছে এইটুকু আপনারা মনে রাখবেন। আমার আর কিছু বলবার নেই।

সরকারি উকিল বসবার পর আদালতে আবার সেই নিস্তব্ধতা। হঠাৎ মারী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

উনি যা বুঝেছেন সব ভুল,—সে বলতে লাগল—সত্যি ওরকম মোটেই কিছু হয়নি। সে যা বলতে চেয়েছিল সরকারি উকিল জবরদস্তি করে তার ঠিক উল্টোটা তাকে বলতে বাধ্য করেছে, এই তার বক্তব্য। সে আমাকে ভালো করে জানে। আমি অন্যায় কিছু করি নি এ তার দৃঢ় বিশ্বাস।

মারী আরো অনেক কিছুই বলে যাচ্ছিল। শেষে প্রধান বিচারপতির ইঙ্গিতে আদালতের একজন কর্মচারী তাকে ধরে নামিয়ে নিয়ে গেলেন। আবার শুনানি চলল।

পরের সাক্ষী ম্যাসন। তার কথায় কেউ যেন কান-ই দিলে না মনে হল। সে বলতে চাইলে যে আমি শুধু ভদ্রই নয় সত্যি ভালো ছেলে।

সালামানো যখন তারপর এসে আমি তার কুকুরটার ওপর বরাবর কি রকম মায়া দেখিয়েছি জানালে তখন তার কথাও কেউ যেন গ্রাহ্যই করলে না। এমন কি আমার মার

কথা ওঠায় সে যখন বললে যে মার সঙ্গে আমার তেমন কোন বিষয়ে মিল ছিল না বলেই মা-কে আমি আশ্রমে রেখেছিলাম তখনও তার কথা মাঠেই মারা গেল।

—আপনাদের বোঝা উচিত, সে দুবার বললে। কিন্তু কেউ যেন বুঝতেই পারল না। তাকে নেমে যেতে বলা হল।

এর পর শেষ সাক্ষ্য দিতে এল রেমণ্ড। সে হাত নেড়ে আমায় সম্ভাষণ জানিয়ে প্রথমেই বললে যে আমি নির্দোষ।

বিচারপতি তাকে বকে উঠলেন,—আপনি এখানে সাক্ষ্য দিতে এসেছেন, এ মামলা সম্বন্ধে আপনার মতামত জানাতে নয়। আপনাকে যা প্রশ্ন করা হবে তার উত্তর দেওয়া ছাড়া বেশী কিছু বলবেন না।

খুন হওয়া লোকটির সঙ্গে তার সম্বন্ধটা বুঝিয়ে দিতে বলায় রেমণ্ড সেই সুযোগ নিয়ে জানাল যে আমার বিরুদ্ধে নয় তার বিরুদ্ধেই নিহত লোকটির রাগ ছিল, কারণ সে তার বোনকে মারধর করেছিল।

বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ওপর ও নিহত লোকটির আক্রোশ হবার কোন কারণ ছিল কিনা। রেমণ্ড তাতে জানালে যে সেদিন সকালে সমুদ্রের চড়ায় আমার যাওয়াটা নেহাৎ দৈবাৎ।

সরকারি উকিল জিজ্ঞাসা করলেন যে তাহলে এই দুর্ঘটনার যা মূল সেই চিঠিটা আসামীর হাতে লেখা হল কেন?

রেমণ্ড বললে যে এ ব্যাপারটাও আকস্মিক।

সরকারি উকিল তাতে বলে উঠলেন যে এ মামলায় 'ঘটনা চক্র' 'দৈবাৎ' প্রভৃতির বড় ছড়াছড়ি দেখা যাচ্ছে। রেমণ্ড যখন তার রক্ষিতাকে মারধর করে তখন আসামী যে বাধা দেয়নি সেটা কি দৈবাৎ? আসামী যে থানায় রেমণ্ডের কথা সমর্থন করে তার হয়ে সাউথ্রড়ি করে সেটাও কি সুবিধে মত ঘটনাচক্র বলে ধরতে হবে?

শেষে সরকারি উকিল জানতে চাইলেন রেমণ্ড কি করে।

রেমণ্ড জাহাজী মাল-গুদামে কাজ করে বলায় সরকারি উকিল জুরীদের জানালেন যে সাক্ষীর আসলে জীবিকা হল পতিতাদের রোজগারে ভাগ বসানো, আর আমি হলাম তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর সঙ্গী। সত্যি কথা বলতে কি এই খুনের পেছনে যে সব ব্যাপার আছে তা অত্যন্ত জঘন্য রকম নোংরা। সমস্ত আরো কুৎসিত করে তুলেছে আসামীর চরিত্র—সে এমন একটা নরাধম পিশাচ যার নীতিবোধের কোন বালাই-ই নেই।

রেমণ্ড আপত্তি জানাতে লাগল। আমার উকিলও প্রতিবাদ করলেন। সরকারি উকিলকে তাঁর বক্তব্য শেষ করতে দিতে হবে এই কথাই তাদের জানান হল।

আমার আর বেশি কিছু বলবার নেই জানিয়ে সরকারি উকিল রেমণ্ডের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন,—আসামী কি আপনার বন্ধু?

—নিশ্চয়। আমরা যাকে বলে প্রাণের বন্ধু ছিলাম।

সরকারি উকিল এবার আমাকেও ওই প্রশ্ন করলেন।

আমি রেমণ্ডের দিকে সোজা তাকিয়ে রইলাম। সে দৃষ্টি ফেরাল না।

তখন জবাব দিয়ে বললাম,—হ্যাঁ।

সরকারি উকিল এবার জুরীদের দিকে ফিরলেন। বললেন,—আপনাদের সামনে কাঠগড়ায় যে দাঁড়িয়েছে মায়ের শেষ কাজের পরদিনই সে শুধু জঘন্য সব নারকীয় স্ফূর্তি

নিয়ে মাতে নি, গণিকা আর তাদের দালালদের জগতের অতি ঘৃণ্য এক প্রতিহিংসা মেটাতে বিনা উত্তেজনায় একটি মানুষকে খুন করেছে। আসামী কি চরিত্রের মানুষ আপনারা বুঝতেই পারছেন।

সরকারি উকিল বসতে না বসতেই আমার উকিল অধৈর্যের সঙ্গে তাঁর হাত দুটো এমন উঁচু করে তুলে ধরলেন যে জামার হাতগুলো নেমে গিয়ে তাঁর সার্টের কফ্ পুরো বেরিয়ে পড়ল।

আমার মক্কেলের কোন অপরাধের বিচার হচ্ছে, মা-কে কবর দেওয়ার না মানুষ খুন করার? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

আদালতে চাপা হাসির আওয়াজ শোনা গেল।

সরকারি উকিল এবার লাফিয়ে উঠে গাউনটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বললেন যে এ মামলার এ দুটি দিকের মধ্যে সম্বন্ধ যে কি তা আমার উকিল ধরতে না পারায় তিনি বিস্মিত। সম্বন্ধটা এক হিসাবে মনের ক্রিয়া ঘটিত বলা যায়। এক কথায়,—সরকারি উকিল কথাগুলোতে বেশ জোর দিয়ে বললেন, আসামীর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ এই যে মার শেষ কাজের দিন যে ব্যবহার সে করেছে তাতে বোঝা যায় তখনই মনে মনে সে অপরাধী।

আদালতের লোকজন ও জুরীদের মনে কথাগুলি বেশ দাগ কাটল মনে হল। আমার উকিল শুধু ঘাড়টায় একটু ঝাঁকুনি দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। বাইরে যাই দেখান ভেতরে তিনিও বেশ একটু বিব্রত হয়েছেন সন্দেহ নেই। আমারও মনে হল মামলাটা আমার পক্ষে খুব ভালো রাস্তায় যাচ্ছে না।

এর খানিকটা পরেই সেদিনকার মত বিচার শেষ হল। আদালত থেকে জেলখানার গাড়িতে আমায় নিয়ে যাওয়ার সময় বাইরের গ্রীষ্মসন্ধ্যার পুরানো মাধুর্যটি একটু যেন অনুভব করতে পারলাম। অন্ধকার গাড়ির ভেতর বন্দী অবস্থায় মনে হল আমার ক্লান্ত মস্তিষ্কের ভেতর আমার প্রিয় শহরের সমস্ত পরিচিত শব্দ যেন প্রতিধ্বনি তুলছে। সন্ধ্যার বাতাসে এর মধ্যেই একটা অবসাদের আভাস এসেছে। তার ভেতর হকার ছোকরারা হেঁকে হেঁকে খবরের কাগজ ফিরি করছে শুনলাম। পার্কগুলো থেকে পাখিদের শেষ কিচির-মিচির কানে এল। স্যাণ্ডউইচ যারা ফিরি করে তাদের ডাক, শহর যে দিকে উঁচু সেখানকার খাড়া বাঁকগুলোতে ট্রামের কর্কশ চাকার আওয়াজ, আর বন্দরের ওপর অন্ধকার নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে সেই মৃদু মর্মর ধ্বনি—সব মিলে আমার জেলখানায় ফিরে যাওয়া অজস্র স্মৃতিতে ভরে তুলল। এ যেন অতি পরিচিত রাস্তায় কোন অন্ধের যাত্রা।

হ্যাঁ সন্ধ্যায় এই সময়টিতেই—সে যেন কতকাল আগে—আমি বরাবর একটি অপূর্ব প্রশান্ত তৃপ্তি অনুভব করেছি। এই সন্ধ্যার পর জানতাম আসবে স্বপ্নহীন ঘুমের রাত।

সেই সময়টিই এসেছে কিন্তু কত তফাত। এখন ফিরছি আমার জেলের কুঠুরীতে। সেখানে যে রাত আসছে তা আগামী দিনের দুর্ভাবনায় কণ্টকিত। আজ এই কথাটিই বুঝলাম যে গ্রীষ্মের গোধূলি বেলায় বহু স্মৃতিজড়িত পথ নিশ্চিন্ত নিদ্রার রাত্রির দিকে যেমন তেমনি জেলখানাতেও নিয়ে যেতে পারে।

আসামীর কাঠগড়ার থেকেও নিজেকে আলোচিত হতে শুনলে মজা লাগে। সরকারি ও আমার উকিলের বক্তৃতায় আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হয়েছে। আমার অপরাধ

সম্বন্ধে যত না আলোচনা হয়েছে তার চেয়ে বেশি হয়েছে আমার ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে।

দুই উকিলের বক্তৃতার মধ্যে খুব বেশি কিছু তফাত সত্যি নেই। আসামীর উকিল শূন্যে হাত তুলে অপরাধ কবুল করে তার কারণ দেখাতে চেয়েছেন। সরকারি উকিলও সেই ভঙ্গী করে আসামীকে অপরাধী বলেছেন। এ অপরাধের কোন বাহ্যিক কারণ থাকতে পারে তিনি মানতে রাজী নন।

বিচারের এই পর্বে একটা ব্যাপার বড় বিশ্রী লেগেছে। আর সকলের কথা শুনতে শুনতে প্রায়ই দু একটা কথা নিজে থেকে বলতে লোভ হয়েছে। কিন্তু আমার উকিল আমায় নিষেধ করেছেন। আমায় সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, তাতে আমার মামলায় সুবিধে হবে না। মনে হচ্ছিল বিচারের সব কিছু থেকে আমায় বাদ দেবার যেন একটা ষড়যন্ত্র চলছে। আমার নিয়তির যেখানে হেস্তনেস্ত হচ্ছে সেখানে আমার কিছু বলার উপায় নেই।

এক এক সময়ে খুব কষ্ট করে নিজেকে সামলাতে হয়েছে। হঠাৎ অদম্য ইচ্ছে হয়েছে সকলকে থামিয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠি,—বলি বিচারটা হচ্ছে কার? আমি জানতে চাই। খুনের দায়ে কাঠগড়ায় দাঁড়ান খেলার কথা নয় আর আমার সত্যিকার জরুরি কিছু জানাবার আছে।

কিন্তু তারপর একটু ভেবে নেবার পর মনে হয়েছে সত্যিই বলবার তো কিছুই আমার নেই। আমার দিক থেকে স্বীকার করছি যে নিজের সম্বন্ধে আলোচনাতেও কিছুক্ষণ বাদে আর মন লাগে না। সরকারি উকিলের বক্তৃতাতে তো কিছুক্ষণ বাদেই বিরক্তি ধরে গেল। মাঝে মাঝে দু একটা বুকনি তাঁর অঙ্গভঙ্গি আর খুব ফলাও কিছু গালাগাল যা একটু আধটু মনে রইল।

খুনটা আগে থাকতেই আমি এঁচে রেখেছিলাম এই দেখানই সরকারি উকিলের উদ্দেশ্য বুঝলাম। মনে পড়ছে, একবার তিনি জুরীদের উদ্দেশ করে বললেন যে তাঁর কথাটা অক্ষরে অক্ষরে তিনি প্রমাণ করতে পারেন।

—প্রথমে খুনের ঘটনাগুলো ধরুন, যা দিবালোকের মত স্পষ্ট। তারপর যাকে বলা যায় এ মামলার অন্ধকার দিকটাও বুঝুনে—এক পাষণ্ডের মনের বিচিত্র গতি সেখানে পাবেন।

আমার মা-র মৃত্যু থেকে পর পর সমস্ত ঘটনাগুলো এবার সরকারি উকিল সংক্ষেপে সাজিয়ে গেলেন। আমার নির্মমতার ওপর জোর দিয়ে মা-র বয়স বলতে না পারার কথা তুলে, সাঁতার কাটতে গিয়ে মারীর সঙ্গে সাক্ষাত, ফার্ণণ্ডেল-এর হাসির ছবি দেখতে যাওয়া ও মারীকে আমার ঘরে নিয়ে আসা পর্যন্ত কিছু উল্লেখ করতে ভুললেন না। তারপর রেমণ্ডের কথা পাড়লেন। যে ভাবে ঘটনাগুলো তিনি বললেন তাতে ভেতরে ভেতরে একটা চালাকি আছে মনে হল। তাঁর কথাগুলো শুনলে বিশ্বাস হয়। আমি রেমণ্ডের সঙ্গে সড় করে তার রক্ষিতাকে ফন্দি করে তার ঘরে আনাবার জন্যে চিঠি লিখেছি। যাকে দিয়ে সেই মেয়েটিকে মার-ধোর খাইয়েছি সেই রেমণ্ডের চরিত্র কি রকম তা ব্যাখ্যা করে সরকারি উকিল বললেন যে রেমণ্ডের সঙ্গে যাদের ঝগড়া তাদের আমি খুঁচিয়ে একটা গোলমাল বাধিয়েছি। রেমণ্ড তাতে আহত হয়েছে। তার রিভলভার চেয়ে নিয়ে গুলি করবার জন্যেই আমি ফিরে গেছি। একবার গুলি করে আমি একটু অপেক্ষা করেছি, তারপর একেবারে কাজে কোন খুঁত না রাখবার জন্যে পরপর আরো চারবার গুলি যখন ছুড়েছি তখন উত্তেজনার কিছু ছিল না, রক্ত গরম হবার কোন কারণও নয়।

—আমার এর বেশি কিছু বলবার নেই। সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে আসামী যে এই

খুন করেছে ঘটনাগুলি থেকে আমি তা দেখিয়ে দিয়েছি। হঠাৎ মাথা গরম হয়ে এ খুন হয়নি, তাহলে অন্তত আসামীর স্বপক্ষে কিছু বলার থাকত। আসামী যে শিক্ষিত তা জুরীদের আমি মনে রাখতে বলি। সে বুদ্ধিমান, ভাষার মূল্য বোঝে। আমার জেরার জবাব যেভাবে সে দিয়েছে তা নিশ্চয় আপনারা লক্ষ্য করেছেন। আমি আবার বলছি—যে খুন করার সময় কি করছিল সে বুঝতে পারে নি এ অনুমান কোন মতেই করা চলে না।

দেখলাম আমার বুদ্ধির ওপর সরকারি উকিল খুব জোর দিলেন। সাধারণ লোকের বেলা যেটা গুণ, অপরাধী হিসাবে যে অভিযুক্ত তার বেলা সেইটেই অপরাধের মস্ত প্রমাণ কেন ধরা হয় বুঝতে পারলাম না। এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই সরকারি উকিলের পরের কয়েকটা কথা শুনতে পাই নি। হঠাৎ চমকে উঠে শুনলাম তাঁর ঘৃণাভরে তিনি বলছেন, আর এই নৃশংস হত্যার জন্যে একবারও তার একটু অনুশোচনা আমরা দেখেছি? একটি কথাতেও না। এই মামলার সমস্ত শুনানির মধ্যে তার এতটুকু অনুতাপের পরিচয় পাওয়া যায় নি।

কাঠগড়ায় আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে সেই সুরেই আরো অনেক কিছুই বলে চললেন। ওই এক কথাই বারবার বলার কি মানে বুঝতে পারছিলাম না। তিনি বেঠিক কিছু বলেন নি অবশ্য স্বীকার করছি। খুব বেশি অনুতাপ যে আমার হচ্ছিল তা বলতে পারি না। তবে উনি যেন একটু বাড়াবাড়ি করছিলেন। সুযোগ থাকলে তাঁকে আন্তরিকতার সঙ্গে বুঝিয়ে বলতাম যে জীবনে কোন কিছুর জন্যে খুব আফশোষ কখনো আমার হয় নি। যা হচ্ছে আর হবে তাইতেই সাধারণত আমি এত মঙ্গল থাকি যে পিছু পানে চাইবার-ই আমার ফুরসত থাকে না। অবশ্য আমার যা অবস্থা তাতে কারুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সুরে কথা বলাই আমার অসম্ভব। কারুর প্রতি প্রীতি দেখানো কি মনে কোন সদিচ্ছা থাকার যেন আমার অধিকারই নেই।

সরকারি উকিল এখন আমার 'আত্মা'র কথা বলছিলেন। তাঁর কথায় মন দেবার চেষ্টা করলাম।

তিনি বললেন যে আমার ওই বস্তুটি নাকি তিনি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত জেনেছেন যে ওই বস্তুটিরই আমার অভাব। সত্যি আমার আত্মা বলে কিছু নেই। সবই আমার অমানুষিক। যে সব নীতিবোধ সাধারণ মানুষের থাকে তার কোন চিহ্ন আমার মধ্যে পাওয়া যায় না।

—এর জন্যে, তিনি যেন আমার স্বপক্ষেই বললেন, ওকে অবশ্য নিন্দা করা যায় না। এ বস্তু অর্জন করা যদি কারুর ক্ষমতার বাইরে হয় তাহলে তা না থাকার জন্যে তাকে দোষী করা উচিত নয়। তবে ফৌজদারী আদালতে উদার সহিষ্ণুতার আদর্শ অচল। আরো মহত কঠিন সুবিচারের আদর্শই এখানে অনুসরণীয়। বিশেষ করে সেই মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণ সুপ্রবৃত্তি ও নীতিবোধের অভাবে যে মানবসমাজের শত্রু।

আবার আমার মার প্রতি ব্যবহারের আলোচনা চলল। এত কথা আমার অপরাধ সম্বন্ধে তিনি বলে চললেন যে আমি ক্রমশ থেই হারিয়ে ফেললাম। শুধু তখন টের পাচ্ছিলাম যে গরম ক্রমশ বাড়ছে।

কিছুক্ষণ বাদে সরকারি উকিল একবার হঠাৎ থেমে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে চাপা কম্পিত গলায় বললেন,—এই আদালতেই আপনারা জানেন বোধহয় কাল গর্হিততম এক অপরাধের বিচার হবে—পিতৃহত্যার বিচার।

এ অপরাধ যে তাঁর কাছে প্রায় কল্পনাতীত তা বুঝিয়ে দিয়ে সরকারি উকিল সে মামলার সুবিচার হবে বলে আশা জানালেন। সেই সঙ্গে না বলে পারলেন না যে আমার অমানুষিক হৃদয়হীনতায় যে ঘৃণা তাঁর হচ্ছে তার কাছে সেই পিতৃহত্যার পাতকের বিভীষিকাও ম্লান হয়ে গেছে।

—মায়ের মৃত্যুর জন্যে নৈতিকভাবে যে দায়ী আর নিজের পিতাকে যে হত্যা করেছে এরা দুজনেই মানুষের সমাজে স্থান পাবার সমান অযোগ্য। আর বলতে গেলে একটি অপরাধ থেকেই আর একটি আপনা থেকে আসে। এই দুই অপরাধীর মধ্যে আজ যে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে সে একরকম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলা যায়।

সরকারি উকিল গলাটা আর একটু চড়িয়ে বললেন,—আমি কিছু বাড়িয়ে বলছি না। কাল আদালতে যে অপরাধের বিচার হবে আজকের আসামী তার জন্যেও দায়ী বলে আমি মনে করি। আপনাদের কাছে তাই উপযুক্ত রায়ই পাব বলে আমি আশা রাখি।

সরকারি উকিল মুখ থেকে ঘাম মোছবার জন্যে থামলেন। তাঁর কর্তব্য যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক তা বুঝিয়ে দিয়ে তিনি জানালেন যে তবু তিনি পেছপাও নন।

—অম্লান বদনে যে সমাজের মূল নীতি এই আসামী লঙ্ঘন করে সে সমাজে তার স্থান নেই। নিজে হৃদয়হীন হয়ে ক্ষমা পাবার দাবীও সে করতে পারে না। আমি আপনাদের আইনের চরম দণ্ডই দিতে বলব, বলব অকম্পিত চিত্তে। দীর্ঘকাল আমি ওকালতি করছি। অনেকবারই মৃত্যুদণ্ড কর্তব্যবোধে আমায় চাইতে হয়েছে, কিন্তু এমন দ্বিধাহীন বুঝি কোন অপরাধীর বেলা আমি হতে পারি নি। আজ এই দণ্ড দাবী করে আমি শুধু আমার বিবেকের নির্দেশই অনুসরণ করছি।

সরকারি উকিল এবার বসলেন। বেশ কিছুক্ষণ সমস্ত আদালত একেবারে স্তব্ধ। আমি নিজে, কতকটা যা শুনলাম তাতে অবাক হয়ে, কতকটা অসহ্য গরমে তখন অভিভূত।

প্রধান বিচারপতি একটু কেশে অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে আমায় কিছু বলবার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। তখন কথা বলবার ঝোঁক এসেছে, প্রথমেই যা মনে এল তা বলে ফেললাম। বললাম যে লোকটিকে খুন করবার কোন বাসনা আমার ছিল না।

বিচারক বললেন যে আদালত এ কথা বিচার করে দেখবে। তবে আমার উকিলের বক্তব্য শুরু হবার আগে তিনি এ অপরাধের মূলে কি আছে জানতে উৎসুক। এখনও পর্যন্ত আমার কৈফিয়ত যে কি তিনি তা ভালো করে বুঝতে পারেন নি বলে স্বীকার করলেন।

শুধু রোদের তাতেই ব্যাপারটা ঘটেছে আমি বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কথা আমি তখন বড্ড তাড়াতাড়ি বলছি। কথার সঙ্গে কথা জড়িয়ে গিয়ে সব যে প্রলাপের মত শোনাচ্ছে তা বেশ ভালোই টের পাচ্ছিলাম। চাপা হাসির শব্দও চারিধারে শুনতে পেলাম।

আমার উকিল হতাশা ও বিরক্তির সঙ্গে কাঁধ দুটোয় একটু ঝাঁকুনি দিলেন। তাঁকে এবার যা বলবার বলতে নির্দেশ দেওয়া হল। কিন্তু তিনি আর সময় নেই বলে পরের দিন বিকেল পর্যন্ত বিচার স্থগিত রাখবার আর্জি জানালেন।

বিচারকেরা তাঁর আর্জি মঞ্জুর করলেন।

পরের দিন আমায় যখন আদালতে নিয়ে এল তখনও তেমনি গরম। ইলেকট্রিক

ফ্যানগুলো যেন আগের মতই ভারী হাওয়া মইছে। জুরীরা তাদের বাহারে পাখাগুলো এক ছন্দে নেড়ে চলেছে।

মনে হল আমার উকিলের বক্তৃতা আর শেষ হবে না। একবার একটা কথায় আমার কান খাড়া হয়ে উঠল। শুনলাম আমার উকিল বলছেন—'আমি একজন মানুষ খুন করেছি সত্য।'

আমার উকিল ওই সুরেই বলে চললেন। আমার ওকালতি করতে গিয়ে সব জায়গায় তিনি 'আমি' 'আমি'-ই করছেন দেখলাম। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল বলে আমার পাহারার পুলিশকে মানেটা জিজ্ঞাসা করায় সে আমায় প্রথম চুপ করতে বলল। খানিকবাদে চুপিচুপি জানালে যে এই রকম বলাই এখানকার দস্তুর। আমার মনে হল সমস্ত মামলার ব্যাপার থেকে আমায় দূরে সরিয়ে রাখাই যেন এ ব্যাপারের উদ্দেশ্য। আমার বদলী আমার উকিলকে দাঁড় করিয়ে আমাকে একেবারে উড়িয়েই যেন এরা দিতে চায়। যাই হোক কিছু এমন তাতে এসে যায় না। এমনিতেই যেন এ মামলা আর এই আদালত থেকে বহু বহু দূরে আমি চলে গেছি মনে হচ্ছিল।

আমার উকিলের ওকালতি এত দুর্বল যে আমায় প্রায় হাস্যকর মনে হচ্ছিল। আমার উত্তেজনার কারণ থাকার অজুহাতটা কোন রকমে দেখিয়ে তিনিও আমার 'আত্মা' নিয়ে পড়লেন। সরকারি উকিলের তুলনায় তাঁকে নিরেস-ই আমার মনে হল।

তিনি বলতে লাগলেন,—আমিও আসামীর আত্মা ভালো করে বিচার করে দেখেছি। আমার বিজ্ঞ বন্ধু সেখানে কিছু পান নি, কিন্তু আমি পেয়েছি। সত্যি করে বলতে পারি যে আসামীর মন আমার কাছে খোলা বই-এর মত সুস্পষ্ট।

খোলা বই-এ তিনি যা পড়েছেন তা এবার জানালেন। আমি তাঁর মতে চমৎকার মানুষ। অস্থির চঞ্চল নই, কাজে মন আছে মনিবের কাজে ফাঁকি দিতে জানি না। সকলে আমায় ভালবাসে অন্যের দুঃখ কষ্টে আমার প্রাণ গলে। ছেলে হিসেবেও আমার কর্তব্য-জ্ঞান যথেষ্ট। যতদিন ক্ষমতা ছিল আমি মা-র ভার নিয়েছি। অনেক ভেবেচিন্তে আমি বুঝেছি যে কোন আশ্রমে থাকলে মা অনেক সব সুখ সুবিধা পেতে পারেন, পয়সার অভাবে আমার কাছে যা পাবার আশা নেই।

আমার বিজ্ঞ বন্ধু আশ্রম সম্বন্ধে যে মনোভাব দেখিয়েছেন তাতে আমি বিস্মিত। এ-সব প্রতিষ্ঠানের মূল্য যে কতখানি, এগুলি সরকারি সাহায্যে ও উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত বললেই আশা করি বোঝা যাবে।

দেখলাম আমার উকিল মা-র শেষকৃত্য সম্বন্ধে কিছু বললেন না। এ প্রসঙ্গ বাদ দেওয়াটা গুরুতর ত্রুটি বলেই মনে হল। কিন্তু তাঁর অফুরন্ত বক্তৃতা দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার 'আত্মা' নিয়ে ওদের আলোচনা সব মিলে আমার মনটা কেমন যেন ঝাপসা করে দিয়েছে। একটা ধোঁয়াটে তরল কুয়াশায় যেন সব কিছু গলে গেছে।

একটা ঘটনাই শুধু তার মধ্যে জেগে আছে স্মৃতিতে। আমার উকিল তখন বকে চলেছেন। হঠাৎ রাস্তায় এক আইসক্রীম ফেরিওয়ালার টিনের ভেঁপুর আওয়াজ শুনতে পেলাম। তীক্ষ্ণ শব্দটা কথার স্রোত কেটে যেন বেরিয়ে এল। সেই সঙ্গে স্মৃতির বন্যা আমায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল—যে জীবনে আর আমার কোন স্থান নেই তার স্মৃতি। একদিন সামান্য যে সব বস্তু ও বিষয় থেকে সত্যিকার আনন্দ পেয়েছি, সেই গ্রীষ্মের পৃথিবীর ঘ্রাণ, আমার পরিচিত সব রাস্তার ছবি, সন্ধ্যায় আকাশের রূপ, মারীর নানা পোশাক আর

তার হাসি পরপর মনের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। এখানে যা হচ্ছে তার নিষ্ফলতায় যেন আমার দম বন্ধ হয়ে এল। মনে হল বমি হয়ে যাবে। এখন শুধু এই সব কিছু শেষ করে দিয়ে নিজের জেলের কুঠুরিতে ফিরে যেতে চাই—চাই ঘুমোতে—শুধু ঘুমোতে...

অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলাম আমার উকিল শেষ আবেদন জানাচ্ছেন।

'জুরী মহোদয়গণ, শুধু একটি মুহূর্তের জন্যে আত্মসংযম হারিয়েছে বলে ভদ্র একটি পরিশ্রমী যুবককে আপনারা নিশ্চয় মৃত্যুদণ্ড দেবেন না? সারাজীবন যে অনুশোচনায় সে দগ্ধ হবে তাই কি তার যথেষ্ট শাস্তি নয়? আমি আপনার দণ্ডাদেশের অপেক্ষায় রইলাম, নিশ্চিন্ত মনেই রইলাম এই জেনে যে এ ব্যাপারে আনুসঙ্গিক কারণ আছে বুঝে উপযুক্ত দণ্ডবিধানই আপনারা করবেন।'

আমার উকিল বসলেন। আদালতের শুনানিও তখনকার মত স্থগিত রইল। আমার উকিলকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। তাঁর কয়েকজন সতীর্থ এসে তাঁর করমর্দন করলেন। 'চমৎকার বলেছ বন্ধু!' একজনকে মন্তব্য করতে শুনলাম। আরেকজন উকিল তো আমাকেই সালিশী মেনে বললেন,—'খুব ভালো; না হে?' আমি সায় দিলাম, তবে সরল মনে নয়। তখন এত আমি ক্লান্ত যে ভালো মন্দ বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই।

বেলা এদিকে পড়ে এসেছে। গরম এখন অনেক কম। বাইরে থেকে অস্পষ্ট যা দু-একটা আওয়াজ আসছিল তাতে বুঝলাম সন্ধ্যার সঙ্গে বাইরে ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। আমরা সবাই অপেক্ষা করে বসে আছি। অপেক্ষা যে জন্যে করছি তা কিন্তু আর কারুর নয় শুধু আমার একলারই ভাগ্যের সঙ্গে জড়ানো।

আদালতের চারিদিকে একবার চোখ বুলালাম। প্রথম দিন কেমন দেখেছিলাম সবই ঠিক সেই রকম। ছাই রঙের পোশাক পরা সেই সাংবাদিকের সঙ্গে চোখোচোখি হল। সেই কলের পুতুলের মত মহিলাকেও দেখলাম। এইবার মনে পড়ল যে এতক্ষণে একবারও মারীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ের চেষ্টা করিনি। তার কথা যে ভুলে গেছি তা নয়, শুধু সময়ই যেন পাইনি। দেখলাম সিলেস্তি আর রেমণ্ডের মাঝখানে সে বসে আছে। আমায় দেখে একবার হাত নেড়ে সম্ভাষণ জানালে। যেন বলতে চাইলে,—এতক্ষণে! সে হাসছে, কিন্তু বুঝতে পারলাম মনে তার উদ্বেগ। আমার বুক কিন্তু যেন পাথর হয়ে গেছে। তার হাসির জবাবে হাসতেও পারলাম না।

বিচারকেরা তাঁদের আসনে ফিরে এসে বসলেন। কে একজন খুব তাড়াতাড়ি জুরীদের কি সব পড়ে শোনালো। একটা আধটা কথা ধরতে পারলাম। 'হিংসাবশে পূর্বকল্পিত হত্যা'... 'উত্তেজনার হেতু'... 'আনুসঙ্গিক কারণ'

জুরীরা বেরিয়ে গেলেন। আমার আগের সেই কামরায় নিয়ে যাওয়া হল। আমার উকিল আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁর মুখে এখন খই ফুটছে। তাঁর কথাবার্তায় ব্যবহারে আরো ঘনিষ্ঠতা ও আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি আমায় আশ্বস্ত করে বললেন সব ঠিক হয়ে যাবে। কয়েক বছর জেল বা বড় জোর স্বীপান্তর আমার হতে পারে।

জানতে চাইলাম খালাসের কোন আশা আছে কিনা। তিনি বললেন যে আশা নেই। আইনের কোন প্রশ্ন তিনি তোলেন নি কারণ তাতে জুরীরা বিগড়ে যেতে পারেন। কোন রায় একমাত্র আইনের মার প্যাঁচেই বাতিল করে দেওয়া যায়। নইলে তা বাতিল করান অত্যন্ত কঠিন। তাঁর কথাটা বুঝলাম। নির্লিপ্তভাবে বিচার করে তাঁর মতটাই ঠিক মনে হল।

ব্যাপার অন্যরকম হলে মামলার আর শেষ থাকবে না।

—যাই হোক—আমার উকিল বললেন—আপনি সাধারণভাবে আপীল করতে পারেন। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রায় আপনার পক্ষেই দেওয়া হবে।

অনেকক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হল। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা। তারপর একটা ঘণ্টা বাজল। আমার উকিল উঠে যেতে যেতে বললেন,—'জুরীদের মাতব্বর এবার তাঁদের জবাব পড়ে শোনাবেন। তারপর আপনাকে রায় শোনবার জন্যে ডাকা হবে।'

দরজার শব্দ এদিকে ওদিকে শোনা গেল। সিঁড়ি দিয়ে নানা জনের নামা ওঠার শব্দ শুনতে পেলাম। কিন্তু কাছে না দূরে বুঝতে পারলাম না। তারপর শুনলাম আদালতে একঘেয়েভাবে কে কি যেন বলে চলেছে।

আবার ঘণ্টা বাজবার পর আমি কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আদালতের নিস্তব্ধতা আমায় ঘিরে ধরল। আর সেই নীরবতার মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি টের পেলাম। দেখলাম সেই তরুণ সাংবাদিক আমার দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে রেখেছে।

মারীর দিকেও আমি চাইনি। চাইবার সময়ও ছিল না, কারণ প্রধান বিচারপতি তখন আদালতী প্যাঁচাল ভাষায় তাঁর রায় দিতে দিতে এই কথাই বলছেন যে ফরাসী জাতির নামে কোন প্রকাশ্য স্থানে আমার শিরশ্ছেদ করা হবে।

মনে হল উপস্থিত সকলের চোখের দৃষ্টির মানে আমি যেন তখন বলে দিতে পারি। প্রায় সকলেরই চোখে বেদনা, সহানুভূতি। পুলিস কনেস্টবল পর্যন্ত আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে। আমার উকিল আমার হাতটা একবার ছুঁলেন।

আমার চিন্তা করবার কোন ক্ষমতা তখন আর নেই। শুনতে পেলাম আমার কিছু আর বলবার আছে কিনা বিচারক জিজ্ঞাসা করছেন। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললাম, —না।

পুলিস কনেস্টবল আমায় বাইরে নিয়ে গেল।

এই নিয়ে তিনবার জেলের পাদ্রীর সঙ্গে দেখা করতে আমি অস্বীকার করেছি। তাঁকে কিছুই আমার বলবার নেই। বলবার ইচ্ছেও হয় না। আর শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে শনিগিরি দেখা তো হচ্ছে-ই।

এখন আমার একমাত্র চিন্তা এই যান্ত্রিক নাগপাশ থেকে মুক্তির উপায় আছে কিনা, —যা অমোঘ তারও কোন ছিদ্র কোথায় পাওয়া যেতে পারে কিনা তাই জানা।

আমাকে আরেকটা কুঠুরিতে এরা এনেছে। এখানে চিৎ হয়ে শুয়ে আমি আকাশ দেখতে পাই। আর কিছু দেখবার নেই। আমি শুধু দেখি আকাশের রঙ কেমন ধীরে ধীরে বদলায় তারপর রাত্রি নামে।

কোথাও ছিদ্র কিছু থাকতে পারে কিনা এই আমার এখন একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। ভাবি ফাঁসির কোন আসামী কোথাও শেষ মুহূর্তে পুলিস পাহারা এড়িয়ে গিলেটিনের খাঁড়া ঠিক পড়বার আগে পালাতে পেরেছে কিনা। আফশোষ হয় কেন এ বিষয়ে আগে তেমন মন দিই নি। কি যে হতে পারে কেউ বলতে পারে না। আর সকলের মত খবরের কাগজে ফাঁসির বর্ণনা পড়েছি, কিন্তু এ বিষয়ে বিশদ বিবরণের বই নিশ্চয় আছে। তাতে হয়ত ফাঁসির আসামীর পালাবার খবর পেতাম। তাতে হয়ত এমন কোন একটা ঘটনার উল্লেখ থাকত যাতে

নিয়তির অমোঘ চাকা ঘুরতে ঘুরতে থেমে গিয়ে কাউকে বাঁচবার একটা শুভ সুযোগ দিয়েছে। একটা এরকম দৃষ্টান্ত পেলেই আমি খুশি হতাম। বাকি আমি কল্পনা করে নিতে পারতাম।

খবরের কাগজে লেখে,—'সমাজের কাছে ঋণ।' তাদের মতে অপরাধীকে এই ঋণ শোধ করতে হয়। এ ধরনের কথা মনে দাগ কাটে না। কোন রকমে এক ছুটে তাদের এই হিংস্র অনুষ্ঠান ব্যর্থ করে পালাতে পারি কিনা আমার কাছে এইটেই একমাত্র চিন্তা। এক মুহূর্তের আশা তা হলে আমি পাই, জুয়াড়ীর শেষ 'দান'-এর মত।

তার পরিণাম কি তা অবশ্য জানি। মোড় না ঘুরতেই মাথায় বাড়ি খেয়ে পড়ে যাওয়া কিংবা পিঠে একটি গুলি। তবু সেটুকু কল্পনা বিলাসের সুযোগও আমার নেই। আমি ইঁদুর কলে জম্পেশ করে আটকানো।

এই নিষ্ঠুর নিশ্চয়তাটাই সহ্য করতে পারি না কিছুতে। দণ্ডাদেশ আর অপরিবর্তনীয় যে ঘটনাপরম্পরায় তা দেওয়া হয়েছে দুইয়ের মধ্যে কোথায় একটা গরমিল যেন আছে। বিকেল পাঁচটার বদলে সন্ধ্যে আটটায় যদি রায় দেওয়া হয়, তাহলে এই রায়ই যে ভিন্ন হতে পারত, যারা দণ্ডাদেশ দিয়েছে তারাও যে অন্তর্বাস বদলায়, রায়টা যে ফরাসী জাতির নামে বলে অস্পষ্ট একটা কথার সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—এই সব কিছু মিলে যেন তার গুরুত্ব হালকা করে দিয়েছে। সত্যিই ফরাসী জাতির নামে যদি হয় তো চীনা কি জর্মান জাতির নামেই বা নয় কেন!

কিন্তু রায় একবার উচ্চারিত হবার পরই—তা আমি যে দেওয়ালটা পিঠ দিয়ে আছি তারি মত অটল কঠিন সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই সব কথা ভাবলে মা-র কাছে শোনা একটা গল্প মনে পড়ে যায়। বাবা-র গল্প। তাঁকে আমি অবশ্য চোখে কখনও দেখিনি। মা তাঁর সম্বন্ধে যা বলেছেন তাইতেই তাঁর যা কিছু পরিচয় পেয়েছি। বাবা নাকি একবার গিলোটিনে এক খুনীর মুণ্ডচ্ছেদ দেখতে গেছলেন। ব্যাপারটা ভাবতেই না কি তাঁর গা গুলিয়ে উঠত। তবু শেষ পর্যন্ত তিনি দেখেছিলেন আর বাড়ি ফিরে বমি করেছিলেন। গল্পটা যখন শুনি তখন বাবার কাণ্ড বিশ্রী লেগেছিল। এখন বুঝি সেটা স্বাভাবিক। কেন তখন বুঝি নি যে কারুর মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে গুরুতর ব্যাপার আর কিছু নেই। এক দিক দিয়ে দেখলে মানুষ শুধু এই ব্যাপারেই উৎসুক হতে পারে।

ভাবলাম যদি কখনো ছাড়া পাই মৃত্যুদণ্ড যেখানে যেখানে দেওয়া হবে সব জায়গায় যাব। এরকম সম্ভাবনার কথা ভাবাই অবশ্য উচিত হয়নি। কারণ ছাড়া পাবার কথা চিন্তা করবার সঙ্গে সঙ্গেই কল্পনা করে নিয়েছি পুলিস পাহারার বাইরে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আর যে খুশিমত কিছু দেখতে এসে ইচ্ছেমত বাড়ি ফিরে বমি করতে পারে নিজেকে এরকম একজন দর্শক ভাবতেই উদ্দাম অর্থহীন এক উল্লাসে মন ভরে গেছে।

কল্পনার এমন রাশ ছেড়ে দেওয়া বোকামীর চূড়ান্ত। এর পরই সারা শরীরে এমন কাঁপুনি এল যে কম্বলে আগাগোড়া মুড়ি দিয়েও সামলাতে পারলাম না। দু পাটি দাঁতের ঠকঠকানি আর থামান গেল না।

কিন্তু সব সময়েই কি সাবধানে হুঁশ রেখে চলা যায়। মাঝে মাঝে আমার মনের একটা কাজ হল নতুন আইন তৈরি করে সাজা বদলে দেওয়া। অপরাধীকেও একটা সুযোগ দিতে হবে, তা যত সামান্যই হোক না এমন কোন ওষুধ তো দেওয়া যায় যাতে রুগীর (অপরাধীকে আমার রুগীই মনে হয়েছে) হাজারে ন-শ নিরেনব্বইই বার মরবার সম্ভাবনা। এটা তার

আবার জানাও একান্ত দরকার। অনেক ভেবে চিন্তে আমার মনে হয়েছে, 'গিলোটিনে'র আসল দোষ হল এই যে তা থেকে দণ্ডিতের পরিত্রাণের বিন্দুমাত্র আশাও নেই। তার মৃত্যু একেবারে অবধারিত। যদি কোন কারণে খাঁড়াটায় একবার কাজ না হয় তাহলে আবার তা চালান হবে। তাতে দাঁড়াচ্ছে এই যে মৃত্যুদণ্ড যে পেয়েছে তাকে খাঁড়াটা যাতে নির্ভুলভাবে পড়ে সেই আশাই করতে হবে। এ ব্যবস্থায় এইটেই ত্রুটি। আরেক দিক দিয়ে দেখলে এ ব্যবস্থা অবশ্য নিখুঁত। দণ্ডিতকে মনে মনে অন্তত দণ্ড পাওয়ার সাহায্য করতে হবে।

আরেকটা বিষয়ে আমার ভুল ধারণা ছিল। আমি বরাবরই জানি যে গিলোটিন-মঞ্চে দণ্ডিতকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে হয়। হয়ত ১৭৮৯-এর বিপ্লবের কাহিনী থেকেই এ ধারণা আমার জন্মেছে। স্কুলে যা পড়েছি ও যে সব ছবি দেখেছি তাতে ওই রকমই মনে করা স্বাভাবিক। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। মনে পড়ল খবরের কাগজে একবার এক নামকরা বদমায়েসের গিলোটিনে শিরশ্ছেদের ছবি দেখেছি। যন্ত্রটা আসলে মাটিতেই বসান থাকে। সেটা খুব চওড়াও নয়। এতদিন কেন সে ছবির কথা মনে পড়েনি ভেবে অবাক লাগল। তখন গিলোটিন-এর পরিপাটি চেহারাটাই মনে লেগেছিল। বিজ্ঞানের কোন যন্ত্রের মত ঝকঝকে চকচকে। যা মানুষ জানে না তার সম্বন্ধে একটু কল্পনার বাড়াবাড়ি থাকে-ই। গিলোটিন-এ মাথা দেওয়াটা কিছুমাত্র গোলমেলে ব্যাপার নয় মানতেই হল। যন্ত্রটা সাধারণ মানুষের চেয়ে উঁচু নয়। যেন চেনা কারুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি এমনিভাবে তার দিকে এগিয়ে যেতে হয়। এ ব্যাপারটাও ভালো লাগে না। একটা উঁচু মঞ্চে ওঠবার সময় সমস্ত পৃথিবীকে এক হিসেবে নিচে ফেলে যাওয়ার মধ্যে কল্পনার একটু অবসর অন্তত আছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা এমন যে যন্ত্রই যেন সবচেয়ে প্রধান। মাথাটা বেশ বিবেচনার সঙ্গে নিপুণভাবেই নেওয়া হয় শুধু তাতে একটু গ্লানি ও লজ্জার আভাস।

আর দুটো বিষয়ের কথা প্রায়ই ভাবি। একটা সেই শেষ সকালের কথা, আর আমার আপিলের। এ ভাবনা অবশ্য যথাসম্ভব মন থেকে ঠেলে রাখতে চাই। শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে সেইটেই লক্ষ্য করবার চেষ্টা করি। আলো যখন সবজে হয়ে আসে তখন বুঝি রাত্রির আর দেরি নেই। মাঝে মাঝে নিজের হৃদ্‌পিণ্ডের শব্দও শুনি। সারাজীবন যে শব্দ আমার সঙ্গী তা একেবারে থেমে যাবে এ যেন ভাবতেই পারি না। কল্পনা শক্তি আমার খুব জোরালো কখনো নয়। তবু বুকটা যখন আর ধুক ধুক করবে না এমন একটা সময় ভাবতে চেষ্টা করি। বৃথাই। মাথায় সেই শেষ সকাল আর আপিলের ভাবনাই ফিরে ফিরে আসে। মনকে জোর করে তার রাস্তা ছাড়ানো অসম্ভব বুঝেই শেষে হাল ছেড়ে দিই।

মৃত্যুদণ্ডের আসামীকে সকাল বেলাই নিয়ে যায় এটুকু আমি জানি। রাতগুলো সেই সকালের অপেক্ষাতেই কাটে। আচমকা কিছু হওয়া কোনকালে আমি পছন্দ করি না। যা কিছু ঘটবে তার জন্যে আমি প্রস্তুত থাকতে চাই। এখন তাই যখন পারি দিনের বেলা একটু আধটু ঘুমিয়ে নিই আর রাত্রে ভোরের প্রথম আভাসের জন্যে ওপরের গম্বুজের দিকে চেয়ে থাকি। সবচেয়ে খারাপ লাগে ভোরের সেই আগের সময়টা যখন ওরা সাধারণত নিতে আসে। মাঝ রাতের পর থেকেই আমি কান খাড়া করে অপেক্ষা করি। এত রকম শব্দ এর আগে কখনও লক্ষ্য করিনি। কি সব ছোটখাট শব্দ!

এক বিষয়ে তবু আমার ভাগ্য ভালো বলতে হবে। এর মধ্যে কোনদিন পায়ের শব্দ আমি শুনিনি। মা বলতেন যে যত দুঃখেই মানুষ পড়ুক কিছু তার মধ্যে সান্ত্বনা থাকে-ই। সকালে যেই আকাশ ফরসা হয়ে আলোয় আমার কুঠুরি ভরে যায় সেই কথাই আমি ভাবি।

পায়ের শব্দও তো শুনতে পারতাম আর বুকটা ভেঙে চুরমার হয়ে যেত তাহলে।

সামান্য একটু আওয়াজেও অবশ্য আমি একেবারে লাফ দিয়ে উঠে ঠাণ্ডা দরজার কাঠে কান লাগিয়ে দাঁড়াই। তখন একাগ্রতায় নিজের নিশ্বাসের শব্দই আমি শুনতে পাই, ঠিক যেন কুকুরের মত হাঁপাচ্ছি। তবু তারও একটা শেষ হয়। আবার চব্বিশ ঘণ্টার মেয়াদ আমি পাই।

আমার আপীল-এর কথাও ভাবি। তা থেকে যতখানি সম্ভব সান্ত্বনা নিঙড়ে নেবার চেষ্টা করি। সবচেয়ে মন্দটাই আগে ভাবি। ভাবি আপীল নামঞ্জুর হয়েছে। তার মানে আমায় মরতে হবে। অন্যদের আগে। নিজেকে বোঝাই যে যাই বলো বাঁচায় কোন সুখ তো সত্যি নেই। ত্রিশেই মরি আর তিয়াত্তরে, সবই এক। কারণ যখনই মরি না কেন দুনিয়ায় আর অনেকেই বেঁচে থাকবে, সংসার চলবে আগের মতোই। আজই হোক আর চল্লিশ বছর বাদেই হোক না মরে উপায় নেই। এত সব ভেবেও ঠিক যেরকম সান্ত্বনা পাবার তা কিন্তু পেলাম না।

তবে আয়ুর মেয়াদ ফুরলে মৃত্যু আসবার সময় মনের ভাব কি হতে পারে কল্পনা করে এই হতাশাটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করা যায়। মৃত্যু যখন সত্যিই আসে তখন তার সঠিক ধরনটার এমন কোন মূল্য থাকে না। সুতরাং—এই সুতরাং-এ পৌঁছোবার খেই সহজেই হারিয়ে যায়—আপীল নামঞ্জুর হওয়ার জন্যে আমার তৈরি থাকা উচিত।

অন্য সম্ভাবনাটার কথা ভাববার অধিকার এখন বোধ হয় আমি দাবী করতে পারি। আমার আপীল যদি মঞ্জুর হয়। কথাটা ভাবতেই যে আনন্দের ঢেউ সমস্ত দেহ মনে উথলে উঠে চোখে জল এনে দেয় তা থামিয়ে রাখাই কঠিন। আমাকেই কিন্তু শক্ত হয়ে মনটাকে স্থির করতে হবে। কারণ এমনটা হতে পারে ভেবে, সব চিন্তা এলোমেলো হতে দিলে অন্যরকম সম্ভাবনার জন্যে যে সব সান্ত্বনা জমিয়ে রেখেছি তার মানে থাকবে না। মনটা শক্ত করতে পারলে তাই বেশ কিছুক্ষণের একটা শান্তি পাওয়া যায়। সেটাও কম কথা নয়।

এইরকম একটা সময়ে আবার পাদ্রীর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করলাম। তখন শুয়ে শুয়ে আকাশে গ্রীষ্ম সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার রূপ দেখছি। সমস্ত আকাশে একটা স্নিগ্ধ সোনালী আভা ছড়িয়ে যাচ্ছে। মনে মনে এই মাত্র আপীল নামঞ্জুর করে দিয়েছি। টের পাচ্ছিলাম নাড়িটা ধীর মন্থর গতিতে চলছে। না, পাদ্রীর সঙ্গে দেখা করতে আমি চাই না।

অনেক কাল যা করিনি তাই এবার করলাম। মারীর কথা ভাবতে লাগলাম। বহুদিন সে কোন চিঠি দেয় নি। ফাঁসির আসামীর সঙ্গে ভালবাসার সম্বন্ধ রাখায় তার অরুচি ধরে গেছে বোধ হয়। কিংবা হয়তো তার অসুখ করেছে, মারা-ই গেছে হয়তো। এ রকম'ত হয়। কি করে আর আমি জানব! এমন কিছু যোগ দুজনের মধ্যে নেই যাতে পরস্পরের কথা মনে পড়ে। যদি সে মারা-ই গিয়ে থাকে তার স্মৃতির কি আর দাম! মরে গেলে তার সম্বন্ধে আর কিছু নিশ্চয় ভাবব না। এইটেই আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়। আমি মরে গেলেও লোকে আমার কথা ভুলে যাবে জানি। সত্যি কথা বলতে গেলে এতে দুঃখেরও এমন কিছু নেই। যে কোন ধারণাই একদিন অনায়াসে মেনে নেওয়া যায়।

এই পর্যন্ত ভেবেছি এমন সময় পাদ্রী নিজেই খবর না দিয়ে চলে এলেন। তাঁকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। তিনি সেটা লক্ষ্য করে আমায় ভয় না পেতে বললেন। তাঁকে মনে করিয়ে দিলাম যে অন্য এক সময়ে সেই দারুন দিনে ছাড়া তাঁর তো আসবার কথা নয়। তিনি

বললেন যে শুধু একটু আলাপ সালাপ করবার জন্যে তিনি এসেছেন। এ আসার সঙ্গে আমার মামলার আপীলের কোন সম্পর্ক নেই। আপীলের কি হয়েছে তিনি জানেনও না।

পাদ্রী আমার বিছানার ওপর বসে আমায় পাশে বসতে বললেন। আমি রাজী হলাম না। তাঁর ওপর রাগ করে অবশ্য নয়। রাগের কিছু নেই। লোকটিকে অমায়িক ভালোমানুষ মনে হল।

দুই হাঁটুর ওপর হাত দুটো রেখে তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। হাত দুটো সরু শির ওঠা। যেন ছোট ছোট দুটো চঞ্চল কোনো প্রাণী বলে আমার মনে হচ্ছিল। এরপর তিনি হাত দুটো একবার ধীরে ধীরে ঘষলেন। একইভাবে এতক্ষণ বসে থাকায় তিনি যে ঘরে আছেন আমি যখন প্রায় ভুলেই গেছি তখন হঠাৎ মাথাটা ঝাঁকানি দিয়ে তুলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কেন আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান নি?

বললাম যে আমি ভগবানে বিশ্বাস করি না।

—বিশ্বাস যে করেন না তাকি ঠিক জানেন?

বললাম ও ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো মানে পাই না। বিশ্বাস আমি করি কি না করি তার এমন কিছু মূল্য নেই।

দেয়ালে হেলান দিয়ে হাত দুটো তিনি এবার উরুর ওপর রাখলেন। আমার দিকে একরকম না চেয়েই তিনি বললেন যে অনেক সময়ে মানুষ নিশ্চিৎ জানে বলে যা মনে করে তা ঠিক নয়।

আমি উত্তর না দেওয়ায় তিনি আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—কি তাই না?

বললাম, হতে পারে। তবে তিনি যে কথা তুলেছেন তাতে আমার কোন আগ্রহ নেই।

মুখটা অন্য দিকে একটু ফিরিয়ে তিনি জানতে চাইলেন একেবারে হতাশ হয়ে আমি একথা বলছি কিনা।

বললাম, হতাশা নয় ভয়। আর সেটাই স্বাভাবিক।

—তাহলে, তিনি জোর দিয়ে বললেন,—ভগবান আপনার সহায় হতে পারেন। আপনার মত অবস্থার যে ক'জনকে আমি দেখেছি সবাই চরম বিপদে ভগবানের শরণ নিয়েছে।

বললাম,—তারা যা ভালো বুঝেছে, করেছে। আমার সাহায্যের কোন দরকারই নেই। আর যা ভালো লাগে না তার জন্যে উৎসাহী হয়ে ওঠার সময়ও না।

হাত দুটো ক-বার নেড়ে তিনি উঠে বসলেন। তারপর আলখাল্লাটা একটু টান করে নিয়ে আমায় বন্ধু বলে সম্বোধন করে বললেন যে আমার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে বলে এসব কথা তিনি আমায় বলছেন না। তাঁর মতে পৃথিবীর সবাই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

বাধা দিয়ে বললাম,—প্রথমত দুটো ব্যাপার এক নয়, দ্বিতীয়ত তাতে কোনো সান্ত্বনাও পাওয়া যায় না।

হয়ত তাই!—বলে তিনি মাথা নাড়লেন।—তবু এখুনি না হোক একদিন আপনাকে মরতে হবে-ই। তখন সেই প্রশ্নই উঠবে। সেই ভয়ংকর মুহূর্তে কি করবেন?

ঠিক এখন যা করছি তাই।

এবার তিনি দাঁড়িয়ে উঠে সোজা আমার চোখের দিকে তাকালেন। এ কায়দা আমার জানা। ইমানুয়েল আর সিলেস্তির ওপর এই কায়দা চালিয়ে কতবার মজা করেছি। দশ-বারের মধ্যে ন-বার তারা অস্বস্তির সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। দেখলাম পাদ্রী এ কায়দায় পাকা। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে স্থির কণ্ঠে তিনি বললেন,—কোন আশা কি আপনার

নেই? আপনি কি মনে করেন মরলেই সব ফুরিয়ে যাবে, কিছু থাকবে না?

তাই মনে করি—জানালাম।

চোখ নামিয়ে তিনি আবার বসলেন। জানালেন যে আমার জন্যে সত্যিই তিনি দুঃখিত। আমার মত যারা ভাবে তাদের জীবন তো দুর্বহ তিনি মনে করেন।

এইবার আমার বিরক্তি লাগছিল। দেয়ালে একটা কাঁধ ঠেকিয়ে ভর দিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলাম। তাঁর কথায় তেমন কান দিলেও বুঝলাম তিনি আমায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছেন। তাঁর গলার স্বরের উত্তেজনা থেকেই মনে হল সত্যি তিনি ব্যথিত। তাই তাঁর কথায় একটু মন দিলাম।

তিনি বলছিলেন যে আমার আপীল মঞ্জুর হবে বলেই তাঁর বিশ্বাস। তবে আমার পাপের ভার থেকে আমায় মুক্ত হতে হবে। তাঁর মতে মানুষের বিচার নিতান্তই ভুয়ো, ঈশ্বরের বিচারই সত্য।

বললাম,—মানুষের বিচারেই আমি দণ্ডিত।

তা ঠিক। তবে তাতেও আপনার পাপের স্খালন হবে না।

জানালাম যে কোন পাপের গ্লানি আমার মনে নেই। আমি এইটুকু জানি যে, একটা অন্যায় অপরাধ আমি করেছি। সে অপরাধের শাস্তি যখন আমি নিচ্ছি তখন আমার কাছে আর কিছু কারুর আশা করা উচিত নয়।

তিনি আবার উঠে দাঁড়ালেন। সংকীর্ণ ঘর। দুজনের নড়াচড়ার মত জায়গা কম। তিনি আমার দিকে এক পা এগিয়ে থামলেন। আর এগুবার যেন তাঁর সাহস নেই।

ওপরের দিকে চেয়ে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন,—আপনি ভুল করছেন। আপনার কাছে আশা করবার এখনো কিছু আছে। সে আশা এখনো যায় নি।

—কি বলতে চান কি?

—আপনাকেই হয়ত দেখতে হবে...

—কি?

পাদ্রী আমার কুঠুরির চারিধারে তাকালেন। এবার তাঁর গলার স্বর করুণ।

বললেন,—এই যে পাথরের দেওয়াল, এ দেওয়াল আমার ভালো করে জানা। মানুষের বেদনায় এ দেওয়াল গাঁথা। তাই ওদিকে চাইলে আমি শিউরে উঠি। কিন্তু, বিশ্বাস করুন আমি প্রাণ থেকে বলছি যে একদিন এই দেয়ালের ধূসরতা থেকেই অতি বড় পাষণ্ডের চোখেও এক স্বর্গীয় মুখ ফুটে ওঠে। সেই মুখই আপনাকে দেখতে হবে।

কথাগুলো একটু সাড়া জাগাল। তাঁকে জানালাম যে মাসের পর মাস ওই দেয়াল-গুলোর দিকে চেয়ে আমি কাটিয়েছি। আমার সব মুখস্থ। এককালে একটা মুখ ওখানে দেখবার চেষ্টা আমি করেছি, কিন্তু সে মুখে সোনালী রোদের আভা, তাতে কামনার দীপ্তি। সে মুখ মারীর। কিন্তু আমার ভাগ্য খারাপ। সে মুখ আমি দেখতে পাইনি। দেখবার চেষ্টাও এখন ছেড়ে দিয়েছি। আমি অন্তত তাঁর ভাষায় ওই দেওয়ালে কোন মুখ ফুটে উঠতে দেখিনি।

আমার দিকে বিষণ্ণভাবে চেয়ে মৃদুকণ্ঠে কি তিনি বললেন আমি ধরতে পারলাম না। তারপর হঠাৎ তিনি জানতে চাইলেন আমাকে তিনি চুমু খেতে পারেন কিনা।

বললাম,—না।

তিনি কাছে এসে দেওয়ালে একবার হাত বুলিয়ে গলা নামিয়ে বললেন,—এই সব

পার্থিব জিনিস কি আপনি এত ভালবাসেন?

উত্তর দিলাম না।

কিছুক্ষণ অন্য দিকে চেয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। ক্রমশই আরো বিরক্তি লাগছিল। তাঁকে চলে যেতে বলতে যাচ্ছি এমন সময় তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে আবেগভরে বললেন,—না, না এ আমি বিশ্বাস করি না। নিশ্চয়ই আপনি কখনো না কখনো মৃত্যুর পর কিছু আছে বলে ভেবেছেন।

তা'ত ভেবেইছি।—তাঁকে জানালাম,—সকলেই একবার না একবার ভাবে। কিন্তু সে তো বড়লোক হতে চাওয়া কি সাঁতারে আরো ভালো হওয়া বা আরো সুন্দর হতে চাওয়ার মতই। তার কোন দাম নেই।

আরো অনেক কিছু বলছিলাম। তিনি বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মৃত্যুর পর কি হতে পারে বলে আমি ভেবেছি।

প্রায় চীৎকার করে বললাম,—এমন কোন অবস্থা যেখানে এ জীবনের সব কিছু আমি স্মরণ করতে পারি। এর বেশী কিছু নয়।

ওই সঙ্গেই তাঁকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বললাম।

কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে এখনো আরো কিছু বলা তাঁর বাকি, বোঝা গেল।

আমি তাঁর কাছে গিয়ে শেষবার বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে আমার জীবনের মেয়াদ যেটুকু আছে ঈশ্বর নিয়ে তা আমি নষ্ট করতে নারাজ।

তিনি কথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, যে পাদ্রী জেনেও তাঁকে আমি যথোচিত পিতৃ সম্বোধন কেন করিনি।

আরো জ্বলে উঠে বললাম যে তিনি তো আমার সত্যি বাবা নন। বরং তিনি আমার বিপক্ষ দলের লোক।

—না, না, আমি তোমারই দিকে। আমার কাঁধে হাত রেখে তিনি বললেন,—তোমার হৃদয় পাথর হয়ে গেছে বলে তুমি বুঝতে পারছ না। তবু তোমার জন্যে আমি প্রার্থনা করব।

কি যে তারপর হয়ে গেল আমি জানি না। আমার ভেতরে কি যেন চুরমার হয়ে গেল। প্রাণপণে চীৎকার করে আমি তাঁকে গালাগাল দিতে লাগলাম। বললাম,—আমার জন্যে প্রার্থনার পন্ডশ্রম তাঁর দরকার নেই। তাঁর আলখাল্লার গলার দিকটা তখন আমি চেপে ধরেছি। রাগে আর তার সঙ্গে কি এক উল্লাসের উত্তেজনায় যা কিছু এতদিন আমার মগজের মধ্যে গজগজ করেছে সব আমি উগরে দিতে লাগলাম।

কি সবজান্তা তাঁর ভাব! অথচ তাঁর সব তত্ত্বকথার দাম এক কানাকড়িও নয়। একটা মড়া-র যা তাঁর জীবনও তাই। বেঁচে আছেন কিনা তাই ঠিক জানেন না। আমার কিছু নেই মনে হতে পারে কিন্তু আমি তবু নিজেকে জানি। সব কিছু সম্বন্ধে আমার অন্তত যেটুকু স্পষ্ট ধারণা আছে তাঁর তাও নেই। আমার এ জীবন আমি বুঝি, আসন্ন মৃত্যু সম্বন্ধেও আমি সচেতন। এর বেশী আমার কিছু অবশ্য নেই। কিন্তু এই যে নিশ্চয়তাটুকু—এও খাঁটি বাস্তব, কামড়ে ধরবার মত। এ নিশ্চয়তা যেমন আমায় কামড়ে ধরেছে। আমি যা করেছি ঠিকই করেছি। একভাবে আমি জীবন কাটিয়েছি। চাইলে অন্যভাবেই কাটাতে পারতাম। এই ছিল আমার জীবনের ধারা, অন্যরকম নয়। আমি ধরা যাক ক-এর রাস্তায় চলিনি। চলেছি খ কি গ-এর রাস্তায়। তাতে কি বোঝায়? এই বোঝায় যে বরাবর আমি বর্তমানের সেই মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করেছিলাম, সেই ভোরটির জন্যে কাল কি অদূর

ভবিষ্যতে যা আসছে। এই মুহূর্তটিই আমায় সার্থক করবে। আর কিছুর কোন মূল্য নেই। কেন নেই তা আমি জানি। এই পাদ্রীও জানেন। আমার ভবিষ্যতের অন্ধকার দিগন্ত থেকে একটা মৃদু অবিরাম বায়ুস্রোত আমার দিকে বয়ে আসছে বহুকাল ধরে। আর সবাই যে সব ধারণা আমার মনে গাঁথতে চেয়েছে সেই বাতাসেই ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। যে জীবন আমি কাটিয়েছি তা ওই ধারণাগুলোর মতই অবাস্তব। অন্যদের মৃত্যু, মায়ের ভালবাসা, ওই পাদ্রীর ভগবান, কোন একভাবে বাঁচার সম্বন্ধ, যে নিয়তি মানুষ মনে করে তার নিজের বাছাই —এসবে কি আসে যায় আমার। কারণ সেই একই নিয়তি, শুধু আমার নয় আরো লক্ষ লক্ষ যে ভাগ্যবান মানুষ ওই পাদ্রীর মত নিজেদের আমার ভাই বলে, তাদেরও বেছে নেবে। পাদ্রী এটুকু নিশ্চয় বোঝে। মানুষ মাত্রেই এক হিসেবে ভাগ্যবানের দলে। দুনিয়ায় মানুষের একটাই জাত আছে ভাগ্যবানের জাত। একদিন সবাইকেই মৃত্যুদন্ড নিতে হবে। ওই পাদ্রীরও দিন একদিন আসবে। আর খুনের দায়ে পড়ে ফাঁসি হলে মায়ের শেষ কাজের সময় কাঁদেনি বলে তফাতটা হবে কি! কারণ শেষে তো সব সেই একা। সালামানোর স্ত্রীর বেলাও যা তার কুকুরের বেলাও তাই। ওই কলের পুতুলের মত মহিলা আর মাস'কে যে বিয়ে করেছে সেই মেয়েটি সমান অপরাধী। যে আমায় বিয়ে করতে সেধেছিল সেই মারীও তাই। রেমন্ড যে সিলেন্ডিস্তর মতই আমার বন্ধু, তাতে হয়েছে কি? হোক না রেমন্ড মানুষ হিসেবে অনেক ভালো। এই মুহূর্তে মারী যদি নতুন কোন পুরুষবন্ধুকে চুমু খায় তাতেই বা কি আসে যায়। তার মাথার ওপর-ও ফাঁসির দড়ি ঝুলছে। দণ্ডিত হিসাবে ভবিতব্যের সেই কালো হাওয়ার মানে কি সে বুঝতে পারে না?

চেঁচাতে চেঁচাতে আমার দম ফুরিয়ে গেছল। জেলের পাহারাদারেরা ঠিক এই সময় এসে আমার হাত থেকে পাদ্রীকে ছাড়াবার চেষ্টা করলে। একজন তো আমাকে মারতেই উঠল। পাদ্রী-ই তাদের শান্ত করে নীরবে এক মুহূর্ত আমার দিকে চেয়ে রইলেন। দেখলাম তাঁর চোখে জল।

মুখ ফিরিয়ে তারপর তিনি গারদঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

তিনি চলে যাবার পর আবার শান্ত হলাম। কিন্তু এই উত্তেজনায় একেবারে তখন ক্লান্ত হয়ে গেছি। শোবার খাটটার ওপর ভেঙে পড়ে অনেকক্ষণ বোধ হয় ঘুমিয়েছিলাম। যখন জেগে উঠলাম তখন আমার মুখে তারার আলো পড়েছে। বাইরের মাঠঘাটের ক্ষীণ সব শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। মাটি আর সমুদ্রের লোনা গন্ধ মেশানো রাত্রের ঠান্ডা হাওয়া আমার গালে এসে লাগছে। ঘুমন্ত গ্রীষ্ম রাত্রির অপরূপ শান্তি যেন বন্যার মত আমার ভেতর দিয়ে বয়ে গেল। তারপর ঠিক ভোরের আগে একটা স্টীমারের ভোঁ শুনলাম। মানুষেরা এমন এক জগতের যাত্রায় বেরুচ্ছে যার সঙ্গে চিরকালের মতো আমার সম্পর্ক ঘুচে গেছে।

অনেক কাল বাদে এই প্রথম আমার মা-র কথা মনে পড়ল। মনে হল কেন যে তিনি জীবনের প্রান্তে এসে ভালবাসার লোক খুঁজেছিলেন কেন যে জীবনটা আবার নতুন করে শুরু করবার ছল করেছিলেন এতদিনে যেন বুঝলাম। যেখানে জীবনের সব দীপ কেবলই নিভে নিভে যাচ্ছে সেই আশ্রমেও সন্ধ্যা আসে করুণ সান্ত্বনার মত। মৃত্যুর অত কাছে এসে যেন স্বাধীনতার প্রান্তে এসে পৌঁছেছিলেন বলে মার মনে হয়েছিল। আবার যেন জীবন নতুন করে আরম্ভ করার সময় এসেছে। কারুর—পৃথিবীতে কারুর তাঁর জন্যে কাঁদার অধিকার নেই। আমারও মনে হচ্ছে যেন জীবনের নতুন যাত্রা শুরু করবার জন্যে আমি প্রস্তুত। ওই যে রাগে জ্বলে উঠেছিলাম তাতেই যেন আমাকে একেবারে নির্মল করে

দিয়েছে, সব আশা আমার ভেতর থেকে শুষে নিয়েছে। রাত্রির তারার ইঙ্গিতভরা অন্ধকারের দিকে চেয়ে এই প্রথম সৃষ্টির প্রশান্ত ঔদাসীন্যের কাছে হৃদয় মুক্ত করে দিলাম। এ সৃষ্টির সঙ্গে আমার মিল খুঁজে পেয়ে, তার সৌহার্দ্য অনুভব করে এই প্রথম বুঝলাম যে জীবনে আমি সুখীই ছিলাম। এখনও আমি সুখী। একটি আশা এখন শুধু রইল। তাহলেই সব কিছু পূর্ণ হয়। নিজেকে অত নিঃসঙ্গ আর তাহলে লাগবে না। শুধু যদি আমার মৃত্যুদণ্ডের সময়ে অনেক লোক আসে দেখতে আর চীৎকার করে গালাগাল দিয়ে যদি তারা আমায় অভ্যর্থনা জানায়।

অনুবাদ : প্রেমেন্দ্র মিত্র

সমাপ্ত

ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন

সোম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মফস্বলে যে সব এলাকায় নীলকুঠিগুলির পত্তন হয়েছিলো সেই সব এলাকায় চাষীদের আর ক্ষেত-মজুরদের অবস্থা যে আগের তুলনায় অনেক ভালো হয়েছে, তার প্রমাণ নিয়ে "বঙ্গদূত" এগিয়ে এলো মফস্বল এলাকায় ইয়োরোপীয়দের দ্বারা কৃষি-কার্য আরো বিস্তার করা হোক এই দাবীর সমর্থনে।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর পরিচালিত ইংরেজী সাপ্তাহিক "রিফর্মার"-ও পেছিয়ে থাকেনি। মার্টিন তাঁর *History of the British Colonies* নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তৎকালীন বাঙ্গলা প্রেস সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"It should be observed that two of the newspapers given in the English list (the Reformer and Enquirer) are the property of and conducted by native themselves with extraordinary ability . . . . *The Reformer* is, it is said, under the management of a distinguished, wealthy and highly talented Hindoo, Prasanna Coomar Tagore."

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের "রিফর্মার" পত্রিকা মফস্বল অঞ্চলে ইয়োরোপীয়দের বসবাস ও কৃষি-কার্যে ব্যাপৃত হওয়া সম্বন্ধে এই মন্তব্য করলো—

"Among other contemplated changes is a more unrestricted admission of European to this country. Colonization is a subject that has undergone ample discussion, and is certainly deserving of great consideration. We cannot say we participate in the fears of some of our countrymen on this subject. *India wants nothing but the application of European skill and enterprise to render her powerful, prosperous and happy.* (Italics mine—S. T.). The resources and capabilities of India are incalculable, and were European skill and improvements more generally diffused throughout the country the change would be so great, both in the condition of the people, and the appearance of the country, as to bear no more resemblance to what it does at present, than it does now to the wildest parts of Africa. *The idea therefore that the introduction of a few thousand more Europeans into India among 80 millions of people would be injurious to their interests and detrimental to their welfare is perfectly absurd. The reverse would be the case, some of the warmest friends of the natives of India have so expressed themselves.* (Italics mine—S. T.).

The opponents of colonization oppose it for reasons very

different than because it would be injurious to the Natives. We will state one advantage amongst others. Why has the manufacture of cotton in this country been entirely destroyed? Because cheap as labour is here compared to what it is in England, they are enabled to manufacture it, and sell it in our markets cheaper than we can afford to do ; though the raw cotton must be first sent to England and again brought out here, incurring all the charges of freight, shipments etc. *Would this be the case if it were manufactured here precisely in the same manner that it is in England?* (Italics mine—S. T.). Certainly not. And what is to prevent it? Nothing, and this is the true secret why so much alarm has been felt about the establishment of Europeans in India. The idea of the Natives of India suffering oppression from an additional number of European settlers, is equally absurd. They would be subject to the same laws, and would enjoy no peculiar privileges whatever above the Natives: 'amenable to the same courts of justice, living on the fruits of their industry, under the protection of the same law, and subject to the payment of the same taxes as their Native brethren ; they would diffuse a spirit of industry, improvement, and emulation which could not but make the sources from which it flowed, objects of esteem, gratitude and attachment.' Our brethren should bear in mind another thing, the invidious, unworthy, and humiliating distinctions between European and Native are daily diminishing and will be still more so as the Natives of India are admitted to higher offices in the state than they have hitherto been permitted to hold, and as knowledge and information becomes more generally diffused.

Besides, it should be remembered, if we have been kept at a distance by the Europeans, they too have been kept at a distance by us, deeming ourselves polluted by sitting together and regarding them as an inferior caste. Time however and more general diffusion of knowledge and intercourse, will remove these unworthy prejudices on both sides, and nothing is more likely to effect it than colonization."

"রিফর্মার"-এর এই মন্তব্য থেকে তার অভিপ্রায় সুস্পষ্ট। অভিপ্রায় হচ্ছে ইয়োরোপীয়দের নৈপুণ্য ও কর্ম-ক্ষমতাকে ভারতবর্ষের উন্নতির জন্যে ও ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করে তোলবার জন্যে যথাসম্ভব কাজে লাগানো। কাঁচা মালের অভাব নেই ভারতবর্ষে, কিন্তু সেই কাঁচা মাল কাজে লাগানোর ক্ষমতা ভারতবর্ষে নেই। তাই এখান থেকে তুলো বিলেতে গিয়ে

সেখানে কাপড় তৈরী হয়ে ভারতের বাজারে বিক্রী হয় এখানে তৈরী কাপড়ের চেয়েও সস্তা দামে। "রিফর্মার" এই অবস্থা বদল করবার জন্যে পথও বাত্‌লেছেন, বল্‌ছেন—**'এরকম অবস্থা কি হতে পারতো যদি ইংলণ্ডে যে উপায়ে কাপড় তৈরী করা হয়, ঠিক সেই উপায়ে আমরা এখানেও কাপড় তৈরী করতুম ? না, কখনই হতে পারতো না।'** (বড় অক্ষর আমার—সৌম্যেন্দ্রনাথ)

"রিফর্মার" শিল্প-বিপ্লব চান ভারতবর্ষে। কাপড়ের কল ও আরো নানা ধরনের কল বস্‌ক এ দেশে এই হচ্ছে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আন্তরিক ইচ্ছে। এই পরিবর্তন সাধনের জন্যে কয়েক হাজার ইংরেজ এদেশে এসে যদি বাস করে ব্যবসার জন্যে তাতে এ দেশের কোটি কোটি লোকের সর্বনাশ তো হবেই না, বরঞ্চ ভালো হবে। তাদের সাহায্য ছাড়া ভারতের যন্ত্র-বিপ্লব সুরুই হতে পারবে না। ইয়োরোপীয়েরাই কলকারখানা পত্তন করবে, গ্রামাঞ্চলে নানা ধরনের কাঁচা মাল উৎপন্ন করবে, তবে ভারতবর্ষে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হবে। 'কলোনাইজেশন্' এই শব্দটিকে ঘিরে সেদিন যে তুমুল বাদবিতণ্ডা চলছিলো তার মোদ্দা কথাটি ছিলো—শিল্প-বিপ্লব চাই কি শিল্প-বিপ্লব চাই না। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছিলেন শিল্প-বিপ্লবের পক্ষে, বাংলার জমিদারেরা আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী ছিলেন তার বিপক্ষে। আসল কথাটি চাপা পড়ে গিয়েছিলো 'কলোনাইজেশন্' শব্দটির তলায়। ইতিহাসের পথ-চলা এম্‌নি করে বার বার ঢাকা পড়ে যায় কথার ধুলোর নীচে।

আমরা আগেই দেখেছি যে মফস্বলে ইয়োরোপীয়দের বসবাস ও চাষবাস করবার দাবী জানিয়ে যে প্রস্তাব দ্বারকানাথ ঠাকুর উত্থাপন করেন ১৮২৯ খৃস্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বরের টাউন হলের মিটিংয়ে, রামমোহন তার সমর্থন করেন। তার প্রায় এক বছর পরে ১৮৩০ খৃস্টাব্দের শেষাশেষি রামমোহন ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৮৩১ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাস নাগাদ তিনি ইংলণ্ডে পৌঁছন। লণ্ডনে পেঁছনোর পরেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর ডিরেক্টরদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার ও ইয়োরোপীয়দের ভারতবর্ষে বসবাসের অধিকার নিয়ে তাঁদের সঙ্গে রামমোহনের আলাপ আলোচনা হয়। ১৮৩১ খৃস্টাব্দের ২০শে অগস্ট তারিখের "সমাচার দর্পণ" পত্রিকায় এই খবরটি ছাপা হয়—

শ্রীযুক্ত বাবু রামমোহন রায়

১৮৩১ সালের ১২ আপ্রিলের লিবরপুল নগরের পত্রে লেখে যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ৮ আপ্রিলে নির্বিঘ্নে ঐ নগরে পঁহুছেন এবং উপনীত হইয়া অবধি নগরস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে বাবুর আলাপ করণে প্রায় প্রত্যেক ঘণ্টা ক্ষেপ হয়। পরে ১২ তারিখে নগরস্থ ইস্ট ইণ্ডিয়া কমিটির কয়েকজন সাহেব বাবু রামমোহন রায়ের আগমন জন্য সন্তোষ জ্ঞাপনার্থ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন যে কোম্পানির বিরুদ্ধে আপনি আমারদিগের যে অনেক প্রকার সাহায্য করিবেন এমত আমাদের ভরসা। তাহাতে বাবু উত্তর করিলেন যে আমার যে যে অভিপ্রেত তাহা বিরোধের দ্বারা নিষ্পত্তি না হইয়া সলা দ্বারা যে নিষ্পত্তি হয় এমত বাঞ্ছা। **আদালত সম্পর্কীয় কোন কোন সুনিয়ম করিতে এবং স্বীয় বাণিজ্য রহিত করিতে এবং দেশ মধ্যে লবণাদির একচেটিয়া রূপে ব্যবসায় ত্যাগ করিতে এবং ইয়োরোপীয়দিগকে স্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষে আগমন ও বসবাসার্থ অনুমতি দিতে এবং মোকদ্দমা ব্যতিরেকে তাঁহারদিগকে তদ্দেশ বহির্ভূত করিতে যে ক্ষমতা আছে তাহা রহিত করিতে ইত্যাদি বিষয়ে যদ্যপি কোম্পানি**

বাহাদুর স্বীকৃত হন তবে তাঁহারা যে পুনর্বার চার্টর পান ইহাতে আমি বিপক্ষতাচরণ না করিয়া বরং সপক্ষ হইব।" (বড় অক্ষর আমার—সৌম্যেন্দ্রনাথ)

"সমাচার দর্পণ"-এ প্রকাশিত এই খবরটিতে দুটি জিনিস লক্ষ্য করবার আছে। একটির সঙ্গে অবিশ্যি প্রবন্ধের বিষয় বস্তুর কোনো সম্বন্ধ নেই। তবুও সেটি প্রণিধানযোগ্য। সংবাদটির উপরে লেখা আছে, "শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়"। দিল্লীর বাদশার দেওয়া 'রাজা' খেতাব তখনো ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট স্বীকার করে নেয় নি বোঝা যাচ্ছে। দ্বিতীয় বস্তুটি থেকে রামমোহনের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী ভারতে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ছেড়ে দিক, ইয়োরোপীয়দের গ্রাম্যঞ্চলে বাস করে চাষবাস করবার অধিকার দিক এবং ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়দের বৈষম্যহীন এক আইনের আওতায় নিয়ে আসুক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী, রামমোহন তাহলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীকে পুনর্বার চার্টর পেতে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন। অবাধ বাণিজ্যের নীতি গৃহীত না হলে ভারতে শিল্প-বিপ্লব কিছুতেই ঘটতে পারে না। রামমোহন তাই ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার বনাম অবাধ বাণিজ্য-অধিকারের সংঘাতে অবাধ বাণিজ্য-অধিকারের পক্ষ হয়ে ব্যবসার একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ তারিখের "সমাচার দর্পণ" পত্রিকায় নিম্ন-লিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়—

রাজা রামমোহন রায়

ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ভারতবর্ষের রাজস্ব ও আদালত সম্বলিত ও বাণিজ্যবিষয়ক নিয়ম সম্পর্কীয় কতক প্রশ্ন লিখিয়া রায়জীকে দেওয়া যায়। ইহার উত্তরপ্রত্যুত্তর সকল তিনি প্রস্তুত করিতেছেন। কথিত আছে যে সকলেই তাহাতে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ভারতবর্ষের আদালত সম্পর্কীয় নিয়মের যে প্রশ্ন হয় তাহার উত্তর সেপ্তেম্বর মাসের প্রথমেই প্রায় সম্পন্ন হইয়াছিল এবং তিনি যখন ঐ সকল বিষয়ের উত্তর বিস্তারিত রূপে প্রস্তুত করিবেন তখন দেওয়ানী ও ফৌজদারী জমীদার প্রভৃতির তাবদ্বিষয়ক তন্মধ্যে সুপ্রকাশিত হইবে। উক্ত আছে যে জুরীর দ্বারা মোকদ্দমা নিষ্পন্ন করা ও আদালত সম্পর্কীয় এতদ্দেশীয় জজ নিযুক্ত করা ও তাবদ্বিষয়ের প্রকৃত রেজিষ্টরী রাখা ও তাবৎ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের সংহিতা করা ও পারস্যের পরিবর্তে ইঙ্গরেজী ভাষা ব্যবহার হওন প্রভৃতি এতদ্দেশের নানা সৌষ্ঠবসূচক প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন।'

এই সংবাদটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট ইতিমধ্যে রামমোহনের 'রাজা' উপাধি স্বীকার করে নিয়েছেন। জানা যাচ্ছে যে রামমোহনকে পার্লামেণ্টীয় কমিটির তরফ থেকে বাণিজ্য, আদালত ও রাজস্ব বিষয়ক নানা লিখিত প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে আর তিনি তার উত্তর তৈরী করতে ব্যস্ত আছেন। ভারতবর্ষে ইয়োরোপীয়দের বসবাস সম্বন্ধে পার্লামেণ্টীয় কমিটি রামমোহনকে যে প্রশ্ন দুটি করেছিলো তার নিম্নলিখিত উত্তর তিনি দিয়েছিলেন—

Question—Would it be injurious or beneficial to allow Europeans of capital to purchase estates and settle on them?

Answer—If Europeans of character and capital were allowed to settle in the country, with the permission of India Board or the Court of Directors, or the local government, *it would greatly improve the resources of the country, and also the conditions of the native inhabitants, by shewing them superior methods of cultivation, and the proper mode of treating their labourers and dependants.* (Italics mine—S. T.).

Question—Would it be advantageous or the reverse to admit Europeans of all descriptions to become settlers?

Answer—*Such a measure could only be regarded as adopted for the purpose of entirely supplanting the native inhabitants and expelling them from the country.* (Italics mine—S. T.). Because it is obvious that there is no resemblance between the higher and educated classes of Europeans and the lower and uneducated classes. The difference in character, opinion and sentiments between European and Indian race, particularly in social and religious matters, is so great, that the two races could not peacefully exist together, as one community, in a country conquered by the former etc.

রামমোহনের এই সওয়াল-জবাব থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তিনি শুধু 'Europeans of character and capital' এ দেশে এসে বাস করুক তাই চেয়েছিলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে সাধারণ ইয়োরোপীয়রা পঙ্গপালের মতো এদেশে এসে হাজির হোক এ তিনি আদবেই চান নি। এই সাধারণ ইয়োরোপীয়রা এ দেশে যদি দলে দলে আসে তার মানে হবে এ দেশের লোকদের দেশ থেকে খেদিয়ে দেওয়া—সে কথাও রামমোহন তাঁর লিখিত জবাবে বল্‌লেন। তবে মূলধনের মালিক এমন ইয়োরোপীয়েরা এ দেশে এলে দেশের কল্যাণ হবে। তারা উন্নত কৃষি-প্রণালী শিক্ষা দেবে এ দেশের লোকদের। তার ফলে দেশের কাঁচা-মাল বৃদ্ধি পাবে, দেশের লোকের অবস্থা ফিরবে। শুধু তাই নয়, শিক্ষিত ইয়োরোপীয়দের কাছ থেকে এ দেশের লোকেরা শিখবে কেমন করে মজুরদের সঙ্গে ও আশ্রিতদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর দৌলতে এক জাতের ইংরেজ তো আস্‌ছিলই এ দেশে। তারা এদেশের কাঁচা মাল নিয়ে গিয়ে বিলেতের কলে তৈরী জিনিস এদেশে এনে এখানকার কুটীর-শিল্পগুলিকে শুধু ভেঙেই দিচ্ছিলো। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী এখানে কোনো কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করছিলো না। অবাধ বাণিজ্যনীতি গৃহীত হোক ও তার ফলে মূলধনের মালিক ইয়োরোপীয়েরা এ দেশে এসে কলকারখানা পত্তন করুক, এদেশের কাঁচামাল এদেশের কল-কারখানায় উৎপাদনের কাজে লাগুক—এই ছিলো রামমোহনের ও দ্বারকানাথের অভিপ্রায়। এর ফলে ভারতের যে শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি হবে তা নয়, সামাজিক উন্নতিও সাধিত হবে। যে জঘন্য আচরণ ক্ষেত-মজুরেরা ও চাষীরা পেতো জমিদারদের কাছ থেকে তার পরিবর্তন ঘটবে। অর্থনৈতিক বিপ্লব ও সামাজিক বিপ্লব ঘটাবে শিল্প-বিপ্লব।

এই বিষয়টি নিয়ে রামমোহন ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লণ্ডনের পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সেই প্রবন্ধে রামমোহন লেখেন—

Much has been said and written by persons in the employ of the Honourable East India Company and others on the subject of the settlement of Europeans in India, and various opinions have been

expressed as to the advantages and disadvantages which might attend such a political measure. I shall here briefly and candidly state the principal effects which, in my humble opinion, may be expected to result from this measure.

I notice, first, some of the advantages that might be derived from such a change.

ADVANTAGES.

First. European settlers in India will introduce the knowledge they possess of superior modes of cultivating the soil and improving its products (in the article of sugar, for example), as has already happened with respect to indigo, and improvements in the technical arts, and in the agricultural and commercial systems generally, by which the natives would of course benefit.

Secondly. By free and extensive communication with the various classes of the native inhabitants, the European settlers would gradually deliver their minds from the superstitions and prejudices, which have subjected the great body of the Indian people to social and domestic inconvenience, and disqualified them from useful exertions.

Thirdly. The European settlers being more on a par with the rulers of the country, and aware of the rights belonging to the subjects of a liberal Government, and the proper mode of administering justice, would obtain from the local Governments, or from the Legislature in England, the introduction of many necessary improvements in the law and judicial system ; the benefit of which would of course extend to the inhabitants generally, whose condition would thus be raised.

Fourthly. The presence, countenance and support of the European settlers would not only afford to the natives protection against the impositions and oppression of their landlords and other superiors, but also against any abuse of power on the part of those in authority.

Fifthly. The European settlers, from motives of benevolence, public spirit and fellow-feeling towards their native neighbours, would establish schools and other seminaries of education for the cultivation of the English language throughout the country, and for the diffusion of a knowledge of European arts and sciences ; whereas at present the bulk of the natives (those residing at the Presidencies

and some large towns excepted) have no more opportunity of acquiring this means of national improvement than if the country had never had any intercourse or connection whatever with Europe.

Sixthly. As the intercourse between the settlers and their friends, and connections in Europe would greatly multiply the channels of communication with this country, the public and the Government here would become much more correctly informed, and consequently much better qualified to legislate on Indian matters than at present when, for any authentic information, the country is at the mercy of the representations of comparatively a few individuals, and those chiefly the parties who have the management of public affairs in their hands, and who can hardly fail therefore to regard the result of their own labours with a favourable eye.

Seventhly. In the event of an invasion from any quarter, east or west, the Government would be better able to resist it, if, in addition to the native population, it were supported by a large body of European inhabitants, closely connected by national sympathies with the ruling power, and dependent on its stability for the continued enjoyment of their civil and political rights.

Eighthly. The same cause would operate to continue the connection between Great Britain and India on a solid and permanent footing, provided only the latter country be governed in a liberal manner, by means of Parliamentary superintendence, and such other legislature checks in this country as may be devised and established. India may thus, for an unlimited period, enjoy union with England, and the advantage of her enlightened Government ; and in return contribute to support the greatness of this country.

Ninthly. If, however, events should occur to effect a separation between the two countries, then still the existence of a large body of respectable settlers (consisting of Europeans and their descendants professing Christianity, and speaking the English language in common with the bulk of the people, as well as possessed of superior knowledge, scientific, mechanical, and political) would bring that vast empire in the East to a level with other large Christian countries in Europe, and by means of its immense riches and extensive population, and by the help which may be reasonably expected from Europe, they (the settlers and their descendants) may

succeed sooner or later in enlightening and civilizing the surrounding nations of Asia.

I now proceed to state some of the principal disadvantages which may be apprehended, with the remedies which I think calculated to prevent them, or at any rate their frequent occurence.

DISADVANTAGES.

First. The European settlers being a distinct race, belonging to the class of the rulers of the country, may be apt to assume an ascendancy over the native inhabitants, and aim at enjoying exclusive rights and privileges, to the depression of the larger, but less favoured class ; and the former being also of another religion, may be disposed to wound the feelings of the natives and subject them to humiliation on account of their being of a different creed, colour and habits.

As a remedy or preventive of such a result, I would suggest, first, that as the higher and better educated classes of Europeans are known from experience to be less disposed to annoy and insult the natives than persons of a lower class, *the European settlers, for the first twenty years at least, should be from among educated persons of character and capital,* (Italics mine—S. T.) since such persons are very seldom, if ever, found guilty of intruding upon the religions or national prejudices of persons of uncultivated minds ;

Secondly. *The enactment of equal laws, placing all classes on the same footing as to civil rights, and the establishment of trial by jury (the jury being composed impartially of both classes)*—(Italics mine S. T.) would be felt as a strong check on any turbulent or overbearing characters amongst Europeans.

The second problem disadvantage is as follows ; the Europeans possess an undue advantage over the natives, from having readier access to persons in authority, these being their own countrymen, as proved by long experience in numerous instances ; therefore, a large increase of such a privileged population must subject the natives to many sacrifices from this very circumstance.

I would therefore propose as a remedy, that in addition to the native Vakeels, European pleaders should be appointed in the country courts in the same manner as they are in the King's Courts at the Presidencies, where the evil referred to is consequently not felt, because the counsel and attornies for both parties, whether for

a native or a European, have the same access to the judge, and are in all respects on an equal footing in pleading or defending the cause of their clients.

The third disadvantage in contemplation is, that at present the natives of the interior of India have little or no opportunity of seeing any European except persons of rank holding public office in the country, and officers and troops stationed in or passing through it under the restraint of military discipline, and consequently those natives entertain a notion of European superiority, and feel less reluctance in submission ; but should Europeans of all ranks and classes be allowed to settle in country, the natives who come in contact with them will materially alter the estimate now formed of the European character, and frequent collision of interests and conflicting prejudices may gradually lead to a struggle between the foreign and native race till either one or the other obtain a complete ascendency, and render the situation of their opponents so uncomfortable that no government could mediate between them with effect, or ensure the public peace and tranquillity of the country. Though this may not happen in the interior of Bengal, yet it must be kept in mind, that no inference drown from the conduct of the Bengalese (whose submissive disposition and want of energy are notorious) can be applied with justice to the natives of the Upper Provinces, whose temper of mind is directly the reverse. Among this sprited race the jarrings above alluded to must be expected, if they be subjected to insult the intrusion—a state of things which would ultimately weaken, or at least occasion much bloodshed from time to time to keep the natives in subordination.

The remedy already pointed out (paragraph 3rd. article 1st. remedy 1st.) will, however, also apply to this case, that is the restriction of the European settlers to the respectable and intelligent class already described, who in general may be expected not only to raise the European character still higher, but also to emancipate their native neigbours from the long-standing bondage of ignorance and superstition, and thereby secure their affection, and attach them to the government under which they may enjoy the liberty and privileges so dear to persons of enlightened minds.

Some apprehend, as the fourth probable danger, that if the population of India were raised in wealth, intelligence, and public

spirit, by the accession and by the example of numerous respectable European settlers, the mixed community so formed would revolt (as the United States of America formerly did) against the power of Great Britain, and would ultimately established independence. In reference to this, however, it must be observed that the Americans were driven to rebellion by mis-government, otherwise they would not have revolted and separated themselves from England. Canada is a standing proof that an anxiety to effect a separation from the mother country is not the natural wish of a people, even tolerably well ruled. The mixed community of India, in like manner, so long as they are treated liberally, and governed in an enlightened manner, will feel no disposition to cut off its connection with England, which may be preserved with so much mutual benefit to both countries. Yet, as before observed, if events should occur to effect a separation, (which may arise from many accidental causes, about which it is vain to speculate or make predictions), still a friendly and highly advantageous commercial intercourse may be kept up between two free and Christian countries, united as they will then be by resemblance of language, religion and manners.

The fifth obstacle in the way of settlement in India by Europeans, is, that the climate in many parts of India may be found destructive, or at least very pernicious to European constitution, which might oblige European families who may be in possession of the means to retire to Europe to dispose of their property to disadvantage, or leave it to ruin, and that they would impoverish themselves instead of enriching India. As a remedy I would suggest that many cool and healthy spots could be selected and fixed upon as the head-quarters of the settlers, (where they and their respective families might reside and superintend the affairs of their estates in the favourable season, and occasionally visit them during the hot months, if their presence be obsolutely required on their estates), such as the Suppato, the Nilgherry Hills, and other similar places, which are by no means pernicious to European constitutions. At all events, it will be borne in mind that the emigration of the settlers to India is not compulsory, but entirely optional with themselves.

To these might be added some minor disadvantages, though not so important. These (as well as the above circumstances) deserve fair consideration and impartial reflection. At all events, no one will, I trust, oppose me when I say, that the settlement in India by Europeans should at least be undertaken experimentally, so that its effects may be ascertained by actual observation on a moderate scale. If the result be such as to satisfy all parties, whether friendly or opposed to it, the measure may then be carried on to a greater extent, till at last it may seem safe and expedient to throw the country open to persons of all classes.

On mature consideration, therefore, I think I may safely recommend that educated persons of character and capital should now be permitted and encouraged to settle in India, without any restriction of locality or any liability to banishment, at the discretion of the government; and the result of the experiment may serve as a guide in any future legislation on this subject.

RAMMOHUN ROY

JULY 14th, 1832.
LONDON

ইংরেজরা ভারতবর্ষে বসবাস করলে তার কি ফলাফল হতে পারে সে সম্বন্ধে রামমোহন বিশদভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর এই বিবৃতিটিতে। ইয়োরোপীয়দের ভারতবর্ষে বসবাসের ভালোর দিক ও মন্দর দিক, দুই দিকই তিনি ধরে দিয়েছেন সকলের কাছে নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে। ইয়োরোপীয়েরা এদেশে বাস করলে কৃষির উন্নত প্রণালী, জমিকে সুফলা করবার যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তাদের আছে সেই জ্ঞান, যন্ত্রসংক্রান্ত টেক্‌নিকাল জ্ঞান ও বাণিজ্যসংক্রান্ত জ্ঞান—এই সব শিক্ষা করে লাভবান হবে এ দেশের লোক। তাছাড়া ইয়োরোপীয়দের সংস্পর্শে এসে এ দেশের লোকের নানা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূর হবে, যে সব কুসংস্কার ভারতের লোকদের নানা প্রয়োজনীয় কাজে যোগ দিতে বাধা দিচ্ছে। ইয়োরোপীয়েরা এ দেশে বসবাস করলে বিচার-প্রণালীতে ও আইন-বিষয়ে অনেক পরিবর্তন সাধিত হবে, জমিদারদের ও রাজ-কর্মচারীদের নিপীড়নের হাত থেকে দেশের লোক বাঁচবে, তারা বিদ্যালয় ও নানা ধরনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পত্তন করবে এ দেশে যেখানে সাহিত্য ও বিজ্ঞান শেখানো হবে, পার্লামেণ্টারী শাসন-পদ্ধতি অনুসারে ভারত শাসিত হবে, পূর্ব ও পশ্চিম থেকে নানা শক্তির আক্রমণ ঠেকাতে পারবে ভারতবর্ষ। ইংলণ্ডের সঙ্গে যদি অচ্ছেদ্য যোগ-সূত্রে আবদ্ধ হয় ভারতবর্ষ উদার-নৈতিক পার্লামেণ্টীয় শাসনের বন্ধনে, তো হোলো, আর যদি তা নাও হয়, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ নানা কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তাহলেও কিছু সংখ্যক ইয়োরোপীয়েরা ভারতে বাস করলে বিজ্ঞান, রাজনীতি ও উৎপাদন-যন্ত্র সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান এ দেশের লোকের প্রভূত উপকার সাধন করবে এবং এশিয়ার অন্য অন্য দেশগুলিতেও জ্ঞানের ও সভ্যতার বিস্তার করবে।

এইগুলি হোলো রামমোহনের মতে ইংরেজদের এ দেশে বসবাসের ভালোর দিক। মন্দর দিকে তিনি দেখিয়েছেন যে শাসকদের স্বজাতি হওয়ায় যে ইংরেজরা এ দেশে বাস করবে তারা এদেশবাসীদের উপর প্রভুত্ব ফলাবে, নানারকম সুযোগ সুবিধে আত্মসাৎ করবে আর এদেশের লোকদের ধর্ম-বিশ্বাসকে আঘাত হানবে। গভর্মেণ্টের লোকেরা তাদের নিজেদের দেশের লোক হওয়ায় এই ইংরেজরা খুব সহজেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে যা

এদেশের লোকদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এর সুযোগ ইয়োরোপীয় বাসিন্দেরা নেবে। ইয়োরোপীয়েরা এদেশে বাস করে যদি বিবেচনার সঙ্গে সংযত ভাবে এদেশের লোকদের সঙ্গে ব্যবহার না করে তো বিবাদ বিসম্বাদ লেগেই থাকবে ভারতীয়দের সঙ্গে তাদের, ফলে রক্তপাত ঘটাও বিচিত্র নয়।

এই অপকারগুলো ঘটতে পারে যদি ইয়োরোপীয়েরা এদেশে স্থায়ীভাবে বাস করে। তাই রামমোহন বলেছেন যে এটিকে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে সাবধানতার সঙ্গে, আর শুধু সেই সব ইয়োরোপীয়দের ভারতে বাস করতে দেওয়া যেতে পারে যারা শিক্ষিত, উন্নত-চরিত্র ও মূলধনের অধিকারী— 'educated persons of character and capital should now be permitted and encouraged to settle in India.'

ইংরেজরা দলে দলে এসে পঙ্গপালের মতো এদেশের মাঠ উজাড় করে ফসল খেয়ে যাক এ সর্বনাশী কল্পনা রামমোহনের মাথায় কখনো আসে নি, আসা সম্ভবও ছিলো না। ভারতবর্ষের অবনতি দেখে তিনি দুঃখে ও ব্যথায় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিলেন। ভারতবর্ষকে আবার বিশ্বমানবসভায় তার যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিলো তাঁর জীবনের ধ্যান ও কর্ম। তিনি স্বপ্ন-বিলাসী ছিলেন না। ভারতবর্ষ তখন ইংরেজের অধীনে এসে গেছে। দেশ তখন শতধা বিভক্ত। কোনো সংহত জাতীয়-শক্তিই তখন নেই এ দেশে। দিল্লীর বাদশার বাদশাহী তখন গোধূলিলগ্নে। সেই বাদশাহী ছিলো জায়গীরদারী সমাজ-ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের অগ্রগতির পায়ের শিকল ছিলো সেই বাদশাহী। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ধাপে ভারতবর্ষকে উন্নীত করবার কোনো সামর্থই তার ছিলো না। ইংরেজ বণিক এলো এই দেশে, রামমোহনের আমন্ত্রণে তারা আসেনি। এসেছিলো তারা এদেশে ঐতিহাসিক শক্তির ধাক্কায়—বাজার-সন্ধানে। তারপরে বণিকেরা বাঁ হাতে ধরলো দাঁড়িপাল্লা, ডান হাতে নিলো রাজদণ্ড। ইংরেজ রাজত্ব গেড়ে বস্‌লো এদেশে। এই সময়ে রামমোহনের আবির্ভাব। ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়ানোর শক্তি তখন এদেশের লোকের বিন্দুমাত্র ছিলো না। তাই রামমোহনেরও ছিলো না। এদেশের লোক তখন এক দিকে ইংরেজের পদলেহন করছে, অন্য দিকে ক্লীবের মতো মনে মনে ব্যর্থ বিদ্বেষ পোষণ করছে। কি শক্তির প্রতীক স্বরূপ ইংরেজ এদেশে এসেছে, সেই শক্তি ভারতের কল্যাণকর হবে কি না, ইংরেজকে দিয়ে সেই কাজগুলো কি করে করিয়ে নেওয়া যায় ভারতের উন্নতির জন্যে—এ সবের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিলো না এদেশবাসীর। সমাজের মোড়ল হিসেবে যাঁরা ছিলেন, 'ধর্ম-সভা'-র সেই নেতারা, তাঁদের মনে ঐতিহাসিক চেতনা বলে বস্তুটির কোনো বালাই ছিলো না। ইতিহাসের ঘটনাপরম্পরার ঘাতপ্রতিঘাত যে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করছিলো তার আলোকে এঁরা চোখ বন্ধ করে পেচক-বৃত্তির দ্বারা স্বাগত জানিয়েছিলেন। সেই বন্ধ্যা সামাজিক-অবস্থার মধ্যে দেখা দিলেন ঐতিহাসিক-চেতনাসম্পন্ন রামমোহন রায় ও তাঁর সহকর্মী ঐতিহাসিকবোধসম্পন্ন দ্বারকানাথ ঠাকুর। সচেতনভাবে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই দুইজন, ভারতবর্ষের নৌকা যা বদ্ধ জলে থম্‌কে দাঁড়িয়েছিল, তাকে তাঁদের জ্ঞানের ও কর্মের গুণ দিয়ে টেনে নিয়ে বিশ্বের স্রোতের মধ্যে ভাসিয়ে দেবার জন্যে এগিয়ে এলেন। ইংরেজ বণিক এসেছিলো তার মতলব্ সিদ্ধ করতে; তারা এসেছিলো অর্থের জন্যে, পরমার্থের জন্যে নয়। ভারতবর্ষে ইংরেজদের আগমনের ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে কি করে ইংরেজদের উপস্থিতিকে ভারতবর্ষের উন্নতির কাজে লাগানো যেতে পারে সেইটে ছিলো রামমোহনের ও দ্বারকানাথের সাধনার বিষয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা-বিষয়ক—সর্বদিক থেকে পরিবর্তন আন্‌তে হবে ভারতবর্ষে।

ঐতিহাসিক ধারা ভারতবর্ষের পাড় দিয়ে বইছিলো না। বন্ধজলে অনড় নৌকোর মতো দাঁড়িয়েছিল ভারতবর্ষ। তাকে স্রোতের জলে ভাসিয়ে দিতে গেলে যে শক্তি দরকার সেই শক্তি ইংরেজ জাতির কাছ থেকে আহরণ করা ছাড়া উপায় ছিলো না। তাদেরই সেদিন মাল্লা করে ভারত-তরীকে বন্ধ জল থেকে স্রোতের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। এইটি ছিলো ইতিহাসের নির্দেশ সে যুগে। রামমোহন ও দ্বারকানাথ সেটা পরিষ্কার ভাবে বুঝেছিলেন। তাই ইংরেজের সহযোগিতায় ভারতের বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক বিপ্লব সম্পন্ন করবার জন্যে দুটি অসামান্য পুরুষ সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন—রামমোহন ও দ্বারকানাথ।

শেষ

আধুনিক সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যে গীতি-কবিতা ও ছোট গল্পের যে পরিমাণ উৎকর্ষ ঘটেছে নাটক ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা কেন হয়নি সে সম্বন্ধে সমালোচকরা কৈফিয়ৎ দেন যে, আমাদের জীবনের বৈচিত্র্যহীনতাই এ জন্য দায়ী। এখানে ঘটনা-বৈচিত্র্যের কথাই বলা হয়েছে, যা প্রধানতঃ বাহিরের জিনিস। বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ জীবন শুধু বাংলাদেশ থেকে নয়,পৃথিবীর সকল দেশ থেকেই বিদায় নিয়েছে বলা যেতে পারে। মধ্যযুগের ঘটনাবহুল রোমাঞ্চকর জীবন-যাত্রা যন্ত্রযুগের বাঁধা ছকের কাছে হার মেনেছে। এখন আমাদের পোশাক, খাওয়া, আপিসের রুটিন, চিত্তবিনোদনের পদ্ধতি ইত্যাদি ক্রমশঃ এক হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং বাহিরের জীবনে বৈচিত্র্য বড় কম। তাই আধুনিক ঔপন্যাসিকরা মানুষের অন্তরের জগতে প্রবেশ করেছেন। সেখানকার বৈচিত্র্য এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। দু'জন কেরানীর বাহ্যিক জীবন-যাত্রা এক; কিন্তু মনের জগতে তারা আলাদা। এই বৈচিত্র্য মনোবিজ্ঞানমূলক উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন। বাংলা উপন্যাস এখনো মূলতঃ ঘটনানির্ভর; অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরের জগতকে উদ্‌ঘাটিত করবার প্রচেষ্টা দেখা গেছে অল্প দু'একজন লেখকের মধ্যে।

ঘটনানির্ভরতাই যদি উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয় তাহলে মন্বন্তর থেকে দেশ-বিভাগ পর্যন্ত চিত্তবিক্ষোভকারী ঘটনাবলীর অভাব বাংলা দেশে ছিল না। জাতির মনের গভীর বেদনাকে মহৎ উপন্যাসে শিল্পরূপ দেবার সফল দৃষ্টান্ত কিন্তু বাংলা সাহিত্যে নেই। কথাশিল্পীর সংবেদনশীল চিত্তে বেদনার এত বড় ঐশ্বর্য কেন ব্যর্থ হয়ে গেল এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া কঠিন। বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র গীতি-কবিতা ও ছোটগল্পের উপযোগী, নাটক ও উপন্যাস রচনার নয়,—এটাই সম্ভাব্য উত্তর বলে মনে হয়। নাটক ও উপন্যাসের কাহিনী এবং চরিত্র সফল পরিণতিতে আনবার জন্য যে পরিকল্পনা, নিষ্ঠা, ধৈর্য ও পরিশ্রম প্রয়োজন তার অভাব আছে আমাদের মধ্যে। অনুভূতির উত্তাপে আমরা হঠাৎ জ্বলে উঠি, হঠাৎ নিভে যাই। গীতিকবিতা ও ছোট গল্প রচনার পক্ষে এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুকূল।

স্বভাবতই উপরোক্ত বক্তব্যেরও ব্যতিক্রম আছে। বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস-শাখায় প্রকৃত শক্তিমত্তার দৃষ্টান্ত অবশ্যই পাওয়া যাবে। তেমন দৃষ্টান্ত সংখ্যায় কম এবং অধিকাংশ সার্থক উপন্যাসই লেখা হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে। ইদানীংকালে উপন্যাস শাখার দুর্বলতার বিশেষ কারণ ঘটেছে। এখন পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর বাংলা বইয়ের মধ্যে বাজারে সবচেয়ে বেশী চাহিদা উপন্যাসের। এই আকর্ষণে যাঁরা সত্যিকার কথাশিল্পী নন তাঁরাও উপন্যাস লিখছেন। যাঁরা প্রতিষ্ঠিত কথাশিল্পী তাঁদের রচনায়ও আগের মতো নিষ্ঠা নেই। ছোট গল্পকে টেনে বড় করে দিলেও প্রকাশকের কাছে উপন্যাসের মর্যাদা পাবে। সুতরাং আধুনিক বাংলা উপন্যাসে লেখকের যত্নশীলতার অভাব দেখা যায়।

আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে উপন্যাসের বৈচিত্র্য আজকাল এত বেড়েছে যে একটি সংজ্ঞা দিয়ে তাকে গণ্ডিবদ্ধ করা যায় না। তবে লেখকরা কেন উপন্যাস লেখেন

তার মোটামুটি তিনটি কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে : প্রথমতঃ পাঠকদের নিছক আনন্দ দেওয়া; দ্বিতীয়তঃ, কোন একটি তত্ত্ব বা বক্তব্যকে উপস্থিত করা; তৃতীয়তঃ, একটি ঐতিহাসিক বা সামাজিক পরিবেশকে জীবন্ত করে তোলা। এদিক থেকে বিচার করলে উপন্যাস-সাহিত্যকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। অবশ্য সকল শ্রেণীর উপন্যাসেরই মূল কথা হল আনন্দ দেওয়া।

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)-এর রচনা একটি বিশেষ তত্ত্ব বা বক্তব্যের দ্বারা চিহ্নিত। সমাজসচেতন মননশীল লেখকের রচনায় এ বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তত্ত্বকে শিল্পরূপ দেওয়া কঠিন কাজ। বনফুলের প্রথম পর্বের রচনায় বক্তব্য ও শিল্প-কলার যে মিশ্রণ দেখতে পাই, সাম্প্রতিক রচনায় তার অভাব আছে। "অগ্নীশ্বর" ও "উদয় অস্ত" বনফুলের সর্বাধুনিক দু'টি উপন্যাস। "উদয় অস্ত" শেষ হয়নি বলে মনে হয়; বোধ হয় কাহিনীর প্রথম অংশ সমাপ্ত হয়েছে, যদিও বইয়ের মধ্যে কোথাও তেমন ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি। সুতরাং এই উপন্যাসে লেখকের বক্তব্য এখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

"অগ্নীশ্বর" হল 'নভেল অব ক্যারেক্টার।' নায়ক অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কাহিনীর মাধ্যমে লেখক তাঁর স্বাধীনতাপ্রীতি, মানবিকতাবোধ এবং সকল প্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। অগ্নীশ্বর চেহারায় সুপুরুষ; তাঁর অন্তর অগ্নিগর্ভ। তিনি ডাক্তার, হাতযশ আছে; কিন্তু উগ্র ব্যক্তিত্বের জন্য পশার হয়নি। অগ্নীশ্বর চাকরি করতেন। রেলের এক সাহেব তাঁর সঙ্গে অসম্মানজনক ব্যবহার করায় তিনি সিক রিপোর্ট দিয়ে সকল ড্রাইভারদের ছুটি সুপারিশ করে ও লাইনে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আবার নিজেকে গোপন করে অনেক সময় তিনি বিপন্ন রোগী ও তাদের আত্মীয়স্বজনকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। কঠোর ও কোমলের মিলন ঘটেছে তাঁর চরিত্রে। অগ্নীশ্বরের বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের মিলন হয়নি; কারণ শিক্ষা-দীক্ষায় স্ত্রী ছিলেন তাঁর অনেক নীচে। কয়েক বছর পরে স্ত্রীর মৃত্যু হল। অগ্নীশ্বরের পরে অনুশোচনা হয়েছে বোধ হয় তাঁর অবহেলার জন্যই স্ত্রীর অকালমৃত্যু ঘটেছে। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর অগ্নীশ্বরের ছেলে ধনীর মেয়েকে বিয়ে করল। ছোট বাড়িতে তাঁর উপস্থিতি পুত্র ও পুত্রবধূর অসুবিধার কারণ হতে পারে মনে করে তিনি কাউকে কিছু না বলে উত্তর প্রদেশের এক হাসপাতালে চাকরি নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু এখানে তাঁর বেশী দিন থাকা হল না। দরিদ্র রোগীদের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদে চাকরি ত্যাগ করে আবার একদিন পথে বেরিয়ে পড়লেন। কাহিনী সমাপ্তির পূর্বে দেখা গেল অগ্নীশ্বর ছদ্মবেশে জিপসিদের দলপতিত্ব করছেন। জিপসিদের কাছে তিনি খা-খা-বাবা নামে পরিচিত। চারটে খুনের তদন্ত উপলক্ষ্যে পুলিশ খা-খা-বাবাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্য ধরে এনেছে। তদন্তকারী কর্তার মনে হল খা-খা-বাবা অগ্নীশ্বর মুখুজ্যে ছাড়া আর কেউ নয়। জেরার উত্তরে অগ্নীশ্বর বললেন, 'যে চারটে লোক খুন হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই দেশের শত্রু, প্রত্যেকেই ব্লাক মার্কেটিয়ার। লক্ষ লক্ষ গরীব লোককে বঞ্চিত করে' লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছে ওরা...আমার মনে হয়েছে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে বাঙালী একদিন ইংরেজের সঙ্গে লড়েছিল এইবার তার দুর্নীতির সঙ্গে লড়া উচিত। যদি দরকার হয় তার জন্য প্রাণ দিক—আমি আমার শেষ জীবনে দেশকে শত্রুমুক্ত করবার এই উপায় অবলম্বন করেছি...'

শেষের ক'পৃষ্ঠা ছাড়া অন্যত্র অগ্নীশ্বরকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করা হয়নি।

অগ্নিশ্বরের কাহিনী পাই তাঁর এক ভক্তের জবানিতে। এই ভক্তও তাঁর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে কমই এসেছে। অপরের মুখে শোনা ঘটনা এবং অপরের নিকট লেখা চিঠির উপর নির্ভর করে ভক্ত অগ্নীশ্বরকে পাঠকের নিকট উপস্থিত করেছে। তাই পাঠক কখনো নায়কের মুখোমুখি হবার সুযোগ পান না। ঘটনার আবর্তে পড়ে অগ্নীশ্বরের জীবনের ধারা কি-ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে তা লক্ষ্য করবার সুযোগ নেই পাঠকের। অ-প্রত্যক্ষদর্শীর রিপোর্টের উপর নির্ভর করে অগ্নীশ্বরকে জানতে হবে। নায়কের চরিত্রই যেখানে উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ সেখানে নায়ককে পাঠকের নিকটতম সান্নিধ্যে আনা প্রয়োজন। আনন্দ-বেদনায় নায়কের মুখের ও মনের রঙ্ কেমন পরিবর্তিত হয় তার সরাসরি ছবি পাঠক উপন্যাসে পেতে চায়।

অবশ্য অগ্নীশ্বর স্থির-চরিত্র, এ-চরিত্রের বিবর্তন নেই। কাহিনীর বক্তা প্রথমেই বলছে : 'আমার এই সদাপরিবর্তনশীল জীবনে একটিমাত্র ছবির কেবল পরিবর্তন দেখি নাই, সে ছবি অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের। আমার জীবনে কয়েকবারই তিনি অপ্রত্যাশিত-রূপে আসিয়াছেন ও চলিয়া গিয়াছেন, প্রতিবারই তাঁহাকে একরকম দেখিয়াছি।' (পৃঃ ২৭) উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাগুলি নায়কের চরিত্রের নতুন পরিচিতি উন্মোচনের জন্য ব্যবহার করা হয়নি। অগ্নীশ্বরের চরিত্র সম্বন্ধে লেখকের প্রেমিস্‌কে প্রমাণ করবার জন্যই ঘটনাগুলি পর পর আনা হয়েছে। মনোবিশ্লেষণের যুগে এরূপ স্থির-চরিত্র পাঠকদের আগ্রহান্বিত করতে পারবে না বলেই মনে হয়।

বক্তা নিজের জীবনের কাহিনীও বলেছে। তার জীবন স্থির নয়, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চলেছে সে। নিজেই তার কাহিনী বলছে বলে বক্তাকে আমরা অগ্নীশ্বর অপেক্ষা নিকটে পাই। সুতরাং 'নভেল অব ক্যারেক্টারের' প্রধান বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। নায়ক অপেক্ষা তাঁর ভক্ত আমাদের বেশী আকৃষ্ট করে। বক্তা বি-এস্‌-সি পাশ করে বিপ্লবী দলে নাম লিখিয়েছে। ডাকাতি ও হত্যার অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। চোরাই পথে এল রিভলভার। রক্ষীদের গুলি করে পালাতে গিয়ে আহত হল। ইংরেজ অফিসার তাকে বন্দী করে যে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে এল সেখানকার ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়। স্কুলে যখন পড়ত তখন একবার তার এ'র সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল এক আত্মীয়ের চিকিৎসা উপলক্ষ্যে। অগ্নীশ্বর দেখেই চিনতে পারলেন, বুঝলেন কী হয়েছে। সাহেবকে কৌশলে ভুলিয়ে প্রচার করলেন গুলি বার করতে গিয়ে বন্দীর মৃত্যু হয়েছে। মর্গ থেকে মৃতদেহ এনে টেবিলে রাখা হল, আর এদিকে বক্তা পালিয়ে গেল। সে মুসলমানের ছদ্মবেশে ঘুরতে ঘুরতে চট্টগ্রামে উপস্থিত হল। সেখানে এক সারেং-এর ছেলেকে নদী থেকে উদ্ধার করে বাঁচাবার জন্য লুকিয়ে জাহাজে উঠে লণ্ডন এসে পৌঁছল। জাহাজে আলাপ হল অগ্নীশ্বরের এক ছাত্রের সঙ্গে। তার সহায়তায় লণ্ডনে সে গোয়েন্দাগিরি শিখে গেল আমেরিকা। তার কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে আমেরিকান গভর্নমেণ্ট সুপারিশ করল, একে ভারতে বিপ্লব-আন্দোলন দমন করবার জন্য পাঠানো হোক। ব্রিটিশ সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করল। বক্তা স্বদেশে ফিরে গোপনে বিপ্লবীদের সহায়তা করেছে। সভাযচন্দ্রকে পালাবার সুযোগ সে-ই করে দিয়েছে।

বক্তার জীবনী ঊনবিংশ শতাব্দী সুলভ একটি ঘটনাবহুল রোমাঞ্চকর কাহিনী। বক্তাকে জীবনে বিজয়ী করবার জন্য লেখক কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতিকেই অসম্ভব মনে করেননি। প্রকৃতপক্ষে এই বইয়ের মধ্যে দুটি অসম্পূর্ণ কাহিনীকে জোর করে পাশাপাশি

আনা হয়েছে,—একটি অগ্নীশ্বরের, অপরটি বক্তার। দুটি কাহিনীর মধ্যে যোগসূত্র খুবই ক্ষীণ। সুতরাং উপন্যাসের উপযোগী কাহিনী বিন্যাসের দৃঢ়সংবদ্ধতার অভাব পাঠককে পীড়িত করে। বিন্যাস প্রায় সর্বত্রই বক্তৃতাধর্মী। কথা দিয়ে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে; ঘটনা ও কাজের সাহায্যে কাহিনী এগিয়ে নেবার চেষ্টা করা হয়নি। পঞ্চকন্যা সম্বন্ধে অগ্নীশ্বরের ব্যাখ্যা গল্পের দিক থেকে অপ্রয়োজনীয়; বক্তৃতার মোহ এই সুদীর্ঘ ব্যাখ্যাটি সন্নিবেশের জন্য দায়ী। শুধু কথার দিকে ঝোঁক বলে পরিবেশ সৃষ্টির সাধারণ চেষ্টাও করা হয়নি। চাটগাঁ, বিহার, লণ্ডন, আমেরিকা প্রভৃতি জায়গার শুধু নাম শোনা যায়, ছবি পাই না। তেমনি, ঐতিহাসিক পটভূমিকাও অস্পষ্ট। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাকি 'সুভাষবাবুর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ঝগড়া চলিতেছে।' যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ১৯৩৩ সালে পরলোক গমন করেছেন। সুতরাং তাঁর সঙ্গে ঝগড়ার প্রশ্নই ওঠে না।

একটি ঘটনা অগ্নীশ্বরের চরিত্রের পরিপন্থী। এক সাহেব লাথি মেরে একটি ভারতীয় বালকের মাথা চূর্ণ করে দিল; অথচ অগ্নীশ্বরের রিপোর্টের ফলে তার সাজা হল না। অগ্নীশ্বরের এরূপ ব্যবহারের সমর্থনে উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

"উদয় অস্তের" নায়ক ডাক্তার সূর্যসুন্দর অকস্মাৎ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর পরিণত বয়স। পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে জরুরী খবর পাঠানো হয়েছে। সূর্য-সুন্দর অগ্নীশ্বরের মতো আদর্শ চরিত্রের ব্যক্তি। তাই তাঁর অসুখের সংবাদ পেয়ে ও অঞ্চলের সকল শ্রেণীর লোক ক্রমাগত সংবাদ নিতে আসছে। সূর্যসুন্দরের এক ছেলে কুমার ও তার স্ত্রী ঊর্মিলা সেবা করছে। কুমার দাদা এবং অন্যান্য পরিজনদের বাবার অসুখের সংবাদ জানিয়েছে; যে কোনো মুহূর্তে তাঁরা এসে পড়তে পারেন।

রোগীর কাছে বসে রাত জাগতে হবে। একটি ভালো বইয়ের সন্ধানে কুমার বাবার আলমারি খুললে। সেখানে আবিষ্কার করল সূর্যসুন্দরের আত্মচরিতের খাতা। এতদিন এর অস্তিত্বের কথা কুমারের জানা ছিল না। সে সাগ্রহে বাবার আত্মজীবনী পড়তে আরম্ভ করল। পাঠককে একবার সূর্যসুন্দরের অতীত জীবনে যেতে হয়, আবার ফিরে আসতে হয় বর্তমান পরিবেশে। সূর্যসুন্দরের বড় ছেলে 'কিউল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে' গাড়ির জন্য সপরিবারে অপেক্ষা করছে। পাঠককে সেখানেও নিয়ে যাওয়া হয়। সূর্যসুন্দরের পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনীর দল যখন একে একে এসে পৌঁছল তখন বাড়িতে যেন উৎসব শুরু হল। গান-বাজনা, শিকার, বেড়ানো, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদিতে মত্ত হয়ে উঠল সবাই। পাইকায় ছাপা প্রায় সওয়া তিন শ' পৃষ্ঠার বইয়ে প্রায় দু'শ পাত্র-পাত্রীর ভিড়। ক্রমাগত নতুন নতুন চরিত্রের আবির্ভাবে পাঠক হাঁফিয়ে ওঠে। পাত্র-পাত্রীদের ভুঁড়ে গল্প হারিয়ে যায়। যে-সব নর-নারীকে পাঠকের নিকট উপস্থিত করা হয়েছে তারা ছাপ রেখে যেতে পারে না। তারা যেন মিছিলের মুখ; একবার দেখা দিয়েই হারিয়ে যায়। মিছিলের গতি থাকে; গতির মধ্যেই তার সার্থকতা। এখানে গতির একমুখীনতা নেই। হঠাৎ বর্তমান থেকে অতীতে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় লেখক নিয়ে যান বলে গতিবোধ বারবার ব্যাহত হয়। সূর্যসুন্দরের পাঠশালায় ছাত্রজীবন শুরু হবার পর কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত পাঠককে আকৃষ্ট করে রাখবার মতো কোনো উপাদান পাওয়া যায়নি। আঙ্গিক ও বিন্যাসের দুটি আলোচ্য দুটি উপন্যাসেরই প্রধান দুর্বলতা।

বনফুল ছোট গল্পের লেখক হিসাবে সমাদর লাভ করেছেন। তাঁর প্রতিভা প্রধানতঃ ছোট গল্পেরই উপযোগী। ছোট গল্পের স্বল্প-পরিসরে স্থির-চরিত্র এবং একটি আইডিয়াকে

শিল্পরূপ দেওয়া সম্ভব। উপন্যাসে চরিত্র ও ঘটনার বিবর্তন অত্যাবশ্যক। কাহিনীর নিজস্ব আকর্ষণও একটি প্রধান গুণ।

বাংলা উপন্যাসের জগত থেকে যে-ভাষা অনেকদিন আগেই স্বাভাবিক নিয়মে বিদায় নিয়েছে, বনফুল এখনো সেই ভাষা কেন আঁকড়ে আছেন তা বোঝা যায় না। উপন্যাস-পাঠকের পক্ষে এই অনভ্যস্ত ভাষা অনায়াস-পাঠের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্নীশ্বর—শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। ডি, এম, লাইব্রেরী, কলিকাতা-৬। মূল্য ৪·৫০ ন. প.
উদয় অস্ত—বনফুল। ডি, এম, লাইব্রেরী, কলিকাতা-৬। মূল্য ৬·০০।

সমালোচনা

A Passage to England. *By* Nirad C. Chaudhuri. Macmillan & Co. Ltd. London. Rs. 10·00.

বাঙালী পাঠকের কাছে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর নাম আজ প্রায় অজানা, কিন্তু প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে বাঙালী পাঠককে তিনি চমক লাগিয়েছিলেন। "শনিবারের চিঠি" তখন তরুণ পত্রিকা, নীরদবাবু তার উৎসাহী সম্পাদক। এরই মঞ্চ আশ্রয় করে তিনি অকস্মাৎ শরসন্ধান করলেন বীরবল অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরীর উদ্দেশ্যে। লক্ষ্যভেদ হোক বা না হোক, বোঝা গেল তীরন্দাজিতে নীরদবাবুর বেশ একটু হাত আছে।

আজকের নীরদবাবু হয়তো বলবেন তিনি ঐরকম ছেলেমানুষিতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন নিছক সঙ্গদোষে। ছেলেমানুষি বলছি এই কারণে যে নীরদবাবুর ঐ আলেখ্যে তাঁর মূল্যবোধকে অনেক পরিমাণে আচ্ছন্ন করেছিল তাঁর রচনানৈপুণ্য। আর এ কথা তো আমরা জানি যে "শনিবারের চিঠি"র সঙ্গ তিনি বেশিদিন সহ্য করতে পারেননি যদিও সজনী-কান্ত দাশের সহযোগিতায় তিনি কিছুদিন 'নতুন পত্রিকা' বলে একটি সাপ্তাহিকেরও সম্পাদনা করেন।

এই ঘটনার প্রায় বছর দশেক পরে নীরদবাবু ও তাঁর সুযোগ্য সহযোগী অধ্যাপক দিলীপকুমার সান্যালের স্বৈত সম্পাদনায় ত্রৈমাসিক "সমসাময়িক" পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। নীরদবাবুর কলম ততদিনে আরো পাকা হয়েছে। কিন্তু বাংলা গদ্যের ভাগ্যে ছিল না "সমসাময়িক" পত্রিকার দীর্ঘ আয়ু। কেননা একথা নিশ্চিত যে নীরদবাবুর বাংলা গদ্য রচনার যে দু-চারটি নমুনা আমরা দেখেছি তা বিচিত্র ও বিস্ময়কর।

এই হ'ল সংক্ষেপে বাংলা গদ্যের লেখক নীরদচন্দ্র চৌধুরীর পরিচয়।

নীরদবাবুর আরো একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। কলেজ থেকে বেরিয়ে তিনি যোগ দেন 'মিলিটারি একাউনট্‌স্' বিভাগের চাকরিতে। এই সময়ে কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি অবসরবিনোদন করতেন ব্রিটিশ-ভারতীয় সামরিক নীতির ইতিহাস চর্চা ক'রে। ক্রমে অবসরবিনোদন পরিণত হয় রীতিমত গবেষণায়। যতদূর মনে পড়ে এই বিষয়ে নীরদবাবুর লেখা একটি ইংরেজি পুস্তিকা কংগ্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া তখন ডক্টর মুঞ্জে প্রভৃতি যে দুই একজন ভারতীয় নেতা সামরিক নীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন, নীরদবাবু খোরাক জোগাতেন তাঁদের বিতর্ক ও বক্তৃতার। উত্তর-জীবনে ইংরেজি লেখায় নীরদবাবু যে খ্যাতি অর্জন করেন তাঁর সামরিকনীতি সংক্রান্ত রচনায় তার যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি ছিল। ঐতিহাসিক গবেষণা হিসেবেও এই রচনাগুলি বিশেষ মূল্যবান।

"শনিবারের চিঠি", "নতুন পত্রিকা" ও "সমসাময়িক"-এর এককালীন উৎসাহী সম্পাদক যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে দিল্লিতে গিয়ে স্থায়ী আস্তানা গাড়লেন অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর চাকরির সূত্রে, ততদিনে শুধু বাংলা সাহিত্যের নয় বাঙালী জাতির সঙ্গেও

তাঁর সম্পর্ক প্রায় ঘুচে গেছে। এর পর নীরদবাবুর দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হ'ল। ধ্যান-দৃষ্টিতে তিনি দেখলেন বাংলা ভাষার কোনো ভবিষ্যৎ নাই অতএব তাঁর রচনার বাহন হবার তা অযোগ্য। এই মত তিনি প্রচার করলেন দস্তুরমত ইস্তাহার জারি করে অর্থাৎ বহু-প্রচলিত একটি ইংরেজ-পরিচালিত ইংরেজি দৈনিকের স্তম্ভে প্রবন্ধ লিখে। স্বধর্মে অর্থাৎ মাতৃভাষায় নিশ্চিত নিধনকে তিনি শ্রেয় বলে মেনে নিতে পারেননি। আমরা বুঝলাম যে নীরদবাবুকে আমরা হারালাম কিন্তু একথা কি তিনি বুঝেছিলেন যে পরধর্ম আশ্রয় করে নিজেকেও নিজে তিনি হারালেন?

হয়তো নীরদবাবু যে-গণিতে বিশ্বাস করেন তা ঠিক গীতার গণিত নয়। নিজেকে বারবার হিন্দু বলে ঘোষণা করলেও নীরদবাবু সম্পূর্ণ স্ব-তন্ত্র। কতটা স্ব-তন্ত্র কয়েক বছর আগে তা বেশ তীব্রভাবেই প্রকাশ পেল তাঁর ইংরেজিতে লেখা আত্মজীবনীতে। নীরদবাবু এই বই লিখে ইংরেজ মহলে যে প্রতিপত্তি লাভ করেন তাতে তাঁর স্বদেশবাসীর হয়তো শ্লাঘা বোধ করা উচিত কিন্তু এই বইয়ের অনেক কথাই তাদের কানে একটু বেসুরো লেগেছিল, মনে হয়েছিল এ বই যার লেখা ভারতের মাটিতে সে লালিত হলেও এই মাটি থেকে সে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

কিন্তু যে-বিদেশের মাটি চিরকালই তাঁকে ডাক দিয়েছে, আত্মজীবনীলব্ধ পসারের ফলে সেই ডাক অত্যন্ত স্থূল আকারে তাঁর কাছে পৌঁছল ব্রিটিশ বেতার প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বি. বি. সি.র নিমন্ত্রণ বহন করে। এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে নীরদবাবু পাঁচ সপ্তাহ ইংল্যান্ড ভ্রমণ করে বি. বি. সি.র মারফত যে সব বেতার বক্তৃতা দেন বি. বি. সি. তার নামকরণ করেন "এ প্যাসেজ টু ইংল্যান্ড।" এর বাংলা অনুবাদ করা খুব সহজ নয়। 'ইংল্যান্ড যাত্রা' বা 'ইংল্যান্ড পরিক্রমা' বললে ইংরেজির অভিধা ঠিক ফোটে না। যাই হোক, নীরদবাবু আলোচ্য বইয়ের জন্যে এই নামকরণই বাহাল রাখেন, কেননা ঐ বক্তৃতাগুলি অবলম্বন করেই এই বই লেখা, যদিও এতে অতিরিক্ত উপকরণ কিছু আছে—ইংল্যান্ডে পাঁচ সপ্তাহ ছাড়া প্যারিসে দু'সপ্তাহের ও রোমে এক সপ্তাহের অভিজ্ঞতা।

দেশে ফিরে নীরদবাবু দু'একটি প্রবন্ধে (অবশ্য ইংরেজিতে লেখা) তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লেখেন। এই প্রসঙ্গে ইওরোপের সঙ্গে স্বদেশের তুলনা করে তিনি তাঁর অভ্যস্ত ভঙ্গীতে যে-সব টীকা-টিপ্পনি করেন ভারতীয় পাঠকেরা অনেকেই তা বরদাস্ত করেননি। হয়তো এর জন্য ভারতীয় পাঠকদের স্পর্শকাতরতা অনেকটা দায়ী। নীরদবাবু অবশ্য এর ফলে একটুও দমেননি। বইটির মুখবন্ধে তিনি উল্লসিত হয়ে লিখেছেন যে তথ্যে ও উপদেশে ঠাসা রীতিমত গম্ভীর এক বই লেখার যে-টুকু দায়িত্ব তাঁর ছিল সমালোচকেরা তাঁকে সেই দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ রেহাই দিয়েছেন, অতএব তিনি শুধু লিখেছেন তাঁর অভিজ্ঞতার যা নিতান্ত ওপর-ওপর উপলব্ধি তারই কথা —The sensations (to be carefully distinguished from emotions) of what I experienced.

মুখবন্ধের এই উল্লাস ব্যাপ্ত হয়েছে বইটির পাতার পর পাতা জুড়ে। উল্লাস, উচ্ছ্বাস নয়। নীরদবাবু সতর্ক, সচেতন, মননশীল। সাধারণ মানুষের মতন উচ্ছ্বাস তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার সারনির্যাস তিনি গ্রহণ করেছেন তাঁর মননশীল মনের যাঁতাকলে পিষে। এই প্রক্রিয়া সাধারণ পাঠকের পক্ষে বোধহয় খুব উপাদেয় নয়। মামুলি ভ্রমণ কাহিনীতে অভ্যস্ত পাঠকের জন্যে এ বই রচিত হয়নি।

কিন্তু বিদেশী পত্রিকার বিজ্ঞ সমালোচকদের যদি অসাধারণ পাঠক বলে ধরা যায়,

তাঁরাও তো বইটিকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি। নীরদবাবুর রচনাভঙ্গীর ভূয়সী প্রশংসা করলেও এ কথা অনেকেই বলেছেন যে তিনি নিজেকে জাহির করেছেন একটু বেশি। হয়তো সত্যি তাই, কিন্তু তাতে আপত্তি কেন? নীরদবাবু আজীবন সাধনা করেছেন ইউরোপীয় সাহিত্যশিল্পের; ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তাঁর নখদর্পণে; এই সংস্কৃতির রসে তাঁর মন সম্পূর্ণ জারিত। এই মন নিয়ে তিনি মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেছেন ইউরোপের নদী, বন, চাষের খেত, চিত্রশালা, পুঁথিশালা, বসতবাড়ি, রাজারাজড়ার প্রাসাদ, বড় বড় গীর্জা, আর শুনেছেন প্রাণ ভরে ইউরোপীয় সংগীত। ইউরোপীয়, বিশেষ করে ইংরেজি, কাব্যের প্রতিধ্বনিতে তাঁর বর্ণনা রমণীয় হয়েছে পাতার পর পাতায়, হয়তো অনেক জায়গায় পাঠকদের অগোচরে। শুধু বর্ণসমৃদ্ধ বর্ণনায় নয়, প্রখর মন্তব্যেও তাঁর রচনা পাঠককে চমকের পর চমক লাগায়। কিন্তু ইউরোপের পলিটিক্স ও অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে তিনি উদাসীন, কেননা তাঁর মতে এ-সব ব্যাপার ঘটে এমন এক জগতে যা নাকি নিছক চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করা যায় না। অর্থাৎ নীরদবাবুর অসামান্য চেতনা।

এই প্রসঙ্গে নীরদবাবুকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়। কিপলিং সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন যে সাত বছর ভারতবর্ষে বাস করে তিনি দীপ্তিমান হয়েছিলেন, সতেরো বছর বাস করলে তিনি পুড়ে ছাই হয়ে যেতেন। নীরদবাবু আট সপ্তাহের বদলে যদি আট বৎসর ইওরোপে কাটাতেন, তাহলেও কী সমসাময়িক ইওরোপের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনধারা তাঁর চেতনাকে স্পর্শ করত না, তিনি তন্ময় হয়ে ডুবে থাকতেন ইওরোপীয় আর্টের প্রস্তুতাত্ত্বিক জগতে? হয়তো নীরদবাবুর পক্ষে তা সম্ভব, কেননা ইউরোপীয় সংস্কৃতির যাদুতে তিনি যতই আচ্ছন্ন হোন, ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনাকে তিনিই যতই উপহাস করুন, সম্ভবত তিনি এই অধ্যাত্মসাধনারই আত্মবিস্মৃত সাধক। অতএব ভারতীয় যোগীরা যেমন অন্ধকার গুহায় বা মাটির নিচে সমাধিস্থ হয়ে থাকতে পারেন সুদীর্ঘ কাল, নীরদবাবুও সেই রকম মানুষের মধ্যে বাস করেও অনির্দিষ্ট সময় কাটাতে পারেন শিল্পসংস্কৃতির প্রস্তরলোকে—অবশ্য যদি বি. বি. সি. বা ব্রিটিশ কাউন্সিল তাঁর আহার-বিহারের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করে।

আট সপ্তাহের পর যখন তিনি স্বদেশের পথে ফিরছেন, সঙ্গী এক ইংরেজ তাঁর স্ফূর্তি দেখে অবাক না হয়ে পারেন নি। নীরদবাবু তাকে জানালেন, ইংল্যান্ডের ও ফ্রান্সের খরচে তিনি দিব্যি এক ছুটি কাটিয়ে দেশে ফিরছেন তাই তাঁর স্ফূর্তি। এর পর বইটি শেষ করেছেন তিনি এই কথা বলে যে তাঁর আনন্দের উৎস যে আরো অনেক গভীর তা লুকিয়ে লাভ কি?

রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায় আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, "হায়, এ কী সমাপন!" জীবনব্যাপী সাহিত্য, শিল্প ও ইতিহাস সাধনার এই কি পরিণতি? দুটি বিভিন্ন সংস্কৃতির ও সভ্যতার দুই শতাব্দীব্যাপী আদানপ্রদানের এই কি চরম সার্থকতা যে শিক্ষিত ও মননশীল বাঙালী মনে করবে যে সে পরমার্থ লাভ করেছে ইউরোপের প্রস্তরলোকে আট সপ্তাহ বিচরণ করে? যদি তাই হত তাহলে এই দুই শতাব্দীর ইতিহাস পরিণত হত উপহাসে। তা যে হয়নি তার কারণ নীরদচন্দ্র চৌধুরী অনন্য আর তাঁর সমাধি এই অনন্যতায়।

হিরণকুমার সান্যাল

প্রেমের গল্প—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। মূল্য চার টাকা।
প্রেমের গল্প—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। মূল্য চার টাকা।

জেম্‌স্‌ ক্ল্যারেন্স ম্যাংগান নামে এক কবির কয়েক লাইন কবিতা দিয়েই কথা শুরু করা যেতে পারে। ১৮০৩ থেকে ১৮৪৯ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বেশি কথার দরকার নেই; শুধু 'প্রেম' সম্বন্ধে তাঁর ধারণার কথাটাই বিবেচ্য। তিনি যা লিখেছিলেন, সে-উক্তির বঙ্গানুবাদে এই দাঁড়ায়—

হৃদয়ে হৃদয়ে আকুতি এবং অধরে অধরে কামনা-সুখ
যায় চলে যায় উচ্ছল দিন খুশিতে—
নাচ, ভোজ, গান, বাঁশার আলাপ,
সব শেষ হলে থাকে কী বিষাদ,
কী যে রিক্ততা, সর্বনাশ,
কী যে লুণ্ঠন, উৎপাটন!

প্রেম যে দুঃখস্বীকৃতি, সে-কথা আমাদের বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যেও বার বার বলা হয়েছে। তবে বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রধানতঃ রাধা-কৃষ্ণের কথা, তাতে অলৌকিক মানস বৃন্দাবনের অনুভূতি প্রারম্ভের মতন স্বীকৃত। প্রেমের গল্প বা প্রেমের কবিতা কিন্তু লৌকিক অভিজ্ঞতার স্তর থেকেই পাঠককে অলৌকিক বা লোকোত্তর স্তরে পৌঁছে দেয়। কবিতায় এই যাত্রাপথ অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব, সংহত, নিবিড়; গল্পের আধার স্বভাবতঃ আরো বিস্তৃত, আরো উপাদান-অভিপ্রায়ী। তাই প্রেমের গল্প অন্যান্য গল্পশ্রেণীর মতোই ব্যাখ্যা, বিবরণ, বিশ্লেষণ অবলম্বন করে চরিতার্থতায় গিয়ে পৌঁছোয়। সে কথা অস্বীকার করবার নয়। তবে প্রেমের গল্প যে অনুভূতিপ্রধান রচনা, তাতেও সন্দেহ নেই। এই সহজ কথাটি আদিতেই মেনে নেওয়া দরকার, কারণ এ-কথা মেনে নিতে নারাজ হলে পরের কথাগুলি বলবার জোর পাওয়া যাবে না।

প্রতাপ বা উচ্চাশার গল্প, দুর্ভিক্ষ বা মহামারীর গল্প,—কৃপণ, সাধু, চোর বা পণ্ডিতের গল্প—ইত্যাদি নানাবিধ গল্প-সংকলনের সম্ভাবনা মনে আসতে পারে। সে-সব ক্ষেত্রে কোথাও চরিত্র ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা, কোথাও সংলাপের কৌশল, কোথাও বা আখ্যান-বস্তুর প্রাধান্য উপভোগ করতে বাধা নেই। পরিশেষে সব ক্ষেত্রেই অবশ্য, অভিপ্রেত লক্ষটি প্রধান হয়ে ওঠা উচিত। প্রেমের গল্পও হয়তো এ সাধারণ আইনের ব্যতিক্রম নয়। তবু এ-কথা না মেনে গত্যন্তর নেই যে, প্রেম এক রকম অনুভূতি এবং প্রেমের গল্পের প্রধান লক্ষ্য সেই বিশেষ অনুভূতিকেই ফুটিয়ে তোলা; তাতে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কায়দা, কসরত, সংবাদ বা সমালোচনা নিতান্ত গৌণ ব্যাপার। প্রমথ চৌধুরীর "চার-ইয়ারী কথা"-কে এই কারণেই যথার্থ প্রেমের গল্প বলতে কুণ্ঠা হতে পারে। "চার-ইয়ারী কথা"-র প্রথম কাহিনী 'সেনের কথা' এমন এক অট্টহাস্যের মধ্যে শেষ হয়েছে, যাকে স্বয়ং লেখক বলেছেন 'মর্মভেদী!' প্রেম যে মর্মভেদী, সে-কথা ওপরের কয়েক ছত্র কবিতার মধ্যেও বলা হয়েছে। কিন্তু প্রেমের অভিজ্ঞতায় মর্মভেদী হাসির চেয়ে মর্মভেদী কান্নার দিকটাই বেশি স্বীকার্য। এ মতের প্রতিবাদে 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি' বা এই ধরনের অন্য কোনো কাব্যোদ্দীপনার উল্লেখ অবান্তর নয়; কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে-ভাবেই হোক, প্রেম যে এক রকম আবেশ, তাতে সন্দেহ নেই। সমস্ত ঝড়, বিপর্যয়, আঘাত, অন্ধকার পার হয়ে নর-নারীর প্রেম যে সহজ

উপলব্ধিকে সম্ভব করে তোলে, সে তো গভীর শান্তিরই স্বীকৃতি,—পরম অস্তিরই নামান্তর! 'প্রেম' আর 'পরম' বোধ হয় সেই কারণেই খুব কাছাকাছি শব্দের মতন শোনায়।

পরম-কে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষণে চিহ্নিত করা ঠিক নয়। 'উদ্যত যতো শাখার শিখরে রডোডেনড্রনগুচ্ছ',—এও পরমের অনুভূতি,—আবার 'কালা তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি'—এতেও পরমেরই প্রতীক্ষা! বাঙালী মনে রাধা-কৃষ্ণ কথার সুদূরকালার্জিত যে সংস্কার নিহিত আছে, তার ফলে শেষের উক্তিটি আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত প্রত্যক্ষ, সন্নিহিত বা অধিগম্য বলে মনে হয়। তারাশঙ্কর সে ঐতিহ্যসূত্রটি ধরে রেখে গল্প বলেন,—অচিন্ত্য-কুমার কিন্তু শব্দ, তথ্য, কায়দা, কৌশলের ওপর বেশি নির্ভরশীল। প্রেম ইন্দ্রিয়-বাসনা উজিয়ে এগিয়ে যায়,—এগিয়ে গিয়ে শুদ্ধ হয়। তারাশঙ্করের 'রসকলি'-তে সেই সত্যই ফুটে উঠেছে,—অচিন্ত্যকুমারের 'মগের মুলুক' লেখাটিতেও সেই একই আবেদন অনুভব করা যায়। কিন্তু এই দু'খানি 'প্রেমের গল্প'-সংগ্রহের মধ্যে যথাক্রমে তারাশঙ্করের মোট বারোটি গল্পে এবং অচিন্ত্যকুমারের মোট চোদ্দটিতে প্রধান যে প্রভেদ অনুভব করা যায়, সে হোলো আবেশের সঙ্গে অন্যমনস্কতার পার্থক্য! দু'জনেই নিপুণ, প্রবীণ শিল্পী। উভয়েই প্রেমের বিচিত্র গতি লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু তারাশঙ্করের মনস্তা বেশি, অন্য পক্ষে অচিন্ত্যকুমার আয়োজনে দক্ষ, উপকরণ-সংগ্রহে উৎসাহী। তারাশঙ্করের 'বেদেনী', 'নারী ও নাগিনী', 'রাঙাদিদি', 'তমসা' ইত্যাদি লেখাগুলিতে মেলা, বাজীকর, সাপ, পটুয়া, রাধা-কৃষ্ণ ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ আছে। অচিন্ত্যকুমারের 'ধরা বিয়ে', 'যশোমতী', 'সরবানু ও রোস্তম', 'জমি' প্রভৃতি লেখাতেও হাঁড়িকুঁড়ির ব্যবসা, চাষী-জমিদার সম্পর্ক, মামলা-মোকদ্দমা-সালিশী প্রভৃতি বিভিন্ন গল্পসংস্কারের সমাবেশ বিদ্যমান। কিন্তু বিষয়বস্তুর এই আপাত-সাদৃশ্য সত্ত্বেও দু'জনের প্রবণতা দু'রকম। নতুন নতুন শব্দ ব্যবহারের দিকে অচিন্ত্যকুমারের ঝোঁক কে না জানেন? 'ধরা বিয়ে'-র বিবাহার্থী ভক্তদাস পাল জাতিতে কুমোর। তার পারিবারিক বৃত্তির পরিচয় দিতে গিয়ে শব্দে ও তথ্যে বিশেষ উৎসাহী গল্পকারের কলমে ভিড় করে এসেছে কুম্ভকার-বৃত্তির নানা কথা—'আল-ওয়ালা মেশেল,...চাক-নলি,...ছানা-মাটির মুঠোম-হাত গাছ বসিয়ে থাবড়ে থাবড়ে সমান করা,...আনিকানি সমান করবার জন্যে বাঁশের ফাঁপের উঁচো,... সুঁচলো চিমড়ি' ইত্যাদি! গল্প রচনার বিশেষত্বই এই যে, এ-রকম আনুষঙ্গিক তথ্য গল্পের মধ্যে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। কিন্তু কতোটা সহজে আসে আর কতোটাই বা টেনে আনা হয়ে থাকে, সে-বিচারের নিরিখ কার হাতে? মূল, বাঞ্ছিত অনুভূতির অনুকূল যে-সব তথ্য, সেইগুলিই গ্রাহ্য এবং স্বীকার্য,—বাকি সব অবান্তর এবং অসংগত। সঞ্চারী বা আনুষঙ্গিকের ওপর নজর বেশি হয়ে গেলে প্রেমের গল্পে প্রেমের চেয়ে অন্য প্রসঙ্গই প্রধান হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে তাকেই বলা যায় অন্যমনস্কতা।

গল্পমাত্রেরই সফলতা যদিও আকস্মিক আঘাত বা বিস্ময় বা চমকের ওপর অনেকটা নির্ভর করে, তবু প্রেমের গল্পের অন্তর্নিহিত চমকের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। 'ধরা বিয়ে'-তে ভক্তদাস পাল দিব্যরাণীর পাণিপ্রার্থী। দিব্যরাণি নিজেই বার বার ভক্তদাসকে বিবাহে সম্মতি প্রত্যাহার করবার অনুরোধ জানিয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শুভ পরিণয় ঘটে গেল এবং তারপর ভক্তদাস আবিষ্কার করলো যে, বিয়েটা দিব্যরাণির স্বাধীনতা বড়োই ক্ষুণ্ণ করেছে! গল্পের শেষ কয়েক লাইনে এই আবিষ্কারটাই এ-গল্পের চমক-উৎপাদক হবার উদ্যোগী বলে মনে হয়। 'খিল' গল্পটিতে বিপত্নীক সুরজিতের কাছে ছাত্রাবস্থার বান্ধবী কুমারী অশোকা এসেছিল এক রাত্রির অতিথি হয়ে। কিন্তু সুরজিৎ যদিও পাঁচিশ বছর

বয়সে এক বে-সরকারী মেয়ে-হস্টেলে অশোকার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করতে অভ্যস্ত ছিল, তবু দেশ-কালের পরিবর্তনে তারও আগ্রহের পরিবর্তন ঘটে গেছে। অতএব সে-পরিবর্তন অনুভব করে অশোকাকে চুপি চুপি ফিরে যেতে হয়। এ কাহিনী মসৃণ এবং খুবই স্বাভাবিক। গল্পের শেষদিকে 'সমস্তটাই কি স্বপ্ন'—এই প্রশ্নচিহ্নিত উত্তর মধ্যে অভিপ্রেত চমক মোটেই সার্থক হয়নি। 'যশোমতী'তে শ্রীনিবাস ঘাসীর স্ত্রী যশোমতী চরিত্রটি চিত্তাকর্ষক, কিন্তু দুর্গাচরণের সঙ্গে তার অনুরাগের সম্পর্ক যতো না ফুটেছে, তার চেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়েছে যশোমতীর আত্মানুরাগ এবং সমাজের বিরুদ্ধে তার অভিযোগের সারবত্তা। প্রেম যে দুঃখস্বীকৃতি, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রেম যে প্রগাঢ় মগ্নতাও, এই সব গল্পে সে-সত্যের সহজ রূপায়ণ বিরল। চমকের দিকে বেশি মনোযোগ অথবা আনুষঙ্গিক তথ্য বর্ণনার দিকে বেশি আগ্রহ—প্রেমের গল্পের সার্থকতার পথে এ দুটি ঝোঁকই সমান বাধা। অচিন্ত্যকুমারের 'মগের মুলুক' সেই বাধা কাটিয়ে প্রত্যাশিত রোম্যান্টিক আবহে প্রতিষ্ঠিত সার্থক প্রেমের গল্প হয়ে উঠেছে।

শরীর এবং মন দুটি দিকেই প্রেমের দৃষ্টি সমান সজাগ। প্রেম বিমুখতা নয়, উন্মুখতা। প্রেম তর্কমনস্কতা নয়,—বিশ্বাস, সমর্পণ, উৎসাহ, প্রসন্নতা,—একানুভূতির কামনা কিংবা ঐকান্তিক ঐক্যবোধ। তারাশঙ্করের 'বেদেনী' গল্পের শম্ভু-রাধিকা-কিন্তো ত্রিভুজের মধ্যে বিশ্বাস বা সমর্পণ বা ঐক্যবোধের তেমন কোনো গভীরতার অবকাশ নেই বটে, কিন্তু তা না থাকলেও তাতে আর এক রকম বিশ্বাসও আছে, সমর্পণও আছে। 'রসকলি'-তে পুলিন-মঞ্জরীও সেই আদর্শের উদাহরণ। 'নারী ও নাগিনী'তে সাপুড়ে খোঁড়া শেখ এবং তার স্ত্রী জোবেদা, এই দুটি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে বিবি নামে এক নাগিনী দেখা দিয়েছে। প্রেমের অধিকারবোধ সম্বন্ধে একটি প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য দিয়ে গল্পটি শেষ করা হয়েছে। জোবেদার মৃত্যু হয় বিবির দংশনে। খোঁড়া শেখ বিবিকে বধ করেনি শেষ পর্যন্ত। এই প্রিয় সাপিনীকে ছেড়ে দিয়ে সে বলেছিল, 'খুদে তোর দোষ কি, মেয়েজাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।' 'মানুষের মন', 'ঘাসের ফুল' ইত্যাদি অন্যান্য গল্পেও তর্ক, তথ্য অথবা আনুষঙ্গিক ব্যাপারের তুলনায় প্রেমানুভূতির রূপায়ণই প্রধান হয়ে উঠেছে।

শেষ কথা এবং এখানকার প্রাসঙ্গিক, আসল কথাটা এই যে, প্রেমের গল্পে ভাব, আবেশ, আকূতি অথবা মগ্নতাই অভিপ্রেত লক্ষ্য। তারাশঙ্করের 'তমসা' গল্পের পক্ষীও প্রেমিক, অচিন্ত্যকুমারের 'মগের মুলুক'-এর রূপা-পঙ্কমার মধ্যেও প্রেমেরই দিব্য দ্যুতি! বাংলা গল্প-ধারায় এ-সব গল্প ভোলবার নয়!

হরপ্রসাদ মিত্র

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত— সনজীদা খাতুন। নিতাইচন্দ্র দাস, ১৩এ, বিপিন পাল রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য পাঁচ টাকা।

বাংলাকাব্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। রবীন্দ্রসমসাময়িক কবিদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে লোকবল্লভ। আধুনিক বাংলা-

কবিতার প্রাথমিক লক্ষণগুলি—দৈবের স্থলে সর্বাতিশয়ী মানবধর্মের সংস্থাপন, মানবতার জয়ঘোষণা ও তার শত্রুর সঙ্গে প্রবল বিরোধিতা, হৃদয়ের দ্রুতির চেয়ে দীপ্তির প্রাধান্য, সমাজসচেতনতা, বাস্তবমুখিতা ইত্যাদি—তাঁর কাব্যেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের সর্বাত্মক প্রভাবের মধ্যে লালিত হয়েও তিনি বাংলাকাব্যে একটি নূতন স্বর ও সুর যোজনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং প্রধানত তাঁর কাব্যপথেই আধুনিক কবিতার আবির্ভাব ঘটেছিল। বিংশশতাব্দীর প্রথমলগ্নে রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম প্রতিভার খর-দীপ্তির মধ্যে তাঁর সমসাময়িক কবিবৃন্দের পক্ষে স্বকীয় জ্যোতিতে ভাস্বর হওয়া এক-রকম অসম্ভব হয়ে পড়েছিল বলা চলে। তাই তাঁরা রবীন্দ্রপ্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে তারই নিরুপদ্রব পক্ষছায়ায় স্বাতন্ত্র্যবর্জিত কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে কবিযশঃপ্রার্থী হয়েছিলেন। অবশ্য রবীন্দ্রকাব্যের যে আপাত সারল্য ও সহজতা তাঁদের স্বাভাবিক ভাবেই প্রলুব্ধ করেছিল তাকে কেউ কেউ নিষ্ঠার সঙ্গে কাজে লাগিয়ে নিজেদের কাব্যদেহলাবণ্য বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু কাব্যাত্মার যে প্রশান্তি, বিস্তার ও গভীরতা রবীন্দ্র-কাব্যের বিশেষ লক্ষণ তা অধিকাংশ স্থলেই তাঁদের নাগালের বাইরেই থেকে গিয়েছিল। তাঁরা রবীন্দ্ররোমান্টিসিজমের অতিরমনীয় মোহজালে পতঙ্গের মত ধরা দিয়েছিলেন। তাঁদের কাব্যে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবিহ্বলতা, অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তা, নৈতিক শুচিতা, পরিশুদ্ধ প্রেম, মহামানবতার বন্দনা প্রভৃতি নানাভাবে অনুকৃত হয়েছিল। রবীন্দ্রনন্দনারী এই কবিসমাজের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায় প্রভৃতি কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিলেও রবীন্দ্রপ্রভাবের বিরোধিতা করে তা থেকে মুক্ত হবার দুঃসাহস দেখাতে পারেন নি। রবীন্দ্রপ্রভাবিত হ'লেও সত্যেন্দ্র-নাথের ভিতরে প্রথম রবিরশ্মিজাল ছিন্ন করে স্বকীয় জ্যোতিতে দীপ্যমান হবার প্রয়াস অঙ্কুরিত হয় এবং তিনি লক্ষণীয় মাত্রায় রবিরসাবেশ কাটিয়ে উঠে যুগের চারণকবি হয়ে বাংলাকাব্যে একটি নূতন দিগন্তের উন্মোচন করেন। সেই কারণেই আধুনিক কাব্যের প্রতিভাবান নায়ক যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম ও পরবর্তী-কালে "কল্লোল"-কবিগোষ্ঠীর উপরেও তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয়। এদিক দিয়ে সত্যেন্দ্র-কাব্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য এবং তাঁর কাব্যের বিচারবিশ্লেষণ ছাড়া আধুনিক কাব্যের উৎসমুখ যে অনাবিষ্কৃতই থেকে যায় একথা আজ আর কোন কাব্যপাঠকের অজানা নয়। ইদানীং আধুনিক কাব্যের আলোচনা আরম্ভ হয়েছে এবং সেই সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মে সত্যেন্দ্রকাব্যের পঠনপাঠনে নূতন উদ্যম ও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যেই সত্যেন্দ্রকাব্য সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে সনজীদা খাতুনের "কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত" গ্রন্থটি নানা কারণে বিশেষভাবে উল্লেখনীয়।

সত্যেন্দ্রকাব্যের রসবিশ্লেষণে এ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে তাদের মোহিতলালের "আধুনিক বাংলাসাহিত্য" নামক গ্রন্থের অন্তর্গত 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' শীর্ষক প্রবন্ধটি অন্যতম এবং কোন কোন দিক দিয়ে বোধ হয় অদ্বিতীয়। সত্যেন্দ্রকাব্যের মূল্যায়নে অধিকাংশ লেখকই প্রধানত উক্ত প্রবন্ধটির উপর নির্ভর করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকাও এর বিশেষ ব্যতিক্রম নন। তবে সত্যেন্দ্রকাব্যের রসবিশ্লেষণের চেয়ে বিষয়ব্যাখ্যা ও ভাষা, ছন্দ প্রভৃতি প্রযুক্তির বিশদ বিশ্লেষণের দিকেই লেখিকার শক্তি মুখ্যত নিযুক্ত হয়েছে এবং তিনি যে এ বিষয়ে অনেক পরিমাণে সফলতা লাভ করেছেন এ কথা আনন্দের সঙ্গেই ঘোষণা করা যায়।

সম্প্রতি গবেষণাগ্রন্থ বলতে যে তথাজর্জরিত, অযথা বিপুলায়তন, পুনরুক্তিতে ভারাক্রান্ত ও পাণ্ডিত্যকণ্টকিত একজাতীয় রচনা বোঝায়, আলোচ্য গ্রন্থ তার ব্যতিক্রম। গ্রন্থটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে সত্যেন্দ্রনাথের চরিতপরিচয় ও সাহিত্যিক পরিবেশ আলোচনার মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সত্যেন্দ্রকাব্যের ভাবধারার বিশদ ব্যাখ্যার পর তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর রচনা-শিল্প সম্পর্কে লেখিকা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে পূর্ব ও উত্তর-সূরীদের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারবিশ্লেষণ ক'রে বাংলাসাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে লেখিকা সত্যেন্দ্রনাথের গদ্যরচনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন, কেননা তাঁর ভাষায় 'সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভায় কাব্যধর্ম ও গদ্যধর্ম এত মেশামেশি ক'রে ছিল যে তাঁর গদ্যরচনার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে কবি হিসেবে তাঁকে সম্পূর্ণ জানাও অসম্ভব।' (পৃঃ ২১১)। পরিশিষ্টে সত্যেন্দ্ররচনাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা ও অভিমতের তালিকাটিও মূল্যবান।

গ্রন্থপরিকল্পনার সুরূপতা স্বীকার ক'রে নিয়েও বলা যায় যে লেখিকা বিষয়-অবতারণায় সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্যে সমসাময়িক সঙ্কট ও উৎকণ্ঠাকে আরও পরিষ্কার-ভাবে ব্যাখ্যা করে তাকে চরিতপরিচয়ের আগে স্থাপন করলে ভাল করতেন, কেননা যুগ-পরিবেশের মধ্যেই প্রধানত কবিমানস বিবর্তিত হয়। সত্যেন্দ্রকাব্যের প্রসঙ্গে যুগের বিস্তৃত পরিচয় সমধিক প্রয়োজনীয়, কারণ যুগসচেতনতা ও সাময়িকতা তাঁর বিষয়-প্রতিষ্ঠ কবিতার অন্যতম মৌল ভিত্তি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিভিন্ন বিভাগে লেখিকা সত্যেন্দ্রকাব্যভাবধারাকে বিভিন্নভাবে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। এখানে সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞানের সাধনা, বিজ্ঞানানুরাগ, ঐতিহ্যপ্রীতি, মানবিকতা, সমাজনীতি, ধর্মবোধ, স্বদেশপ্রেম, চরিত্রপ্রজ্ঞা, মানবীয় প্রেম, বাৎসল্যরস, হাস্যরস প্রভৃতির মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণী পদ্ধতিতে কবিমানসের বিভিন্ন দিকের উপর সুষ্ঠুভাবে আলোকপাত করা সম্ভবপর হলেও তার বিবর্তনের কালানুক্রমিক ইতিহাসটি যথাযথভাবে প্রতিভাত হয় না, অথচ এই বিবর্তনের ইতিহাসেই কাব্যাত্মার রহস্য ও সৌন্দর্যের উন্মোচন ঘটে। আলোচ্য গ্রন্থে কবিমানসের খণ্ড খণ্ড পরিচয় থাকলেও তার একটি অখণ্ড ও সামগ্রিক রূপ পরিস্ফুট হয় নি। সত্যেন্দ্র-রচনাবলীর কালানুক্রমিক আলোচনা না থাকাতে তাঁর কবিমানসের বিবর্তন ও পরিণতির ইতিবৃত্তও অস্পষ্ট থেকে গেছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে লেখিকা সত্যেন্দ্রনাথের রচনাশিল্পের একটি বুদ্ধিদীপ্ত পরিচয় প্রদান করেছেন। এইটিই এই গ্রন্থের সবচেয়ে সুলিখিত অধ্যায়। এই অধ্যায়ে সনেটরচয়িতা, অনুবাদক, ভাষাশিল্পী ও ছন্দের যাদুকর হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথের কবিকর্মের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাতে লেখিকা যে প্রবোধচন্দ্র সেনের সুযোগ্য ছাত্রী এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না। তবে এই প্রসঙ্গে সনেটসম্পর্কে একটি কথা বলবার আছে। সনেটের জন্ম ইতালীতে এবং পেত্রার্কা, টাসো ও দান্তের হাতেই এই কলাকৃতির এক আশ্চর্য বিকাশ ঘটে। সনেটের দুটিপিনদ্ধ কায়াটির চৌদ্দটি চরণ অষ্টপদী (Octave) ও ষট্‌পদী (Sestette) এই দুইটি স্তবকে বিভক্ত। প্রথম স্তবকটি দ্বিতীয় স্তবকের অনুবর্তী এবং উভয় স্তবক একত্রে একটি অখণ্ড হৃদয়ভাবমণ্ডলের ধারক। তাছাড়া এর বিশিষ্ট অন্ত্যানু-প্রাস পদ্ধতিটিও (অষ্টপদী স্তবকে কথ খ ক ক খথ ক ও ষট্‌পদী স্তবকে গঘ গ ঘ

গঘ কিংবা গ ঘ ঙ গ ঘ ঙ) অবশ্যমান্য। বস্তুত চতুর্দশপদী পদ্যবন্ধের মধ্যে স্তবক-বন্ধন ও অন্ত্যানুপ্রাসের উপর্যুক্ত বিশেষ নিয়ম না মানলে আর যাই হোক সত্যকার সনেট সৃষ্টি হয় না। সে হিসেবে অন্য যে কোন স্তবকবিন্যাস ও অন্ত্যানুপ্রাসবিশিষ্ট চতুর্দশ চরণের পদ্যবন্ধকে সনেট না বলে সনেটকল্প বা চতুর্দশপদী কবিতা বলাই যুক্তিযুক্ত। বাংলাভাষায় দেখা যায় যে চতুর্দশ এবং বিশেষ করে অষ্টাদশ অক্ষর সম্বলিত পয়ারের চরণই সনেট রচনার পক্ষে প্রশস্ত। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ অনেক নূতন ছন্দ, স্তবকসজ্জা ও অন্ত্যমিলের বাহাদুরি দেখিয়েছেন। ভাল ক'রে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে এগুলিতে সনেটের প্রকৃত চরিত্র ধরা পড়ে নি। লেখিকা এগুলিকে কেন সনেটের মর্যাদা দিলেন তা বোঝা গেল না।

পূর্বেই বলেছি যে সত্যেন্দ্রকাব্যের মূল্যায়নে ও সৌন্দর্যবিচারে লেখিকা অনেকাংশে মোহিতলালের 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' শীর্ষক প্রবন্ধটির উপর নির্ভর করেছেন। যেখানে তিনি মোহিতলালের কোন অভিমত খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন, সেখানে মোহিতলালের মন্তব্যই সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয়। মোহিতলাল সত্যেন্দ্রকাব্যের জনপ্রিয়তার দুটি কারণ নির্দেশ করেছেন—এক, সাময়িকতাসক্তি এবং দুই, আশ্চর্য ছন্দনির্মাণকৌশল। তাঁর মতে এই দুটি কারণই সত্যেন্দ্রনাথের 'বালকের মত অপরিণত চরিত্রের ফল'। লেখিকা সেখানে বলতে চেয়েছেন যে এই দুটি 'কবিসুলভ কোমল হৃদয়ের অনুভূতিপ্রবণতার লক্ষণ'। কিন্তু এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্যেন্দ্রনাথের কবিমন বিষয়বস্তুর আন্তরিক সৌন্দর্যগভীরতায় অবগাহন না করে তার বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বে মুগ্ধ হয়ে বাহ্যিক-রূপের ধ্যানেই আত্মহারা হত। সেই জন্যই তাঁর কাব্যে ভাবপরিপক্বতার রঙ স্বল্পই দেখা যায় এবং তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণীমূর্তিনির্মাতা হয়েও প্রথম শ্রেণীর কাব্যস্রষ্টা হতে পারেন নি। অনেক জায়গায় তিনি সাময়িক ঘটনার উত্তেজনা ও শব্দক্রীড়ার উল্লাসে মহৎকবির পরিণত প্রজ্ঞাদৃষ্টি বা সৃজনক্ষমতাকে হারিয়ে ফেলেছেন। ফলে তাঁর কবিতা সাময়িকতার বেড়া পেরিয়ে নিত্যকালের রসের ঘরে সংসার পাততে পারে নি। তাঁর অনেক কবিতাই ড্রাইডেন বা পোপের 'Wit-writing' হয়েছে, কিন্তু সত্যকার কাব্যরসতীর্থে পৌঁছতে গিয়ে ব্যর্থতা বরণ করেছে।

গ্রন্থপাঠে মনে হয়—লেখিকা কাব্যমূল্যবিচারের ব্যাপারে আরও স্বাবলম্বী ও আত্ম-বিশ্বাসের অধিকারী হলে ভাল হত। তথ্যসংগ্রহ ও পরিবেষণে তাঁর কৃতিত্ব যেমন প্রকটিত, তার বিশ্লেষণে তাঁর নৈপুণ্য তেমন পরিস্ফুট নয়। মন্তব্যের ব্যাপারে তিনি মোহিতলাল মজুমদার, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও "প্রবাসী"র মুদ্রারাক্ষসের উপর প্রধানত নির্ভর করেছেন। এটি নিশ্চয়ই সুলক্ষণ নয়। মৌলিক মতামত প্রকাশের সমালোচকের অগ্নিপরীক্ষা হয় ও তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটে। টি. এস. এলিঅটের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য।

"The majority of critics can be expected only to parrot the opinions of the last master of criticism; among more independent minds a period of destruction, of preposterous over-estimation, and of successive fashions takes place, until a new authority comes to introduce some order."

—*The Use of Poetry and the Use of Criticism.*

চতুর্থ অধ্যায়ে সত্যেন্দ্রকাব্যের মূল্যায়নে লেখিকা সত্যেন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও পরবর্তী

কয়েকজন কবির উপর তাঁর প্রভাবের উল্লেখ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুল ইসলাম এবং পরবর্তীকালে "কল্লোল"গোষ্ঠীর জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি আধুনিক কাব্যের বিশিষ্ট কর্ণধারদের উপর বর্তেছিল। লেখিকা যদি হরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রভৃতির উপর সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবের আলোচনা না করে উপর্যুক্ত কবিদের নিয়ে একটি বিস্তৃত আলোচনা করতেন, তাহলে সত্যেন্দ্রমণ্ডলীর রূপটি অধিকতর যথার্থ হত।

সর্বদিক বিচার করলে সত্যেন্দ্রকাব্যের চর্চায় বর্তমান গ্রন্থটি একটি মূল্যবান অবলম্বন।

সুশীলকুমার গুপ্ত

প্রেমের কবিতা— আবদুর রশীদ খান ও মোহাম্মদ মামুন সম্পাদিত। ইস্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, ৪৫ ইসলামপুর রোড, ঢাকা। মূল্য ৪।০

ইতিহাসের ছুরি বাংলার ভূগোলকে খিধাবিভক্ত করলেও বাংলার সাহিত্য এখনো স্রোতস্বিনীর অবিভাজ্যতায় বহমান এবং শত বিপর্যয়েও কখনো তা লুপ্তধারা হবে না। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বপাকিস্তান, দুটি পৃথক রাষ্ট্রিক সত্তা হ'লেও, সাংস্কৃতিক আত্মীয়তায় একটি যে অপরটির পরিপূরক নৈকট্যে অবস্থিত, বাংলাভাষা ও সাহিত্যই তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ।

মাতৃভাষা রক্ষার জন্য যে-দেশের মানুষ প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে, সে দেশের সাহিত্য-জগতের খবরাখবর জানার জন্য স্বভাবতঃই মন উৎসুক থাকে, জানতে ইচ্ছা করে সেখানকার সাহিত্যকর্মীরা আমাদের ভাবনা-চিন্তার কতখানি অংশীদার। কিন্তু নানা বাস্তব কারণে সে ইচ্ছার সে উৎসাহের কোরকেই মৃত্যু ঘটে। তবু সৌভাগ্যবশত মাঝে-মধ্যে ও ইতঃস্তত-ভাবে পূর্বপাকিস্তানের সাম্প্রতিক সাহিত্য-কর্মকৃতির যে-সব খবর কিংবা প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ পাওয়া যায়, তাতে উৎসাহিত বোধ করার কারণ থাকে।

অতি-সম্প্রতি আবদুর রশীদ খান ও মোহাম্মদ মামুন সম্পাদিত "প্রেমের কবিতা" নামীয় প্রেম-কাব্যের সংকলন পাঠ ক'রে যুগপৎ উৎসাহিত ও তৃপ্ত হয়েছি। দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও সংকলনটি কবিতাপাঠকের সমাদরযোগ্য।

নজরুল থেকে শুরু ক'রে তরুণতম ওমর আলী পর্যন্ত মোট একান্নজনের কবিতার গ্রন্থনায় প্রকাশিত এই সংগ্রহ-গ্রন্থের প্রধান ত্রুটি, আমার মতে, সংকলনের নীতিতে নিহিত। 'নীতি' কথাটা লিখে আমাকে থামতে হলো, কারণ, বলতে গেলে সম্পাদকরা সুস্পষ্ট কোন নীতির ভিত্তিতে সংগ্রহ-কার্যে অগ্রসর হন নি। সম্পাদকদের কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন : সংকলনটি কী ধর্মীয় ভিত্তিতে রচিত? মুসলমান কবিদের রচনার দিকে চোখ রেখেই কী এটি করা হয়েছে? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, বলা যায় অনুপ্রশ্ন, ভৌগোলিক চেতনা ও দৃষ্টি দ্বারাই কী সম্পাদকরা পরিচালিত হয়েছেন?

বলা বাহুল্য, সংকলনের মাধ্যমেই সম্পাদকরা তার উত্তর দিয়েছেন। সংকলনটিতে মুসলমান কবিদের সংখ্যাধিক্য থাকলেও হিন্দু কবিরা একেবারে উপেক্ষিত হননি, তিনজন হিন্দু কবির রচনা তার প্রমাণ। সুতরাং সংকলনটি ধর্মীয় নীতি-ভিত্তিক নয়। দ্বিতীয়ত,

সংকলন-ধৃত কবিরা, যতদূর জানি ও শুনেছি, সকলেই পূর্বপাকিস্তানে বাস করেন। সকলেই, কিন্তু একজন নন। সংকলন যাঁকে দিয়ে শুরু, সেই নজরুল পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। সুতরাং এদিক থেকে তাঁদের নীতি স্থিতবিন্দু থাকতে পারে নি। অর্থাৎ আলোচ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সম্পাদকরা বিভিন্ন নীতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

যদি পূর্বপাকিস্তানের কবিতার সংগ্রহ প্রকাশ সম্পাদকদের অভিপ্রেত হ'য়ে থাকে, তবে সে ক্ষেত্রেও সম্পাদকরা ব্যর্থকাম হয়েছেন বলতে হবে, কারণ সংকলন-ধৃত বহু কবিতাই পূর্বপাকিস্তানের জন্মের আগে রচিত। পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক কাব্যকলায় রাষ্ট্রিক সত্তারূপে পূর্বপাকিস্তানের প্রভাব দেখানো যদি সম্পাদকদের উদ্দিষ্ট হয়, তাহলেও বলবো সংকলনে তার কোন পরিচয় নেই, এবং তা না থাকাই স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। সংকলনটি যখন বাংলা কবিতার, ভৌগোলিক বা রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গ-প্রশ্ন তখন নিতান্তই অবান্তর। বাংলা কবিতার সংকলনের অন্তর্ভুক্তি-যোগ্য রচনা বাংলা ভাষায় রচিত হ'লেই যথেষ্ট, সে কবিতা পশ্চিমবঙ্গের না পূর্বপাকিস্তানের তা দেখার প্রয়োজন পড়ে না।

এই জন্যই সম্পাদকদ্বয় ভূমিকাতে যখন বলেন : 'নজরুল ইসলামকে বাদ দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে কোন সংকলনের চিন্তা করা যায় না', তখন স্বভাবতঃই কবিতা-পাঠক হিসাবে বিব্রত বোধ করি। তখনই প্রশ্ন জাগে : নজরুল কী বিশিষ্টভাবে পূর্বপাকিস্তানের কবি? পূর্বপাকিস্তানের জন্মের আগে যিনি স্তব্ধলেখনী, আজীবন যিনি হৃদয়ের ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের প্রতি অন্ধভাবে লগ্ন থাকেন নি, তাঁকে বিশিষ্টভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের কবি বলি কোন যুক্তিতে? কোন যুক্তিতে রবীন্দ্রনাথকে বিশিষ্টভাবে পশ্চিম-বঙ্গের বা হিন্দুস্থানের কবি আখ্যা দিয়ে ছোট করবো? রবীন্দ্রনাথ কি নজরুল জীবনানন্দ কি জসীমউদ্দীন যতখানি পূর্বপাকিস্তানের ততখানি-ই পশ্চিমবঙ্গের। তাঁরা বাংলার কবি, বাংলা ভাষার কবি, এইটিই তাঁদের পরিচয় এবং সেই হিসাবে উভয় বঙ্গের বাসিন্দারাই তাঁদের দানৈশ্বর্যের সমান অংশীদার।

সুতরাং "প্রেমের কবিতা"র সম্পাদকদ্বয় নজরুল থেকে শুরু না ক'রে রবীন্দ্রনাথ থেকে যদি শুরু করতেন এবং ভৌগোলিক সীমা-সত্তার কথা ভুলে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কবিদের, বলা উচিত বাঙালী কবিদের, রচনা তাঁদের সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করতেন, তাহ'লে তাঁদের সংকলন বাংলা কবিতায় অনিন্দ্য স্বর্ণকোষে পরিণত হ'তে পারত। সেই সংকলনে তাঁরা পূর্বপাকিস্তানের কাব্যকৃতির সামগ্রিক রূপ পরিস্ফুটনের জন্য তুলনামূলকভাবে পূর্বপাকিস্তানবাসী কবিদের, বিশেষত তরুণ কবিদের রচনা অধিক সংখ্যায় গ্রহণ করতে পারতেন এবং তাতে ক্ষতির পরিবর্তে লাভই হতো। আর আমরা পশ্চিমবঙ্গের কবিতা-পাঠকরা সামগ্রিক বাংলা কবিতার পশ্চাৎপটে পূর্বপাকিস্তানের সাম্প্রতিক কাব্যকৃতির মূল্য নির্ধারণ করতে পারতাম। এই ধরনের পূর্ণাঙ্গ কাব্য সংকলন-কর্মে সম্পাদকরা হয়তো কিছু বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন হতেন, কিন্তু সে-সব অসুবিধা অনতিক্রম্য নয়। আশা করি, একটি যথার্থ পূর্ণাঙ্গ কাব্য-সংকলনের ব্যাপারে অচিরেই পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্য-কর্মীরা সচেষ্ট হবেন এবং পশ্চিমবঙ্গকে এ বিষয়ে তাঁরা পথ দেখাবেন।

শুধুমাত্র পূর্বপাকিস্তানের কবিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার ফলে বর্তমান সংকলনে উল্লেখ্যসংখ্যক বিশিষ্টরকমের ভালো কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সম্পাদকদের কবি-সুলভ দুর্বলতার ছিদ্রপথ দিয়ে কিছু অশক্ত কবিতা ও মামুলী গানেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে বর্তমান সংকলনে। তা সত্ত্বেও "প্রেমের কবিতা"য় যথার্থ কয়েকটি ভালো কবিতা

বিদ্যমান। এবং এ জন্য আবদুর রশীদ খান ও মোহাম্মদ মামুন আমাদের ধন্যবাদভাজন। সংকলনের ভূমিকা থেকে জানা যায়, কবিতা নির্বাচনে তাঁরা 'নরনারীর চিরন্তন সম্পর্কের উপরই জোর' দিয়েছেন। অর্থাৎ দেহকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত যে প্রেম, সেই শরীরী প্রেমকে উপজীব্য ক'রে রচিত কবিতার গ্রন্থনায় বর্তমান সংকলনের আত্মপ্রকাশ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, বাংলা সাহিত্যের আদিকাল থেকে বহমান কামনাবেগনির্ভর প্রেমের কবিতার বিশিষ্ট ধারাটি, যা এই শতকের প্রথমার্ধেও মোহিতলাল বুদ্ধদেব অজিত দত্ত প্রমুখ কবিদের দাক্ষিণ্যে পুষ্ট ছিল, পূর্বপাকিস্তানের সাম্প্রতিক কবিদের কর্মকৃতিতে জীবন্তরকমে পরিলক্ষিত হলো। আসঙ্গলিপ্সা, যৌবনযন্ত্রণা, মিলনের আনন্দময়তা প্রভৃতি প্রেমের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নানা সুরে ও স্বরে উচ্চারিত হয়েছে সংকলন-ভুক্ত কবিতাবলীতে। কোন কোন কবিতায় অকৈতব আবেগানুভূতির রূপায়ণে প্রস্ফুট বলিষ্ঠতা ও সারল্যের দীপ্তি নিঃসন্দেহেই প্রশংসাযোগ্য। সামগ্রিকভাবে, সংকলিত কবিতার অধিকাংশই অনুভব ও আন্তরিকতার গুণে চিত্তস্পন্দী।

প্রেমের দৈবতা যতই বড়ো হোক, জৈবতার চেয়ে বড়ো নিশ্চয়ই নয়, আধুনিক মনের এই বিশ্বাস "প্রেমের কবিতা"র অধিকাংশ কবিতাতেই রূপায়িত হ'তে দেখি। অর্থাৎ আলোচ্য সংকলনের কবিরা প্রায় ক্ষেত্রে দেহবাদী, প্রেমকে শারীরীরূপে দেখায় তাঁরা অভ্যস্ত। মানুষের শরীরকে ঘিরেই তাঁদের ইচ্ছা-বাসনা-স্বপ্ন-কল্পনা গুঞ্জরিত :

তোমার দেহের তীরে একমাত্র বাঁচবার আশা (সৈয়দ আলী আহসান পৃ. ১০০)
তাইতো তোমাকে চাই পূর্ণপ্রাণ সূর্যের মতন (ঐ, পৃ. ১০১)

পয়োধর পুষ্পবৃন্তে ভ্রমরের চুম্বন-লিখন!...
অধরের পাত্রভরা মোহময় সুরা-প্রস্রবন! (হাবীবুর রহমান, পৃ. ১০২)

...তীক্ষ্ণধার আমার কিরিচে
অলৌকিক স্পর্ধা দাও। ঈশ্বরের অপরূপ ফল
আমি যেন বিদ্ধ করে নিতে পারি। যেন
ভাগ করে দিতে পারি—আমার সে প্রিয়তমা নারীকে কেবল। (আল মাহমুদ, পৃ. ১৮০)

আত্মার আনন্দ উঠে উন্মথিয়া দেহ-সিন্ধুনীরে (আবদুল কাদির, পৃ. ৪৩)

এ জীবন সীমাবদ্ধ হয় হোক বাহুর বন্ধনে,
অজানিত অকল্পিত
শিহরণ-সুখ চাই স্পর্শে আলিঙ্গনে;
দুঃসহ অগ্নির দাহ
চাই উষ্ণ অবারিত বক্ষের স্পন্দনে,
বিষামৃত-স্বাদ চাই একসাথে অধর চুম্বনে। (প্রজেশকুমার রায়, পৃ. ৫১)

"প্রেমের কবিতা"-ধৃত কবিদের জীবনদর্শনে যে মানুষের শরীর প্রধানতম অংশ গ্রহণ ক'রে আছে, উপরের ঐতঃস্তাতিক উদ্ধৃতিগুলিই তার প্রমাণ। এদিক থেকে পূর্ববঙ্গের গোবিন্দ দাস বা মোহিতলাল বুদ্ধদেব অজিত দত্ত প্রমুখের সঙ্গে তাঁদের সাজাত্য সুস্পষ্ট।

উদাহরণস্বরূপ এ'দের একজনের রচনায় মোহিতলালের

'ভুলেছি আত্মার কথা মানি শুধু দেহের সীমানা'-র প্রতিধ্বনি শ্রুত হয় এইভাবে :

'মানি না আত্মার আয়ু, ঋতিহীন...
দেহের বিনাশ হ'লে পরপারে পুনর্মিলনের
উৎসব উজ্জ্বল হবে—করবো না সে কথা স্বীকার।' (শামসুর রহমান, পৃ. ১৫০)

দেহবাদিতা ছাড়াও বাকপ্রতিমা-নির্মাণ উপমা-বয়ন, কায়া-গঠন, উচ্চারণভঙ্গী ইত্যাদিতেও বর্তমান সংকলনের কবিকুল রবীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দ-বিষ্ণু দে-প্রেমেন্দ্র মিত্র-বুদ্ধদেব প্রমুখ আধুনিক কবিদের সঙ্গে নিকট আত্মীয়তায় সম্পর্কিত। পূর্ব-পাকিস্তানের তরুণ কবিদের উপর 'পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ প্রতিষ্ঠ কবিদের' (উদ্ধৃতিচিহ্নান্তর্গত বাক্যাংশ ব্যবহার করতে দুঃখ হচ্ছে) প্রভাব বিশেষভাবে চোখে পড়ে। যেমন; 'চোখের নরম ঘুম' (পৃ. ১০৩), 'রৌদ্রের মসৃণ বালাপোষে' (পৃ. ১৪৮), প্রভৃতি জীবনানন্দকে মনে করিয়ে দেয়। তরুণ শামসুর রহমান—যাঁর মধ্যে আধুনিকতার সুর অধিকতর শ্রুত—যখন লেখেন :

তখন রাত্রির পূর্ণ আকাশে হঠাৎ এলো চাঁদ—
অমূল্য, অপ্রাপণীয় মুক্তো। আর একটি শঙ্খের
ইতস্তত পথ শুঁকে এসে গেলো জ্যোৎস্নায়,

তখন অনিবার্যভাবেই জীবনানন্দের 'হামিদের মরকুটে কানা ঘোড়া'র 'জ্যোৎস্নায় নিজ মনে' ঘাস খেয়ে যাওয়ার চিত্রকল্প মনে আসে। কারো কারো রচনায় জীবনানন্দ মূর্তরূপে উপস্থিত, প্রমাণ :

প্রশান্ত সাগর তীরে ঘুরেছি অনেক দিন বিজন সন্ধ্যায়...
সফেন তরঙ্গ দূরে 'বার্ড রকে' বুনো হাঁস সাঁ-গল পাখিরা ঘুম যায়।...
সে প্রাণ সফেন শান্ত! তোমাকে দেখাবো এই সমুদ্র বেলায়

কারো কারো কবিতায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাগ্বিধি, মিতভাষণ, ব্যঞ্জনাগর্ভতা লক্ষণীয় :

তবু মনে থাকে।...
তবু সে এসেছে পায় পায়
স্মরণের সিঁড়ির গোড়ায়
মনের দুয়ার ধরে
জীবনের এই সীমানায়
তবু চেয়ে থাকে অবিরত। (আবদুর রশীদ খান, পৃ. ১৩২)

হৃদয়ের উত্তপ্ত বাতাসে
চোখ বুজে আসে।
আমার শরীর হাত
কী ছোঁয়াচ লেগেছে তোমার!
তার চেয়ে বড়ো এই জীবনের দাম
বেঁচে থাকা যার মানে। (মোহাম্মদ মামুন, পৃ. ১৩৮)

বিষ্ণু দে-র বচনশৈলীর প্রভাব (বর্তমান ক্ষেত্রে অব্যয় ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য এবং উপমা-বয়ন) কারো কারো রচনায় পরিদৃষ্ট হয় :

এবং তোমার শরীরের ভীরু নদী...

এবং অন্ধ লালসারা কটিতটে। (ফজল শাহাবুদ্দীন, পৃ. ১৭৪)

লাল গোলাপটা তোমাকে মানায় বেশ,
অথবা তুমিই গোলাপের লাল কুঁড়ি (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পৃ. ১৭৫)

সংকলনের গোড়ার দিকে রবীন্দ্র-সুর প্রতিধ্বনিত। প্রমাণ :

ধরি বক্ষের বড় কাছাকাছি
বলেছিনু, 'তোমা ভালোবাসিয়াছি।'
মানস-কুসুমে গাঁথি' মালাগাছি
কণ্ঠে পরানু তোর।
প্রিয়ারে আমার চিনেছি এবার
মুছেছি নয়ন-লোর॥...(আবদুল কাদির, পৃ. ৩৪)

অগ্নি বিহরে স্নায়ুতে শিরায়
রক্তে জাগিল রোল।
বসন্ত-বায় করে হায় হায়,
হৃদয়ে প্রলয়-দোল॥...(আবদুল কাদির, পৃ. ৩৬)

উপরি-উদ্ধৃত পংক্তিনিচয়-বহুল 'সফল বসন্ত' রবীন্দ্রনাথের 'ঝুলন' কবিতাকে মনে করিয়ে দেয়।

"প্রেমের কবিতা"য় সংকলিত কবিতাগুলিতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ কবিদের প্রভাব আবিষ্কার করার অর্থ ঐ কবিতাবলীর স্রষ্টাদের প্রতি কোনরকম কটাক্ষনিক্ষেপ নয়; পক্ষান্তরে বক্ষ্যমাণ কবিরা যে মানসমণ্ডলে তাঁদের অগ্রজ ও সমসাময়িকদের সঙ্গে কত নিবিড় আত্মীয়তায় বদ্ধ, তা প্রতিপন্ন করাই আমার প্রয়াসী লক্ষ্য। আমি যদি সে-লক্ষ্যে পৌঁছে থাকি, তবে স্বয়ংসিদ্ধভাবেই এ-কথাও বোধ করি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক কাব্যধারার প্রবর্তক ও বাহকবৃন্দকে বাদ দিয়ে বাংলা কবিতার পূর্ণাঙ্গ সংকলন সম্ভব নয়।

পূর্বজদের অনুসরণ করা অপরাধ নয়, পূর্বজদের কাব্য-ঐতিহ্যই পরবর্তীদের কাব্যোদ্গম লালিত হয়। প্রথম প্রথম অগ্রজদের প্রভাব জোর ক'রে না এড়ানো ভালো এবং সেইটাই মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ। কিন্তু সে প্রভাব স্বাঙ্গীকরণের পর নিজের বিশিষ্টতা-জ্ঞাপক কবিতা রচনায় প্রয়াসী হবো না কেন। নিজের কথা নিজের মতো ক'রে বলাতেই কৃতিত্ব, এবং তা করতে গিয়ে প্রথম প্রথম যদি কাব্যের কিছুটা অঙ্গহানি হয়, তাতেও কোন ক্ষতি নেই। সাম্প্রতিক তরুণ কবিরা, কি পূর্বপাকিস্তান কি পশ্চিমবঙ্গের, প্রতিষ্ঠিত কবিদের নিরাপদ আশ্রয়ে লালিত হবার জন্য ব্যাকুল। এটি সৎ কবিতাব্রতীর চরিত্রবিরুদ্ধ। দৃষ্টির ব্যাপকতা, অনুভূতির গভীরতা এবং সর্বোপরি নিজস্বতা পরিস্ফুটনের সাহস, এই সব গুণের যুগপৎ সমাবেশ তরুণ কবিদের রচনায় বিরলদৃষ্ট।

উপর্যুক্ত গুণগুলির যুগপৎ সমাবেশ দুর্লভ হ'লেও পূর্বপাকিস্তানের সাম্প্রতিক কাব্য-ধারায় যে-একটি বড় গুণ সাধারণভাবে লক্ষ ক'রে তৃপ্তি পাওয়া যায় তা হলো : আন্তরিকতা। গভীরতা সব সময় না থাকলেও খাঁটি অনুভূতি আছে বর্তমান সংকলন-ধৃত কবিতাবলীর (বিশেষত শেষ দিককার) অধিকাংশেরই। অর্থাৎ এই সব কবিতার স্রষ্টা যাঁরা, তাঁরা অনুভব ক'রে লেখেন, হৃদয়াবেগের উৎস থেকে তাঁরা কবিতার উপাদান সংগ্রহ করেন। প্রেমাস্পদকে

পাওয়ার তীব্রতা বা পাওয়া-না-পাওয়ার আনন্দ-বিষাদ, এক কথায় প্রেমের বিচিত্র বর্ণিল ভাবনার প্রকাশে এঁদের অনেকেই সিদ্ধলেখনী। সেই প্রকাশভঙ্গীতে হয়তো দুর্বলতা আছে, হয়তো মনের কথা সব ক্ষেত্রে গুছিয়ে বলতে পারেন নি কবি, তবু অনুভূতির মাধুর্য ও সংরাগের তীব্রতা তাঁর রচনাকে হার্দ্য ক'রে তুলেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আঙ্গিকগত সিদ্ধির সামীপ্যও যে তিনি পান নি তা নয়। ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণায় আলোড়িত একটি তরুণ মনের দীর্ঘশ্বাস নিবিড় ব্যঞ্জনায় ও মেদুর মিতভাষণে ফুটে উঠেছে সংকলনের সর্বকনিষ্ঠ কবি ওমর আলীর পূর্ণ উদ্ধারণযোগ্য কবিতাটিতে :

একদিন একটি লোক এসে বললো, 'পারো?'
বললাম, 'কি?'
'একটি নারীর ছবি এঁকে দিতে', সে বললো আরো,
'সে আকৃতি
অদ্ভুত সুন্দরী, দৃপ্ত নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে—
পেতে চাই নিখুঁত ছবিতে।'

'কেন?' আমি বললাম শুনে।
সে বললো, 'আমি সেটা পোড়াবো আগুনে।'
(একদিন একটি লোক, পৃ. ১৮৩)

কয়েকটি মনে রাখার মতো সহজ-সুন্দর বাকপ্রতিমারও সন্ধান পাওয়া যায় সংকলনে :

কাল সে আসিবে, মুখখানি তার নতুন চরের মত
(জসীম উদ্‌দীন, পৃ. ২৫)

শান্ত নদী আর্শি ধরে (আবদুল হাই মাশরেকী পৃ. ৯১)

বটগাছ উঁচু ডাল
কি যেন দেখেছ কাল
জানালার ফাঁক দিয়ে
আকাশ টোপর (মোহাম্মদ মামুন, পৃ. ১৪০)

জল ছুঁয়ে চাঁদ ডুবে যায়
জল তবু পেয়েছে কি চাঁদের পরশ!
তবু দেখি চাঁদ এসে জল ছুঁয়ে যায়।
(আবদুর রশীদ খান, পৃ. ১৩৫)

অনাবাদী মাঠ-শেষে তুমি এক বনানী শ্যামল,—
পরিশ্রান্ত দুপুরের ছায়া-ঘেরা স্বচ্ছ নীল হ্রদ, (আতাউর রহমান, পৃ. ১২৪)

সমস্ত দুপুর ভ'রে জলের আলোর নিচে দেখলাম তাকে;
সঞ্চারিণী জলজ উদ্ভিদ যেন। (শামসুর রহমান, পৃ. ১৪৭)

এবং অন্ধ লালসারা কটিতটে। (ফজল শাহাবুদ্দীন, পৃ. ১৭৪)

লাল গোলাপটা তোমাকে মানায় বেশ,
অথবা তুমিই গোলাপের লাল কুঁড়ি (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পৃ. ১৭৫)

সংকলনের গোড়ার দিকে রবীন্দ্র-সুর প্রতিধ্বনিত। প্রমাণ :

ধরি বক্ষের বড় কাছাকাছি
বলেছিনু, 'তোমা ভালোবাসিয়াছি।'
মানস-কুসুমে গাঁথি' মালাগাছি
কণ্ঠে পরানু তোর।
প্রিয়ারে আমার চিনেছি এবার
মুছেছি নয়ন-লোর॥...(আবদুল কাদির, পৃ. ৩৪)

অস্থি বিহরে স্নায়ুতে শিরায়
রক্তে জাগিল রোল।
বসন্ত-বায় করে হায় হায়,
হৃদয়ে প্রলয়-দোল॥...(আবদুল কাদির, পৃ. ৩৬)

উপরি-উদ্ধৃত পংক্তিনিচয়-বহুল 'সফল বসন্ত' রবীন্দ্রনাথের 'ঝুলন' কবিতাকে মনে করিয়ে দেয়।

"প্রেমের কবিতা"য় সংকলিত কবিতাগুলিতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ কবিদের প্রভাব আবিষ্কার করার অর্থ ঐ কবিতাবলীর স্রষ্টাদের প্রতি কোনরকম কটাক্ষনিক্ষেপ নয়; পক্ষান্তরে বক্ষ্যমাণ কবিরা যে মানসমণ্ডলে তাঁদের অগ্রজ ও সমসাময়িকদের সঙ্গে কত নিবিড় আত্মীয়তায় বদ্ধ, তা প্রতিপন্ন করাই আমার প্রয়াসী লক্ষ্য। আমি যদি সে-লক্ষ্যে পৌঁছে থাকি, তবে স্বয়ংসিদ্ধভাবেই এ-কথাও বোধ করি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক কাব্যধারার প্রবর্তক ও বাহকবৃন্দকে বাদ দিয়ে বাংলা কবিতার পূর্ণাঙ্গ সংকলন সম্ভব নয়।

পূর্বজদের অনুসরণ করা অপরাধ নয়, পূর্বজদের কাব্য-ঐতিহ্যেই পরবর্তীদের কাব্যোদ্যম লালিত হয়। প্রথম প্রথম অগ্রজদের প্রভাব জোর ক'রে না এড়ানো ভালো এবং সেইটাই মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ। কিন্তু সে প্রভাব স্বাঙ্গীকরণের পর নিজের বিশিষ্টতা-জ্ঞাপক কবিতা রচনায় প্রয়াসী হবো না কেন। নিজের কথা নিজের মতো ক'রে বলাতেই কৃতিত্ব, এবং তা করতে গিয়ে প্রথম প্রথম যদি কাব্যের কিছুটা অঙ্গহানি হয়, তাতেও কোন ক্ষতি নেই। সাম্প্রতিক তরুণ কবিরা, কি পূর্বপাকিস্তান কি পশ্চিমবঙ্গের, প্রতিষ্ঠিত কবিদের নিরাপদ আশ্রয়ে লালিত হবার জন্য ব্যাকুল। এটি সৎ কবিতাব্রতীর চরিত্রবিরুদ্ধ। দৃষ্টির ব্যাপকতা, অনুভূতির গভীরতা এবং সর্বোপরি নিজস্বতা পরিস্ফুটনের সাহস, এই সব গুণের যুগপৎ সমাবেশ তরুণ কবিদের রচনায় বিরলদৃষ্ট।

উপর্যুক্ত গুণগুলির যুগপৎ সমাবেশ দুর্লভ হ'লেও পূর্বপাকিস্তানের সাম্প্রতিক কাব্য-ধারায় যে-একটি বড় গুণ সাধারণভাবে লক্ষ ক'রে তৃপ্তি পাওয়া যায় তা হলো : আন্তরিকতা। গভীরতা সব সময় না থাকলেও খাঁটি অনুভূতি আছে বর্তমান সংকলন-ধৃত কবিতাবলীর (বিশেষত শেষ দিককার) অধিকাংশেরই। অর্থাৎ এই সব কবিতার স্রষ্টা যাঁরা, তাঁরা অনুভব ক'রে লেখেন, হৃদয়াবেগের উৎস থেকে তাঁরা কবিতার উপাদান সংগ্রহ করেন। প্রেমাস্পদকে

পাওয়ার তীব্রতা বা পাওয়া-না-পাওয়ার আনন্দ-বিষাদ, এক কথায় প্রেমের বিচিত্র বর্ণালি ভাবনার প্রকাশে এঁদের অনেকেই সিদ্ধলেখনী। সেই প্রকাশভঙ্গীতে হয়তো দুর্বলতা আছে, হয়তো মনের কথা সব ক্ষেত্রে গুছিয়ে বলতে পারেন নি কবি, তবু অনুভূতির মাধুর্য ও সংরাগের তীব্রতা তাঁর রচনাকে হার্দ্য ক'রে তুলেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আঙ্গিকগত সিদ্ধির সামীপ্যও যে তিনি পান নি তা নয়। ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণায় আলোড়িত একটি তরুণ মনের দীর্ঘশ্বাস নিবিড় ব্যঞ্জনায় ও মেদুর মিতভাষণে ফুটে উঠেছে সংকলনের সর্বকনিষ্ঠ কবি ওমর আলীর পূর্ণ উদ্ধারণযোগ্য কবিতাটিতে :

একদিন একটি লোক এসে বললো, 'পারো?'
বললাম, 'কি?'
'একটি নারীর ছবি এঁকে দিতে', সে বললো আরো,
'সে আকৃতি
অদ্ভুত সুন্দরী, দৃপ্ত নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে—
পেতে চাই নিখুঁত ছবিতে।'

'কেন?' আমি বললাম শুনে।
সে বললো, 'আমি সেটা পোড়াবো আগুনে।'
(একদিন একটি লোক, পৃ. ১৮৩)

কয়েকটি মনে রাখার মতো সহজ-সুন্দর বাকপ্রতিমারও সন্ধান পাওয়া যায় সংকলনে :

কাল সে আসিবে, মুখখানি তার নতুন চরের মত
(জসীম উদ্‌দীন, পৃ. ২৫)

শান্ত নদী আর্শি ধরে (আবদুল হাই মাশরেকী পৃ. ৯১)

বটগাছ উঁচু ডাল
কি যেন দেখেছ কাল
জানালার ফাঁক দিয়ে
আকাশ টোপর (মোহাম্মদ মামুন, পৃ. ১৪০)

জল ছুঁয়ে চাঁদ ডুবে যায়
জল তবু পেয়েছে কি চাঁদের পরশ!
তবু দেখি চাঁদ এসে জল ছুঁয়ে যায়।
(আবদুর রশীদ খান, পৃ. ১৩৫)

অন্যবাদী মাঠ-শেষে তুমি এক বনানী শ্যামল,—
পরিশ্রান্ত দুপুরের ছায়া-ঘেরা স্বচ্ছ নীল হ্রদ, (আতাউর রহমান, পৃ. ১২৪)

সমস্ত দুপুর ভ'রে জলের আলোর নিচে দেখলাম তাকে;
সঞ্চারিণী জলজ উদ্ভিদ যেন। (শামসুর রহমান, পৃ. ১৪৭)

উপমাবয়নে চমৎকারিত্ব ফোটাতে গিয়ে কারো কারো ব্যর্থতা খেদজনক। সেবাব্রত চৌধুরীর

...আমরা প্রেমের গালে গাল রেখে নিরিবিলি কবে
শুনে যাবো শুধু বৃষ্টির গান মনের টিনের ঝকঝকে চালে
(সাঙলির জন্যে, পৃ. ১৮২)

তারল্য ও কৃত্রিমতার পরিচায়ক।

"প্রেমের কবিতা" পূর্বপাকিস্তান থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা প্রেমকাব্যের সংকলন। পথিকৃৎ-সুলভ দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও সংকলনটি বাংলা কবিতা পাঠককে তৃপ্ত করবে ব'লে আমার বিশ্বাস। সর্বোপরি, এই জাতীয় সংকলনের প্রকাশ যেমন সাহিত্য ফসলের মান নিরূপণের সহায়ক হয়, তেমনি তা উভয় বঙ্গের সাহিত্যের সেতুবন্ধ রচনাতেও গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে পারে।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

প্রবাসের জার্নাল– শিবনারায়ণ রায়। মিত্রালয়। ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

সে-যুগে বহু পূর্বে অবসিত। যে-কালে প্রবাস জীবনের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা প্রথাসম্মত ছিল। বস্তুত তা' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাহিরের তাৎক্ষণিত প্রভাবের ভাবময় উচ্ছ্বাস। তাঁরা সমুদ্র তীরের দুটি কি একটি উপল কুড়িয়ে নিয়েছেন। সংগৃহীত বস্তুর আপাত রঙের ঔজ্জ্বল্যে তাদের চিত্ত বিভ্রম ঘটেছে। আরো একটু গভীরে, মাঠে মাঠে সমুদ্রের জল নতুন পলি ফেলেছে কিনা, অন্বেষণ করেন নি। তাঁরা পুরনো ফসলের মাঠ দেখেছেন। নতুন শস্যের সম্ভাবনায় চেতনায় শিহরণ অনুভব করেন নি।

অধুনা সেই অবস্থা অতিক্রান্ত। দৃষ্ট বস্তু এখন বিশ্লেষণ নির্ভর। ভাবোচ্ছ্বাসের মোহময় শরীর নয়। শিবনারায়ণ রায়ের "প্রবাসের জার্নাল" এই প্রত্যয়ের সাম্প্রতিক উদাহরণ। গ্রন্থটি তাঁর ইংলণ্ড অবস্থানের কাহিনী।

লেখকের অভিজ্ঞতা আহরণের ক্ষমতা প্রশংসনীয়। সময়ের স্বল্প পরিধির মধ্যে তিনি বহু বিশ্লিষ্ট ঘটনার অনেক সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। স্পষ্টতই সেই সকল ব্যক্তির তিনি ঈর্ষার পাত্র, যাদের এদেশে অবস্থিতির কাল অনেক, অনেক বেশী। শুধু তাই নয়, অবস্থানেই তাদের মন সমাহিত নয়। এ দেশ জানার আগ্রহ এবং চেষ্টাও প্রচুর। তবু তাদের অবস্থা লেখক বর্ণিত বব মার্টিনের মত। লণ্ডনের অধিকাংশ গলির সংবাদও তাদের কাছে অজ্ঞাত। শ্রীযুক্ত রায় এদের সকলকে অতিক্রম করেছেন। তিনি তাঁর বর্ণনায় ফুলের নাম থেকে সুরু করে লেখার জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু তার সকল সংবাদই সংগ্রহ করেছেন। এবং অত্যন্ত নিপুণভাবে তা প্রকাশ করেছেন। অবশ্য স্থান বিশেষে এই নৈপুণ্য মনে হবে হাল্কা চাতুরী।

যদিও অনস্বীকার্য, দুই ভিন্ন ব্যক্তির অভিজ্ঞতার তৌল সময়ের সীমায় সম্ভব নয়। তবু লেখক আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই বিস্মিত করেছেন।

এগুলিও বাহ্য। গ্রন্থটির একটি বিশেষ সুর নানা প্রশ্নের অবকাশ রাখে। গ্রন্থটির পরিবেশিত বিষয়বস্তু থেকে ধারণা করা সঙ্গত যে, ফেনার ব্রকওয়ে, বার্ট্রাণ্ড রাসেল এমনতর প্রখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনাগুলি লেখকের সাময়িক প্রবৃত্তির বশবর্তী নয়। তাঁদের বক্তব্য এবং লেখকের সিদ্ধান্ত—তার জন্য ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার অপ্রয়োজনীয়। উৎসাহী পাঠক মাত্রই এদের মতবাদের সঙ্গে পরিচিত। আর লেখক যে এদেরই মত পশ্চিমী গণতন্ত্রের সমর্থক—স্থান বিশেষে বহু ইংরেজ অপেক্ষাও উগ্র—তা' তো অল্প কয়েকটি পৃষ্ঠা ওল্টালেই স্ফটিকের মত স্বচ্ছ মনে হবে। লেখক কয়েকটি সিদ্ধান্তে স্থিত। সেই প্রত্যয়ের সমর্থনই তাঁর অন্বিষ্ট। মনে হওয়া স্বাভাবিক, যে ঘটনাগুলি লেখকের প্রত্যয়ের পরিপূরক নয়, তার প্রতি তিনি বধির। অবশ্য শেষ পরিচ্ছদে তিনি আমাদের ভাবনার দ্বিধার অবসান করেছেন।

ফলত ইংলণ্ড সম্পর্কে লেখকের মতামত নানা সংশয়ের সৃষ্টি করে। আমরা ধরে নিতে পারি যে তাঁর জানা আছে, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের সুষ্ঠু ও সর্বার্থক প্রকাশ সম্ভব নয়। নিয়াসাল্যাণ্ড ও হোলা বন্দীশিবিরের হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের জয়—এবং উপনিবেশ রক্ষা ও শিল্প জাতীয়করণ না করার প্রতিশ্রুতি যখন সেই জয়ের কারণস্বরূপ বলে প্রতীত হয়—তখন লেখকের মতানুসারী না হতে পারা কি অত্যন্ত অন্যায়?

অথচ মনে হয়, যে সকল ঘটনা লেখকের ভাবনার সমান্তরাল নয় সে সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধিৎসা কথাঞ্চিৎ। অথবা তা' তাঁর অনীহা। স্বীয় ভাবনার সীমান্ত তিনি স্বয়ং লঙ্ঘন করেছেন। সব কিছুকেই একটি সাধারণ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। তাঁর অধিরোহণ সিদ্ধান্ত থেকে প্রতিপাদ্য বিষয়ে। বিবৃত বিষয়গুলি যেন তাঁর হস্তস্থিত আমলকীর মত। অবশ্য অনেক বিষয়ের উপস্থাপনা এবং তার বিশ্লেষণের আপাত প্রচেষ্টা লেখকের সচল মানসিকতারই সূচক।

ইংলণ্ডের বিভিন্ন দৃশ্যপটের যে সব অংশে লেখক বর্ণনাশ্রয়ী, সেখানেই তিনি উপভোগ্য। উদাহরণ : স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভন, কেম্ব্রিজ। অন্যত্র তাঁর বক্তব্য ও বিশ্বাস বিতর্কমূলক। এমনকি যেখানে লেখকের সঙ্গে তত্ত্ব ও তথ্যগত অমিল অন্যের ঘটেছে—সেখানেই তিনি উন্মুক্ত মনের দূরে থাকুক—অসহিষ্ণুতার পরিচয় প্রদান করেছেন। প্রমাণ-স্বরূপ—জি. ডি. এইচ. কোল-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ। দুঃখের বিষয়, তাঁর প্রবাস-কাল তাঁর চৈতন্যে নতুন বোধের সংযোজনা করেনি।

স্বীকার করতে বাধ্য হই, ট্রাফালগার স্কোয়ারের বর্ণনায় লেখককে স্থূল ও অশোভন মনে হয়েছে।

সিদ্ধান্তে শ্রীযুক্ত রায়ের কথাই আমি তাঁর অবগতির জন্য নিবেদন করছি। যে-কথা তিনি কোল সম্পর্কে প্রয়োগ করেছেন। 'ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে ধর্মের মূলসূত্র নিয়ে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা বোঝানো শক্ত'। সত্যি অসম্ভব।

নৃপেন্দ্র সান্যাল